শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

৮ বি, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক : গৌরসুন্দর পাল
বইপত্র—৮ বি ; কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া, ১৩৫২

: প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীমহানামব্রত কালচার এবং ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট
১৪বি, শ্রীগুরুদাস রোড, কলিকাতা-৫৪

মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

মুদ্রাকর :
আর. রায়
সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

বাংলার

একান্ত আপন

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

যিনি

বাংলার পঙ্কিল সমাজে প্রেম-ভালবাসা'র, সাহিত্যে ও ধর্মে

নবজাগরন এনে ছিলেন

তাঁরই

পঞ্চ শতবর্ষ জন্ম জয়ন্তী

উপলক্ষে ভক্তি-অর্ঘ্য

দুটি কথা

নবদ্বীপের প্রভুপাদ নিমাইচাঁদ গোস্বামিজী নিজে আমাকে ডাকিয়া মহাপ্রভুর একটি লীলাগ্রন্থ লিখিবার আদেশ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ৫০০ শত বৎসর স্মরণে তার এই আদেশ।

মহাকবি কর্ণপূর বলিয়াছেন—

চিত্রং তাবদ্ গুণজলনিধেস্তস্য লাবণ্যধাম্নো—
বৈদগ্ধ্যাদের্লবমপি সুধীর্ভাষিতুং কঃ সমর্থঃ।

গুণের সাগর লাবণ্যের সার গৌরাঙ্গের লীলাবৈদগ্ধীর লেশমাত্র বর্ণনা করিতে পারে কোন্ পণ্ডিত? বস্তুতঃ গৌরকথা বলিবার সামর্থ্য কোন পণ্ডিতেরই নাই। একমাত্র নিতাই চন্দ্রের করুণাতেই গৌরকথার স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। যিনি আমাকে গ্রন্থ লিখিতে আদেশ করিয়াছেন, সেই নিমাইচাঁদ গোস্বামীর ধমনীতে নিতাইচন্দ্রের শোণিত প্রবাহিত। তাই আদেশের সঙ্গে কৃপা পাইব এই আশায় আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছি।

গ্রন্থটি রচনায় আমি মহাকবি কর্ণপূরের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতম্' গ্রন্থের উপর অনেক নির্ভর করিয়াছি। কবি কর্ণপূর গৌরপার্ষদ শিবানন্দ সেনের আত্মজ। তাহার দান অতীব নির্ভরযোগ্য। কর্ণপূর মহাপ্রভুর জন্মদিন "রবিবার" বলিয়াছেন, যাহা আর কেহ বলেন নাই। তাঁহার অনেক অভিনব দান আছে।

মহাপ্রভুর আবির্ভাব ১৪০৭ শকের ১৯শে ফাল্গুণ রবিবার। তিরোভাব ১৪৫৫ শকের ৩১শে আষাঢ়। লীলাকাল ৪৭ বৎসর ৪ মাস। এই অত্যাল্প-কালের মধ্যে মহাপ্রভু যে দান করিয়াছেন তাহা বিশ্বে অতুলনীয়।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবন মথুরা দ্বারকায় লীলা করিয়াছেন। গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও নীলাচলে লীলা করিয়াছেন। দুই লীলাই রসের সমুদ্র। কিন্তু পতিতোদ্ধারণ লীলায় গৌরচন্দ্রের দান অনন্যসাধারণ। লীলাময় গৌরহরি পতিতকে উদ্ধার করিয়া কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে—ভাবীকালের সকল পতিতের উদ্ধারের উপায় জগৎসমক্ষে প্রকট করিয়াছেন। সে দান তুলনাহীন।

আজ জগতের এমন দুর্দ্দিন যে, আমরা সকলেই পতিত। ব্যাপকভাবে মানবসমাজই আজ পতিত। কাম ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবৎ

পরাঙ্মুখ হইয়াছি। ভবে দুঃখের দাবদাহনে দগ্ধীভূত হইতেছি। এই পতিত মানবসমাজের পরম কল্যাণের পথ বিশ্বজগতের সমক্ষে উজ্জ্বলভাবে স্থাপন করিয়া দিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। তাঁহার প্রদর্শিত প্রেমের পথে, ধর্ম্মের পথে চলিলেই মহাদুর্দ্দশাগ্রস্থ জগতের শান্তি।

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলিয়াছেন—

"জয় নবদ্বীপ ভারত প্রদীপ—"

ভারতীয় সংস্কৃতি আজ ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। তাহা সমুজ্জ্বল করিতে হ'লে নবদ্বীপ প্রদীপকেই জ্বালাইতে হইবে। করুণাময় শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমপূর্ণ বাণী ও মাধুর্য্যপূর্ণ জীবনী এই তমসাচ্ছন্ন সভ্যতার সম্মুখে উজ্জ্বল বর্ত্তিকা। এই উজ্জ্বল আলোক আজ সকলে মিলিয়া মাথায় তুলিয়া মানবসভ্যতাকে সমুজ্জ্বল করিতে হইবে।

আজ ৫০০ বৎসরের দূরত্বে দাড়াইয়া বিশ্ববাসী নরনারী আশায় উদ্বুদ্ধ। কৃপাসিন্ধু গৌরসুন্দর আমাদের সকলের শিরে করুণাশিস্ ঢালিয়া দিন। শ্রীকর্ণপূরের ভাষায় তাঁহাকে সকলে নমস্কার জানাই।

যস্যাঙ্গ-শ্রীমধুরিম পরীনাঃ পীযূষসেকৈ
র্ভাস্বচ্চামীকরজলময়ৈঃ শান্তনিঃশেষতাপৈঃ।
যস্য শ্রীমৎপদজলরুহান্মাকরন্দ-প্রবাহৈঃ
সাক্ষাৎ প্রক্ষালিতমিব জগচ্ছশ্বদানম্যতাং সঃ। ১/২

যাঁর অঙ্গের উজ্জ্বল স্বর্ণদ্রবসদৃশ মাধুর্য্যামৃত-সেকদ্বারা সর্ব্বতাপ নিঃশেষে দূর হয়, যাঁর পাদপদ্ম বিগলিত মধুধারায় দৃশ্যজগতের জড়তা প্রক্ষালিত হয়, সেই গৌরাঙ্গদেবকে আমি নমস্কার করি।

গৌরগণের পদরজঃ ভিখারী
দাস—মহানামব্রত

প্রস্তাবনা

আমাদের সমিতির প্রথম গ্রন্থ ইংরাজীতে "Mahaprabhu's message" প্রকাশের পর দ্বিতীয় গ্রন্থ "শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামাধুরী" প্রকাশিত হলো। উভয় পুস্তকের লেখক পরম বৈষ্ণব ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তাঁর ভাগবতী কথার ঢঙে অত্যন্ত সহজ সরল করে ষড়দর্শন, বেদ, বেদান্ত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের নিরীখে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জীবন ও বাণীকে ভক্তিরসে জাড়িত করেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলামাধুর্য্য লেখক নিজে আস্বাদন করেছেন আকণ্ঠ এবং পাঠকগণকে সেই রসের ভাণ্ড প্রদান করেছেন। তাঁরা পরিতৃপ্ত হলে লেখকের শ্রম এবং আমাদের সমিতির প্রয়াস সার্থক হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমিকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে তাঁর পঞ্চশত আবির্ভাব উদ্‌যাপনের যেসব কার্য্যসূচী আমরা পালন করছি সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশ ও পুরানো গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ তার অঙ্গীভূত। তাই আমাদের পরবর্ত্তী প্রচেষ্টা শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর "চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্" এর ইংরাজী, বাংলা অনুবাদ সহ মুদ্রণ।

ভাবের রূপরেখা ভাবুকের লেখনীতে প্রকাশিত হয়। ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী একাধারে বক্তা, ভাবুক ও লেখক। তাঁর ভাষাশৈলী ভাবমূর্চ্ছণায় নব নবায়মানরূপে নৃত্য করে। ইহাই তাঁর স্বাভাবিক রীতি। লেখায় বা বলায় তাঁর ভাষার একটা নটন গতি আছে, সুতরাং সেই নৃত্যের লাস্য প্রকাশের জন্য তাঁর প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়না। এইযে স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভঙ্গি, এতেই মাতোয়ারা হয়ে তিনি 'গৌরপ্রেমরসার্ণবে' ডুবেছেন।

এত সংক্ষিপ্তাকারে শ্রীগৌরলীলাবর্ণনের আর কোন দ্বিতীয় গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর হয়না। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'কে আকর গ্রন্থরূপে অবলম্বন করে অন্যান্য মহাজন গ্রন্থ উপাদানরূপে ব্যবহার করার এক অভিনব দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়েছে।

আমাদের সমিতি রসজ্ঞ লেখক ও ভক্ত প্রকাশকের প্রতি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

ইতি—শ্রীনিত্যানন্দ দাসানুদাস

শ্রীনিমাইচাঁদ গোস্বামী

ও

শ্রীশিবপদ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

অবতার বাদ

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন,. হে অর্জুন, যে সব তত্ত্ব কথা আমি তোমাকে বলিলাম, পূর্বে আমি এই সমস্ত কথা বিবস্বান বা সূর্যকে বলিয়াছিলাম। বিবস্বান বলিয়াছিলেন তৎপুত্র মনুকে। এই কথাগুলি মনু বলিয়াছিলেন নিজপুত্র রাজর্ষি ইক্ষ্বাকুকে। এই ভাবে রাজর্ষি পরম্পরায় এই সব কথা চলিয়া আসিতেছিল। কালক্রমে লোকে এইগুলি ভুলিয়া গিয়াছিল। তাই নূতন করিয়া এই সমস্ত কথা আবার তোমাকে বলিলাম।

অর্জুন বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হে কৃষ্ণ, তোমার জন্ম হইল মাত্র সেই দিন অর্থাৎ মনু ইক্ষ্বাকুদের অনেক পরে। আর তোমার জন্মের কতকাল পূর্বে বিবস্বান-মনু-ইক্ষ্বাকুদের আবির্ভাব। তুমি বিবস্বানকে এত সব তত্ত্ব কথা বলিয়া ছিলে, আমি তাহা কি করিয়া বিশ্বাস করিব ?

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে অর্জুন, তোমার ও আমার বহুবার এই জগতে আসা হইয়াছে। তুমি সব ভুলিয়া গিয়াছ, আমার সব মনে আছে। কেবল যে পূর্বে বহুবার আসিয়াছি তাহা নয়, মাঝে মাঝে আসিয়া থাকি। যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি আসি। আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। প্রয়োজন হইলেই আসি।

প্রয়োজনটি হইল ধর্মের সংস্থান। ইহারই জন্যে যুগে যুগে কালে কালে শ্রীভগবানের মর্তে অবতরণ। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিই হইল অবতারবাদের মূল ভিত্তি।

ভগবানের মানুষরূপে অবতার গ্রহণের কতকগুলি যুক্তিগত অসুবিধা আছে, আছে কতকগুলি অসামঞ্জস্য। মানুষ জন্মমৃত্যুর অধীন, ভগবান জন্ম-মৃত্যুর অতীত। মানুষরূপে অবতীর্ণ হইলে ভগবানকেও জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হয়। যুক্তি তর্কের সাহায্যে ইহা বুঝা কঠিন। ইহা ছাড়া আরো আপাতঃ অসামঞ্জস্য আছে। মানুষের দেহ পরিণামী। এই দেহে বাল্য কৈশোর যৌবন জরা এই সর্ব পরিবর্তন হয়। ভগবানের দেহ অপরিণামী। তাহাতে বাল্য কৈশোর যৌবন জরা প্রভৃতি বিকার হইতে পারে না। অথচ মানুষ হইয়া আসিলে ভগবানকে এই সব বিকারের অধীন হইতেই হয়। এই যুক্তিতে ভগবান মনুষ্য দেহ ধারণ করিতে পারেন না। অবতার বাদের বিরুদ্ধে এইগুলি হইল জোরালো আপত্তি।

এই আপত্তিগুলির উত্তর ভগবান নিজেই দিয়াছেন। বলিয়াছেন অর্জুনকে কিন্তু লক্ষ্য জগতের সকল মানুষ। "আমি অজ হইলেও জন্মগ্রহণ করি। আমি অব্যয়, আমি অপরিবর্তনীয়। কিন্তু অপরিণামী থাকিয়াও আমি দেহ ধারণ করি। আমার যোগমায়া শক্তির প্রভাবে এই সমস্ত কার্য হইয়া থাকে।" যোগমায়া কিরূপ, ইহার ব্যবস্থা কিরূপ, ইহা বুঝা ও বুঝানো অতীব কঠিন। একটি লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করা যাইতেছে।

সকালবেলা সূর্য পূর্বাকাশে উদিত হয়, সন্ধ্যাবেলা পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হয়। ইহা সর্বজনদৃষ্ট, সর্বজনসম্মত সত্য। কিন্তু বিজ্ঞানের গুণে বর্তমানে সকলেই জানে যে সূর্যের উদয়ও নাই, অস্ত ও নাই। ইহা সকল সময়ে একই স্থানে আছে। সূর্যের উদায়াস্ত নাই, ইহা পরম সত্য-সকল লোকের জানা সত্য। ভগবান জন্মমৃত্যুর অতীত, ইহা পরম সত্য। তিনি অজ, অপরিণামী ও অব্যয়—ইহা পরম সত্য। আবার ভগবান নরদেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হন, লীলা করেন ও লীলা সংবরণ করেন ইহাও সত্য। ভগবানের চিন্ময় দেহের পরিবর্তন নাই যেমনন সূর্যের কোন পরিবর্তন নাই। কিন্তু সকাল বেলাকার সূর্যকে আমরা বলি, বালার্ক, প্রভাতসূর্য, তরুণতপন। সূর্য কখনো বালক হয় না, তরুণ হয় না, নবোদিত ও হয় না। সকালে আমরা সূর্যের এই রূপ প্রত্যক্ষ করি। সেইরূপ ভগবান কখনো বালক হন না, তরুণ হন না বা জরাগ্রস্তও হন না। তিনি অব্যয়াত্মা, সর্বভুতের ঈশ্বর। কিন্তু মাতা যশোদার কোলে যখন থাকেন, তখন তাহাকে বলি, বালগোপাল। যখন ব্রজগোপিনীদের সঙ্গে থাকেন, তখন বলি নবকিশোর, নবকিশোর নটবর। এই রহস্য হৃদয়ঙ্গম না হইলে ভগবানের লীলা আস্বাদন করা যায় না।

পূর্বাভাষ

দ্বাপর যুগ। পৃথিবী পাপে ভারাক্রান্তা। কংস, জরাসন্ধ প্রমুখ দুর্বৃত্ত রাজাদের অত্যাচারে জর্জরিতা। এই পাপ ও অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভের উপায় কি? তাই তিনি গাভীরূপ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা তাহাকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীর সমুদ্রের তীরে নারায়ণের নিকট উপস্থিত হন। তাহার সঙ্গে মহাদেব এবং অন্যান্য দেবতাগণও ছিলেন। তাহারা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নারায়ণের

স্তবকরিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবান বাণী দিলেন। বলিলেন, —আমি মথুরায় বসুদেব, দেবকী গৃহে আবির্ভূত হইব। অসুর বধ করিব। ধরণীর পাপ দূর করিব। ব্রহ্মা এই বাণীর মর্ম সবাইকে শুনাইয়া দিয়া কহিলেন, যাহার যাহার লীলা দেখিবার সাধ আছে তাহারা মথুরা মণ্ডলে গিয়া জন্মগ্রহণ করুন।

ভগবান নিজের বাক্য পালন করিয়াছিলেন। বসুদেব দেবকীর গৃহে আসিয়াছিলেন কংসের কারাগারের মধ্যে। সত্য সত্যই আসিয়াছিলেন তিনি। কংস, জরাসন্ধ, দন্তবক্র প্রভৃতি অত্যাচারী রাজাদের বধ করিয়াছিলেন। ধর্মসংস্থাপন করিয়াছিলেন।

আবার তিনি আসিয়াছিলেন নদীয়ায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর গৃহে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তখন সনাতন ধর্মের দুর্দিন। অন্য ধর্মের আঘাতে সনাতন ধর্ম বিপর্যস্ত। শাস্ত্রীয় চুলচেরা বিচারের চাপে মানবধর্ম লাঞ্ছিত, ভগবদ্ভক্তি দুর্বল। নৈতিক অধঃপতনে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল সমাজ জীবন।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। পাপভারাক্রান্তা পৃথিবীর বেদনায় বেদনার্ত হইয়া সেইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন ব্রহ্মা, এইবার করিলেন অদ্বৈতাচার্য। অদ্বৈতাচার্য শ্রীহট্ট নিবাসী একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। লোকে তাহাকে বলিত সদাশিবের অবতার। তিনি নবদ্বীপ শান্তিপুরে বাস করিতেন কলিহত জীবের দশা মলিন দেখিয়া তিনি আকুল হইয়া কাঁদিতেন। তাহার আরাধ্য দেবতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু তাহাকে তিনি ডাকিতেন মদন গোপাল বলিয়া। তিনি মদন গোপালের পাদপদ্মে গঙ্গাজল তুলসী দিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেন। বলিতেন, প্রভু মদন গোপাল তুমি ধরার বুকে নামিয়া আস। আসিয়া আবার সত্যধর্ম, ভক্তিধর্ম সংস্থাপন কর। তিনি তাহার সঙ্গীদের কাছে খুব দৃঢ় ভাবে বলিতেন,—করাইব কৃষ্ণ সর্ব নয়ন গোচর

তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিংকর।

তাহার ডাকে সত্য সত্যই গোলকের আসন টলিয়াছিল। একদিন তিনি গঙ্গার তীরে বসিয়া মদনগোপাল বলিয়া কাঁদিতে ছিলেন। দেখিলেন, একটি তুলসী পত্র ভাসিয়া যাইতেছে গঙ্গায়। স্রোতের বিপরীত দিকে ভাসিয়া চলিতেছে পত্রটি। দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। গঙ্গার তীর ধরিয়া তুলসী পত্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন তিনি।

নদীয়ার গঙ্গার ঘাটে তখন অগণিত নরনারী স্নান করিতেছে। তুলসী

-পত্রটি ভাসিয়া আসিয়া স্নানরতা এক উজ্জলকান্তি রমণীর নাভিমূলে ঠেকিয়া স্থির হইয়া রহিল। অদ্বৈতাচার্য বুঝিলেন, মদনগোপাল এই ভাগ্যবতী রমণীরগর্ভেই আসিবেন। পরিচয় নিয়া জানিলেন, ইনি জগন্নাথ মিশ্রের সহধর্মিণী শচীদেবী।

শ্রীহট্টের উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র জগন্নাথ মিশ্র। জন্মস্থান শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা-দক্ষিণ অঞ্চলে। নবদ্বীপে বাস করেন। অগাধ পাণ্ডিত্য হেতু তাহার উপাধি পুরন্দর। তিনি বিবাহ করিয়াছেন নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচী দেবীকে। শচীদেবীর গর্ভে পর পর আটটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। তাহারা অকালেই কালগ্রাসে পতিত হয়। শচীদেবীর নবম সন্তান সুলক্ষণ পুত্র। তাহার নাম রাখা হইয়াছিল বিশ্বরূপ। রূপেগুণে, বিদ্যায়, ভক্তি যাজনে বিশ্বরূপ একটা অসাধারণ বালক বলিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। শৈশবেই সর্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। কৈশোরে পদার্পণ করিয়াই সে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যায়।

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর শচী দেবীর দশম গর্ভের সন্তান। একদিন জগন্নাথ মিশ্র স্বপ্নে দেখলেন এক জ্যোতির্ময় তেজ তাহার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং তাহার হৃদয় হইতে বহির্গত হইয়া সেই তেজ শচীদেবীর গর্ভে প্রবেশ করিল।

জগন্নাথ মিশ্র কহে, যে স্বপ্ন দেখিল
জ্যোতির্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল।
আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে॥

শচী দেবীও এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কাহাকেও বলেন নাই। আজ স্বামীকে বলিলেন—শচী কহে, মুঞি দেখো আকাশ উপরে
দিব্য মূর্তি লোক সব যেন স্তুতি করে॥

উভয়ে প্রতীক্ষায় থাকিলেন কোন উন্নতসত্তা মহাপুরুষের শুভ আবির্ভাবের জন্য। কিন্তু কোথায় সেই মহাপুরুষ? দশ মাস যায়, এগার মাস যায়, বারমাস গিয়া এখন তের মাস চলিল। শচী দেবীর জনক নীলাম্বর চক্রবর্তী একজন ভাল জ্যোতিষি। গণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি গণিয়া কহিলেন, এই মাসেই কোন শুভ লগ্নে শচী দেবীর এক সর্ব সুলক্ষণ পুত্র জন্মিবে। এই নবদ্বীপ ধামেই জন্ম হইবে তাহার।

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী

শুভ অবতরণ

নবদ্বীপ ধাম

"ইয়ং মহী ভাগ্যবতী মহীয়সী
দিবোপি দিব্যাদপি নির্ম্মলৈর্গুণৈঃ।
মহান্তি রত্নানি যদা দধাত্যতো
দধৌ নবদ্বীপমতীব দুর্ল্লভম॥ ১।২ কবি কর্ণপুর।

এই বসুমতী ভাগ্যবতী। দেবতা ও স্বর্গ হইতেও গরীয়সী। নানা রত্ন ধারণ করিয়া ধরণীর যে গৌরববৃদ্ধি, তদপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা দুর্ল্লভ নবদ্বীপ নগরীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া।

ভারতবর্ষ বৈকুণ্ঠের আঙ্গিনা। তার পূর্ব্ব সীমান্তস্থ একটি প্রদেশ—নাম বঙ্গদেশ। ভারতজননীর কোলে একটি আদরের কন্যার মত তার অবস্থান। নবদ্বীপ বঙ্গভূমির একটি শ্রেষ্ঠ নগরী। রাজকীয় রাজধানী নয়। সাংস্কৃতিক রাজধানী বটে। ধনে, ঐশ্বর্য্যে, বিদ্যাবত্তায় নবদ্বীপ একটি সমুজ্জ্বল ধাম। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রধান স্থান। যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-পূজা, অর্চ্চনা, হিন্দুর দশকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে নগরটি সর্ব্বদা জীবন্ত। অগণিত পণ্ডিত ও পড়ুয়ার শাস্ত্রপাঠে, বিচারে, চর্চ্চায়, নবদ্বীপ সর্ব্বদা কলমুখর। এই সুবিখ্যাত নগরীতে গোলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ করিয়াছে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। নিখিল বিশ্বজীবের যুগান্তব্যাপী তপস্যার একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব ফল। একটি অচিন্তিতপূর্ব্ব মহাসম্পদ। সকল প্রাণীর প্রাণ মনোহর।

মাঙ্গল্যময় ক্ষণ

ফাল্গুন মাস। কাব্যামোদীদের বসন্ত ঋতু। ভাব-বিলাসীদের মধুমাস। শীতের কম্প নাই, নিদাঘের ঘর্ম্ম নাই, বর্ষার মেঘাডম্বর নাই। প্রত্যেকটি দিবারাত্র সর্ব্বদার জন্য মনোরম, উপভোগ্য। সর্ব্বত্র একটি তৃপ্তিবিধায়ক আবহাওয়া। মানুষের মনপ্রাণের গতি স্বচ্ছন্দ, সাবলীল, যেন উর্দ্ধমুখী।

তিথিটি ছিল পূর্ণিমা। পূর্ব্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রের ঘরে নিশাপতির রাত্রি লাস। ফুলের সুবাস, জ্যোৎস্নার নিশ্বাস, বনে-উপবনে, লতায় পাতায়

চাঁদিমা যেন বিগলিত। গঙ্গার উন্মুক্তবক্ষে প্রবাহিত গন্ধবহের স্নিগ্ধ করস্পর্শ। নবদ্বীপের নরনারীর মনেপ্রাণে কে জানে কোন অজানা কারণে উদ্বেলিত হর্ষ। অপরাহ্ন বেলা হইতেই সুরধনীর তট জনকোলাহলে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত। কর্ণপুরের কর্ণ-রসায়ন ভাষায়—

অসাবৃতূণাং পতিরগ্রতোঽভবৎ
তথৈব পক্ষঃসিত এব সোঽভবৎ।
তথা তিথীনাং প্রবরা চ পূর্ণিমা
গুণানুবন্ধী খলু মঙ্গলোদয়ঃ॥ ৩।৪।২

বসন্তঋতু, শুক্লপক্ষ, তিথিশ্রেষ্ঠ পূর্ণিমা। সর্ব্ববিধ মঙ্গলের উদয়ে মহা-মাঙ্গল্যের পরিসীমা। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অনুভবে—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল।

ঐ দিন ছিল চন্দ্রগ্রহণ। রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল যেন এই কথা বলিতে বলিতে—হে নিশানাথ তুমি, আর কেন বৃথা উদিত হইতেছ—ঐ দেখ অপর এক কলঙ্কহীন চন্দ্রমা পৃথিবীতে উদিত হইতেছেন—

অলং ত্বয়া সংপ্রতি শীতদীধিতিঃ
সমুদ্গতোঽন্যোস্তি ভুবীতি ভাবয়ন্॥ ২।৪০ কর্ণপুর।

গ্রহণকালে হরিনাম কীর্ত্তন। ইহা হিন্দুর চিরন্তনী রীতি। অগণিত লোক দলে দলে খোল-করতালে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, শুধু গঙ্গাতীর নয়, সারা নবদ্বীপ মুখরিত করিয়া তুলিল। কতলোক তখন গঙ্গায় অবগাহনরত। কত লোকের দৃষ্টি গ্রহণ দর্শনে উর্দ্ধে নিবদ্ধ। কতলোক কটিমগ্ন জলে দাঁড়াইয়া স্তব-স্তুতি পাঠে নিবিষ্ট। আর সকল কণ্ঠে হরিনামের রোল। "হরিবোল হরিবোল সবে এই শুনি। সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি॥" সর্ব্বত্র একটি মনোহারী দৃশ্য।

এই সুন্দর সময়, এই মরজগতের অসুন্দর মাটিতে আসিলেন এক অনিন্দ্য-সুন্দর অমৃতময় পুরুষবর। জন্মিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের আঙ্গিনায়, পতিব্রতা সতী শিরোমণি শচীদেবীর অঙ্কদেশে। উর্দ্ধে ধ্যানমগ্ন আকাশ, নিম্নে কীর্ত্তনমুখর বাতাস, মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন বৃন্দাবনের রসরাজ, বিশ্বজগতের রাজাধিরাজ। ধারণ করিলেন একটি বুক-জোড়া শিশুর সাজ।

হেনই সময়ে সর্ব্ব জগতজীবন
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন ॥

এলেন তিনি মানুষের মাঝে, মানুষের সাজে। রূপের ছটায় জগন্নাথের গৃহাঙ্গন সমুজ্জল। হাসির ছটায় তপ্ত মানুষের চিত্তে শান্তির হিল্লোল। আনন্দোল্লাসময় ভূমিকায় প্রেমঘন পুরুষের অবতরণ। উদ্দেশ্য তপ্ত-জীবের প্রাণে শান্তির অমিয়ধারা বর্ষণ মাধ্যমে চিরতৃপ্তি সম্পাদন।

চৌদ্দশত সাত শকাব্দের ফাল্গুন মাসের তেইশে। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের আঠারোই। চন্দ্র ছিলেন সিংহ রাশিতে। সিংহলগ্ন তখন পূর্ব উদয়াচলে উদীয়মান। ক্ষণটি পরম শুভদ। বারটি শুক্রবার। কেহ বা শনিবারও বলেন।

ভবিষ্যদুক্তি

শচীদেবীর পিতৃদেব নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী খ্যাতনামা জ্যোতিষী। পৌত্রের জন্মকালের গ্রহাদির অবস্থান পর্য্যালোচনা করিলেন। রূপ ও লক্ষণ দেখিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট চক্রবর্ত্তী বলিলেন—এই জাতক সর্ব্বগুণের নিধান হইবে। বৃহস্পতি অপেক্ষা বিদ্যাবান হইবে। গৌড়দেশে ব্রাহ্মণরাজা হইবে এইরূপ কিংবদন্তী আছে। মনে হয় এই শিশুই সেই হবে।

বিপ্ররাজা গৌড়ে হইবেক্ হেন আছে।
বিপ্র বোলে সেই বা জানিব তাহা পাছে ॥

এই শিশু হবে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। বিশ্বের নর-নারীকে করিবেন শান্তিদানে তুষ্ট, আনন্দদানে পুষ্ট, আত্মিক আহার্য্যদানে করিবেন সুন্দর। তাই মাতামহ শিশুর নামকরণ করিলেন বিশ্বম্ভর।

হেন কোষ্ঠী গণিলাম আমি ভাগ্যবান।
শ্রীবিশ্বম্ভর নাম হইব ইহান ॥
ইহানে বলিবে লোক নবদ্বীপচন্দ্র।
এ বালক জানিহ কেবল পরানন্দ ॥

নামকরণ

বিশ্বম্ভর নাম রাখিলেন মাতামহ। দেহের বর্ণ অত্যুজ্জল স্বর্ণের মত দেখিয়া পাড়াপড়শীরা ডাকিল গৌর। গৌরাঙ্গসুন্দর। গৌরের সংক্ষেপ

হইল গোরা। গোরা জন্মিবার পূর্ব্বে শচীমা আটটি কন্যা হারাইয়াছেন। এটিও মৃত্যু দেবতা না লইয়া যান এইজন্য মা ডাকিতেন নিমাই। যমরাজার কাছে শিশুকে নিমের মত তিতো করার উদ্দেশ্যে। কেহ বলেন, নিমগাছের তলায় জন্ম—তাই নিমাই। চব্বিশ বছরে গৃহত্যাগের পর গুরু কেশবভারতী প্রদত্ত নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

যত জগতেরে তুমি "কৃষ্ণ" বোলাইয়া।
ধরাইবা "চৈতন্য" কীর্ত্তন প্রকাশিয়া॥
এঁতেক তোমারি নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্ব্বলোকে তোমা হ'তে যাতে হৈল ধন্য॥

শিশু নিমাই

শিশু স্বভাবে নিমাই কাঁদে। কেহ হাততালি দিয়া "হরিবোল হরিবোল" বলিলে কান্না থামে। শিশু দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। তাকে শান্ত রাখিবার উপায় ছিল ঐ একটি। "হরিবোল হরিবোল" ধ্বনি। এই হেতু শচীর প্রাঙ্গণ সর্ব্বদা হরিবোল ধ্বনিতে মুখরিত রহিত।

যখন জানুগতিতে হামাগুড়ি দিত, কটিতে কিঙ্কিণী বাজিত। কি যে মনোহর ভঙ্গিমায় আঙ্গিনা ভরিয়া শিশু ছুটাছুটি করিত। আগুন, সাপ যা দেখিত তাই ধরিত। একদিন এক সাপ ধরিয়া ফেলিল। সাপও কুণ্ডলী পাকাইয়া শিশুকে বেড়িয়া ধরিল। শিশু সাপ লইয়া শুইয়া পড়িল। সাপের উপর শুইয়া হাসিতে লাগিলে। সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। কেহ গরুড় গরুড় উচ্চারণ করিল। কেহ কাঁদিয়া ফেলিল। সাপ তখন শিশুকে ছাড়িয়া বনের দিকে চলিয়া গেল। সকলে নিমাইকে কোলে তুলিয়া-"বাবা দীর্ঘজীবী হও" বলিয়া প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ করিল।

যখন শিশু নিমাই অঙ্গনে বেড়ায়, তখন শ্রী-অঙ্গ হইতে রূপ যেন ফাটিয়া পড়ে।

জিনিঞা রবিকর অঙ্গ মনোহর
নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন ঈষৎ বঙ্কিম
উপমা নাহিক বিচারি॥

শ্রীমুখের শোভা দেখিতে চাঁদেরও সাধ লাগে। সুবলিত মস্তকে চাঁচর

কেশ যেন যশোদাদুলাল বালগোপালের বেশ। আজানুলম্বী বাহু, চন্দনে উজ্জ্বল বক্ষ পরিসর, করাঙুলি, পদাঙুলি কী মনোহর। যখন নাচিয়া যায়, মনে হয় যেন অঙ্গ হ'তে রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে। দেখিয়া জননীর মনে ত্রাস লাগে।

"রক্ত পড়ে হেন দেখি-মায়ে ত্রাস পায়॥"

শচী-জগন্নাথ নির্জ্জনে বসিয়া কানাকানি করে। কোন মহাপুরুষ আসিয়া আমাদের ঘর আলো করিল। এমন রূপবন্ত, গুণবন্ত সন্তান। মনে হয় সংসারের দুঃখ অশান্তির এবার অন্ত হইবে। মানব সমাজ শান্ত হইবে। সকলে পাবে পরা-শান্তি এই শিশু হইতে।

হাটিতে শিক্ষা হয়েছে নিমাইয়ের, একেশ্বর ঘরের বাহিরে চলিয়া যায়। কি সকালে কি বিকালে। কি সন্ধ্যায়, কি রাত্রিতে—কেবলি বাহিরে চলিয়া যায় নিমাই। খেলার সাথীদের ঘরে ঢোকে, কৌতুক করিয়া দ্রব্যাদি চুরি করে। কারো দুধ খায়, কারো ভাত খায়। কারো হাড়ি ভাঙ্গে। কারো শিশুকে চিমটি কাটিয়া কান্দায়। যদি ধরা পড়ে, পায়ে ধরিয়া বলে—"এবার ছাড়ো, আর আসিব না।"

চোরের ভ্রান্তি

শিশুর গায়ে কত সুবর্ণের অলঙ্কার। লোভে পড়িয়া, দুই চোর পরামর্শ করিল। যখন কেহ কাছে নাই, তখন শিশুকে লইয়া সরিয়া পড়িল। নিমাই সকলের নয়নের তারা। মুহূর্ত্তে তাকে না পাইয়া পাড়াশুদ্ধ লোক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি, খোঁজাখুঁজি, নিমাই, নিমাই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি।

শিশুকে কাঁধে লইয়া চোর ছুটিয়াছে। কিন্তু নিজের বাড়ির পথ চোর আর খুঁজিয়া পায় না। শেষে চোরেরা নিজের ঘর মনে করিয়া শচীর অঙ্গনে আসিয়া শিশুকে কাঁধ হইতে নামাইল। চারিদিক তাকাইয়া চোরেরা নিজ ভুল বুঝিল। দ্রুত সরিয়া পড়িল। নিমাই ছুটিয়া বাবার কোলে উঠিল। হারানো রতন পাইয়া সকলে মহানন্দে হরিধ্বনি করিল।

বাবা বলিলেন, "বিশ্বম্ভর ঘর হইতে আমার পুঁথিখানা আন।" শিশু নিমাই ছুটিয়া গিয়া পুস্তক আনিল। মিশ্র পুরন্দর তখন রুণু রুণু ঝুহু ঝুহু নূপুরের ধ্বনি শুনিলেন। শিশুর পায়ে তো নূপুর নাই। কোথায় নূপুরের বাদ্য হইল! ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী পরস্পর চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ

বলিলেন—"ঘরে যে শালগ্রাম রূপী দামোদর আছেন তাঁরই এই কাণ্ড। তিনিই ঘরের মধ্যে খেলা করেন। আজ তাকে পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া ভোগ দাও ভাল করিয়া।

মিশ্র বোলে শুন বিশ্বরূপের জননী
ঘৃত পরমান্ন গিয়া রাঁধহ' আপনি ॥
ঘরে যে আছেন দামোদর শালগ্রাম।
পঞ্চগব্যে সকালে করাব তারে স্নান ॥
বুঝিলাম তিঁহো ঘরে বুলেন আপনি।
অতএব শুনিলাম নূপুরের ধ্বনি ॥

তৈথিক বিপ্রসঙ্গে লীলা

জগন্নাথ মিশ্রগৃহে একজন অতিথি আসিয়াছেন। অতিথি তীর্থ পর্য্যটক ব্রাহ্মণ। তিনি নিত্য স্বপাকে নিজ ইষ্ট বালগোপালকে ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। রান্না করিয়া তিনি ভোগ দিয়াছেন। অমনি দেখা গেল কোথা হইতে নিমাই আসিয়া থালা হইতে মুঠি মুঠি খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণের আহার নষ্ট হইল। মিশ্র মহাশয়ের অনুনয়ে ব্রাহ্মণ আবার রান্না করিলেন। নিমাইকে কোলে লইয়া জননী অন্যবাড়ী চলিয়া গেলেন। কিন্তু হায়! যেই মাত্র ভোগ দিয়াছেন অমনি পূর্ব্ববৎ নিমাই থালা হইতে তুলিয়া খাইতেছেন। সকলের বিশেষ অনুরোধে ব্রাহ্মণ তৃতীয়বার পাক করিলেন। তখন রাত্রি অনেক। নিমাই সহ সকলে নিদ্রিত।

ব্রাহ্মণ চক্ষু বুজিয়া গোপালকে নিবেদন করিতে বসিলেন। অমনি সম্মুখে নিমাইচাঁদ উপস্থিত। ব্রাহ্মণকে বলিলেন

মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি, আসি তোমা স্থান ॥

ব্রাহ্মণ চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন—নিমাই চতুর্ভুজ।

এক হস্তে নবনীত আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় ॥

ব্রাহ্মণ নিজ আরাধ্য ধন চিনিলেন। গৌরসুন্দর তাহাকে নিষেধ করিলেন —এসব কথা কাহাকেও জানাইতে।

"এ সব আখ্যান এবে কারো না কহিবা ॥"

বালক নিমাই

শুভদিনে শুভক্ষণে নিমাইর হাতে খড়ি হইল। হাতেখড়ির দিনই বর্ণমালা শিখিয়া ফেলিল।

কি মাধুরী করি প্রভু ক খ গ ঘ বোলে।
তাহা শুনিতেই মাত্র সর্ব্বজীব ভোলে॥

দুই তিন দিনে বানান ফলা শিখিলেন। তারপর নাম লেখা। কলরি পাতার উপর নাম লিখেন—নিরন্তর কৃষ্ণের নাম-মালা লিখেন।

রাম, কৃষ্ণ, মুরারি, মুকুন্দ, বনমালী।
অহর্নিশি লিখেন পড়েন কুতুহলী।

খেলাধূলাও বাড়িল। অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন যা বায়না ধরিবেন না দিয়া উপায় নাই। আকাশের চাঁদ চাই। মিটি মিটি তারাগুলা চাই উড়িয়া যাওয়া পাখীটা চাই। যা চাই, না পাইলেই কান্না আরম্ভ। কেবল হরিবোল হরিবোল বলিলেই কান্না থামে।

একদিন বালক নিমাই এক অদ্ভুত বায়না ধরিল। আজ একাদশী। জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবতের বাড়ীতে কৃষ্ণের জন্য যে নৈবেদ্য তৈয়ারী হইয়াছে, তাহা আনিয়া দেও। তাহা খাইব। আব্দার শুনিয়া সকলে অবাক।

আজ যে একাদশী তিথি তা বালক কি করিয়া জানিল। ঐ দুই পণ্ডিতের নামই বা কি করিয়া জানিতে পারিল। পণ্ডিতদ্বয়ও ঐ কথা শুনিয়া বিস্ময়াম্বিত। তাঁহারা তহাদের গৃহ হইতে প্রস্তুত করা নৈবেদ্য আনিয়া দিলেন। বালক নিমাই তাহা সাদরে গ্রহণ করিল।

"দুই বিপ্র বোলে "বাপ! খাও উপহার।
সকল কৃষ্ণের সাৎ হইল আমার॥"

গৌরসুন্দর গঙ্গায় স্নান করেন। শিশুদের সঙ্গে জল ফেলাফেলি করেন। সাঁতার কাটিতে সকলের গায়ে তার পায়ের জল ছিটিয়া যায়। কারো গায়ে মুখের কুলকুচি দিয়া দেয়। বয়স্ক ব্রাহ্মণগণ গিয়া জগন্নাথ মিশ্রের কাছে অভিযোগ করে।

কেহ বলে, "তোমার ছেলের জন্যে গঙ্গায় স্নান করিতে পারিনা।" কেহ বলে, "গায়ে জল দিয়া আমার ধ্যান ভাঙ্গিয়া দেয়।" বলে, কারে ধ্যান কর। কলিযুগে আমিই নারায়ণ।" কেহ বলে, "উত্তরীয় লইয়া যায়।" কেহ বলে,

"আমি জলে নামিয়া সন্ধ্যাকরি, তোমার ছেলে পায়ে ধরিয়া টানিয়া নেয়।" কেহ বলে, "আমার ফুলের সাজি লইয়া যায়—পরার ধুতি লইয়া যায়—গীতা পুথি ফেলিয়া দেয়।" ব্রাহ্মণদের কথা শুনিয়া মিশ্রবর তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া গৃহে ফিরাইয়া দেন—ভাবেন, ছেলেকে যথোচিত শাসন করিবেন।

বালিকারা আসিয়া শচীদেবীর কাছে অভিযোগ করে। আমরা সকলে স্নান করিতে বসি—মাঝখানে গিয়া বসিয়া পড়ে। আমাদের সঙ্গে পূজার সজ্জা থাকে। নিমাই বলে "আমাকে পূজা কর—গঙ্গা দুর্গা সব আমার দাসী। শিব আমার ভৃত্য। আমাকে পূজা করিলে বর দেব। ধন-ধান্যবান স্বামী হবে। সাতপুত্রের মা হবে। যে আমাকে পূজা করবে না সে বুড়া স্বামী পাবে। চার সতীনের ঘর হবে। এই সব কথা বলতে বলতে নিজেই দেবতা পূজার চন্দন, মালা পরতে থাকে। নৈবেদ্য কাড়িয়া খাইতে আরম্ভ করে।

শচীমাতা বালিকাদের বলেন—আমি আজ নিমাইকে বাঁধিয়া শাসন করিব। যাতে ঐ রূপ উপদ্রব আর না করে। তাহারা তখন চলিয়া যায়।

এমন সময় বিশ্বম্ভর পাঠশালা হইতে গৃহে ফিরেন। হাতে মোহন পুঁথি, গায়ে লিখন কালির বিন্দু। নিমাই মাকে ডাকিয়া বলে, মা তেল দাও, স্নান করিতে যাব। জননী তাকাইয়া দেখেন নিমাইর গায়ে কোন স্নানের লক্ষণ নাই। মিশ্র ঘরে আসিয়া নিমাইর দিকে তাকাইয়া দেখেন—

"মিশ্র দেখে সর্ব্ব অঙ্গ ধুলায় ব্যাপিত।
স্নান চিহ্ন না দেখিয়া হইল বিস্মিত॥"

গৌরসুন্দর তেল মাখিতে মাখিতে স্নান করিতে গঙ্গায় গেলেন। জগন্নাথ ও শচীদেবী ভাবিতে লাগিলেন—

"যে যে কহিলেন কথা সেহো মিথ্যা নহে।
তবে কেন স্নান চিহ্ন কিছু নাহি দেহে॥
সেইমত অঙ্গে ধূলা, সেই মত বেশ।
সেই পুঁথি, সেই বস্ত্র সেই মত কেশ॥
এ বুঝি মনুষ্য নহে—শ্রীবিশ্বম্ভর।
মায়া রূপে কৃষ্ণ বা জন্মিলা মোর ঘর।"

অগ্রজ বিশ্বরূপ

শ্রী গৌরসুন্দর শিশুরূপে কত ক্রীড়া করেন। পিতামাতা কাহাকেও ভয় করেন না। কেবল অগ্রজ বিশ্বরূপকে দেখিলে নিমাই চাঁদ অতিনম্রভাব অবলম্বন করেন। বিশ্বরূপ আজন্ম বিরক্ত, বিষয়ে অনাসক্ত। সকল শাস্ত্রে বিষ্ণু ভক্তি ব্যাখা করেন। তার ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে কাহারও শক্তি নাই। ছোট ভাইয়ের ভাব লক্ষণ দেখিয়া মনে মনে ভাবেন—

"এ বালক কভো নহে প্রকৃত ছাওয়াল।
রূপে আচরণে যেন শ্রী বালগোপাল ॥"

বিশ্বরূপে মনের কথা কাহাকেও ব্যক্ত করেন না। জীব কৃষ্ণভক্তিহীন দেখিয়া বিশ্বরূপ একাকী ক্রন্দন করেন। আর অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ী গিয়া তাঁর সঙ্গে মিলিত হইয়া জীবের দুঃখে কাঁদেন। বিশ্বরূপ উষাকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অদ্বৈতের সভায় কৃষ্ণকথা রসে ডুবিয়া থাকেন।

শচীমা রন্ধন শেষ করিয়া নিমাইকে বলেন—দাদাকে ডাকিয়া আন। নিমাই আসে অদ্বৈতের হরি সভায়। মোহন রূপ দেখিয়া সকলে সমাধিস্থ প্রায় হইয়া যান। নিমাই অগ্রজকে ডাকিয়া গৃহে লইয়া যান—বলেন—

"ভোজনে আইস ভাই! ডাকয়ে জননী।"
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি ॥

গোরা চাঁদের রূপ মাধুরী দেখিয়া ভক্তগণ সঙ্গে অদ্বৈতাচার্য্য মনে মনে চিন্তা করেন—"প্রকৃত মানুষ কভু এ বালক নয়।"

বিশ্বরূপের বয়স ষোল বৎসর। পিতামাতা বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। একদিন কাহাকেও না বলিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

"ঈশ্বরের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কথোদিনে ॥"

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বিশ্বরূপ শ্রী শঙ্করারণ্য নাম গ্রহণ করিয়া অনন্তের পথে চলিয়া গেলেন। পিতামাতা নিদারুণ বেদনাহত হইয়া অনেক আর্ত্তনাদ করিলেন। বন্ধু-বান্ধব সজ্জনগণ প্রবোধ দিয়া বলিলেন—

"গোষ্ঠীয়ে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটি কুলের হয় শ্রী বৈকুণ্ঠে বাস ॥

অগ্রজের বিরহ ব্যথায় গোরাচাঁদও কাতর হইলেন। তাঁহার বাল-চাপল্য তদবধি কমিয়া গেল। সর্ব্বদাই পিতামাতার কাছে থাকেন। যাতে তাঁরা দাদার বিয়োগ দুঃখ ভুলিতে পারেন।

"নিরবধি থাকে পিতা-মাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরয়ে যেন জননী জনকে ॥"

পাঠবন্ধ-পাঠারম্ভ

নিমাইয়ের মেধা ও সুতীক্ষ্ণ বিচার শক্তি দেখিয়া সকলে প্রশংসা করেন। জননী শুনিয়া হর্ষান্বিত হন। কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র বিমর্ষ হন। তিনি ভাবেন সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া বিশ্বরূপ বুঝিল—"সংসার সত্য নহে।" তাই সে অনিত্য সংসার ছাড়িয়া গেল। নিমাইয়েরও এই রূপ হইবে। সুতরাং পড়াশুনা করাইয়া কোন লাভ নাই। মূর্খ হউক, তবু গৃহে থাকুক। শচীদেবীকেও ইহা বুঝাইয়া দিয়া মিশ্রবর নিমাইকে কহিলেন—

মিশ্র বোলে, 'শুন বাপা! আমারি উত্তর ॥
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক তোমার।'

জনকের বাক্যে নিমাই পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিলেন।

একদিন গৌরসুন্দর ত্যক্ত উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির ওপর গিয়া বসিলেন। মা বলিলেন, এত বড ছেলে হয়েছ—ও স্থান যে অপবিত্র; ওখানে বসিলে স্নান করিতে হয়—এটুকুও বুঝ না? মায়ের কথায় গৌরহরি উত্তর করিলেন—

"তোরা মোরে না দিস্ পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মুর্খ বিপ্র জানিব কেমতে?"

মা বলিলেন—তুই স্নান করে ঘরে আয়। তোর বাবা যদি আসিয়া দেখে তবে অনর্থ হবে। নিমাই বলিলেন পড়িতে না দিলে, এখান হইতে নড়িব না।

"প্রভু বোলে, যদি মোরে না দেহ পড়িতে।
তবে মুঞি নাহি যাঙ কহিলুঁ তোমাতে ॥"

শচীদেবী স্বামীকে বলিলেন—পুত্রকে পড়িতে দেও না, সে জন্য তার মনে নিদারুণ ব্যথা। অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবেরাও বলিলেন—নিমায়ের পড়া বন্ধ করা ঠিক নয়। মিশ্রবর বিশ্বম্ভরকে আবার পড়িতে আদেশ দিলেন।

তারপর মিশ্র পুরন্দর যথাশক্তি সমারোহ করিয়া পুত্রকে যজ্ঞোপবীত

দিলেন। যজ্ঞসূত্র ধারণে যে শোভাটি হইল, তাহা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ধ্যান-নেত্রে দেখিয়া বলিয়াছেন—

"শোভিল শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র মনোহর।
সূক্ষ্মরূপে 'শেষ' বা বেড়িলা কলেবর॥"

অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য-তেজ সর্ব্ব অঙ্গে ফুটিয়া উঠিল ঃ পুত্রের অঙ্গশোভা দেখিয়া পিতামাতা আনন্দে অধীর হইলেন।

একদিন গৌরহরি জননীকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—মা একটি কথা আমার তোমাকে শুনিতেই হইবে।

মা বলিলেন, "বাপ যা বলিবি নিশ্চয় শুনিব।" গোরাচাঁদ কহিলেন—"মা, একাদশী দিনে ভোজন করিবে না। জননী বলিলেন—নিশ্চয়ই করিব না।

"কদাপি মাত র্হরিবাসরে ত্বয়া
ন কার্যমেবাদনমিত্যসৌ পুনঃ।
জগদ পশ্চাত্তনুজোদিতং শচী
সমাদদে নির্ভরভাগ্যভূষিতা॥ কর্ণপুর-২।১১০

প্রভু কহিলেন, "মাতঃ আপনি কদাচ হরিবাসরে ভোজন করিবেন না।" ভাগ্যবতী শচীও পুত্রের কথিত বিষয় স্বীকার করিলেন।

বিদ্যার্থী নিমাই

পিতার আদেশে গৌরহরি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্ত্তি হইলেন। মিশ্র পণ্ডিতকে বলিলেন—"পুত্র আমি দিনু তোমা স্থানে, পঢ়াইবা শুনাইবা সকল আপনে।" গঙ্গাদাস বলিলেন—"পঢ়াইমু যত শক্তি আছয়ে আমার।"

দুইটি বছরের মধ্যে গৌরাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন। বালকের ধী-শক্তি দেখিয়া সকলে বিস্ময়াবিষ্ট। "দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।"

এই সময় মিশ্রপুরন্দর জগন্নাথ স্বর্গারোহণ করেন। গৌরহরির বয়স তখন দশ বছর। পিতৃশোকে নিমাইচাঁদ বিস্তর কাঁদিলেন। পুত্রশোকে-পতিশোকে বিহ্বলা জননীকে গৌরহরি অনেক অনেক সান্ত্বনা বাক্য কহিলেন। বলিলেন, "মাতঃ, সংসারে সকলই নশ্বর। কাহারও জন্য শোকাকিভূত হইতে নাই।" জননীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিমাইচাঁদ এই সকল কথা কহিলেন। শুনিয়া তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

নিমাই আবার পাঠে মন দিলেন। পিতার অনেক স্মৃতি-ও ন্যায়ের গ্রন্থ ছিল। সেগুলি নিমাই নিজে নিজেই পাঠ করিয়া গম্ভীর ভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। অত্যল্প কাল মধ্যেই গোরাচাঁদ ব্যাকরণে, অলঙ্কারে, স্মৃতিও ন্যায়শাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তি লাভকরিলেন।

অত্যল্পকাল মধ্যে সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন। ইহাতে বোধ হইল—সাগর অভিমুখী নদীর ন্যায় সমুদয় বিদ্যা যেন অত্যুৎসুক হইয়া তাঁহাতে স্বয়ং গিয়া প্রবেশ করিলেন—

গুরোর্গৃহে সম্বসতা.মহাধিয়া
সমস্তবিদ্যাঃ সকৃতার্থতাঃ কৃতাঃ।
ক্ষণেন তস্মিন্ বিবিশুশ্চ তাঃ স্বয়ং
পয়োনিধৌ নদ্য ইবোৎসুকা ভৃগম্॥ কর্ণপুর ২।১১৬

নিমাই পণ্ডিত

ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিদ্যার্থী নিমাই, "পণ্ডিত নিমাই নামে সারা দেশময় বিখ্যাত হইয়া গেল। পণ্ডিতদের শাস্ত্রের কঠিন বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্ক করা, খণ্ডন-মণ্ডন করা ইহাই ছিল নিমাই পণ্ডিতের যেন স্বভাবগত ধর্ম্ম। পথে, ঘাটে, গঙ্গার তটে পণ্ডিত কাহাকেও দেখিতে পাইলেই হইল। "এস শাস্ত্র বিচার কর" বলিয়া তাহাকে লইয়া বসিতেন। কূটপ্রশ্ন তুলিয়া সকলকে পরাস্ত করিয়া ফেলিতেন। তখন নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ, সভ্য সজ্জনগণ নিমাই পণ্ডিতকে দেখিলেই ভয় পাইত। ঐ নিমাই আসিতেছে দেখিলেই তাহারা অলি-গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িত।

যাহারে যে জিজ্ঞাসেন শ্রীগৌরসুন্দর।
হেন নাই পঢ়ুয়া যে দিবেক উত্তর॥
আপনি করেন তবে সূত্রের স্থাপন।
শেষে আপনার ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন॥
কিবা স্নানে, কি ভোজনে, কিবা পর্য্যটনে।
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে॥

মহাভাগ্যবান মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে চণ্ডীমণ্ডপে গৌরহরি টোল খুলিলেন। চারিদিক হইতে অগণিত ছাত্র ছুটিয়া আসিতে লাগিল। পরম আদর-যত্নে

শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ উদঘাটন করিয়া নিমাই পণ্ডিত ছাত্রগণকে বিদ্যারসে ডুবাইয়া দিতেন।

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া

শ্রী গৌরসুন্দর শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া ফিরিতেছেন। পথিমধ্যে অনির্ব্বচনীয়া স্বর্ণলতার মত লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হইল। এই হেমলতা বল্লভাচার্য্যের কন্যা। স্বয়ং লক্ষ্মী। বনমালী আচার্য্যের মধ্যস্থতায় শচীমাতার ইচ্ছায় শুভ বিবাহ সংঘটিত হইল। নব-দম্পতি দর্শন করিয়া লোকে অপূর্ব্ব সব মন্তব্য করিতে লাগিল—

কেহ বলে "ইন্দ্র শচী, রতি বা মদন।"
কোন নারী বোলে "এই লক্ষ্মী-নারায়ণ॥"

নববধূ গৃহে আসিতেই গৃহ পদ্ম গন্ধে ভরিয়া গেল। শচী জননী একটু চিন্তা করিয়া বুঝিলেন—

আই কহে বুঝিলাম কারণ ইহার
এই কন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার।

কেবল শচীদেবীর গৃহই যে আনন্দময় হইল তাহা নহে। সমস্ত নবদ্বীপ-ভূমিই পরম সুখময় হইয়া উঠিল। কবি কর্ণপুরের ভাষায়—

গেহে গেহে সমজনি সদা মূৰ্ত্তিমত্যেব লক্ষ্মীঃ
স্থানে স্থানে সুখসমুদয়ো মূৰ্ত্তিমানেব ভূতঃ।
নিত্যং নিত্যং নবনবমভূৎ প্রেম সর্ব্বস্য নাথে
স্বৈরং স্বৈরং বিলসতি তদা শ্রীনবদ্বীপভূমৌ॥

কবিকর্ণপুর ১১।৮৮

ভক্তনাথ গৌরচন্দ্র নবদ্বীপভূমিতে স্বেচ্ছাক্রমে বিলাস করিতে থাকিলে-তৎকালীন লক্ষ্মীদেবী মূৰ্ত্তিমতি হইয়া সর্ব্বদা প্রতি ভবনে বিরাজ করিতে ছিলেন। সেখানে সুখ সমুদয়ও মূৰ্ত্তিমান হইয়াছিল। নিত্য নিত্য নূতন নূতন প্রেম-মাধুর্য্যও আবির্ভূত হইতে লাগিল। শচীজননীর গৃহ আনন্দপূর্ণ। শাশুড়ী-পুত্রবধূর সম্বন্ধ কি সুন্দর।

বশ ভেল শচীদেবী বধূর চরিতে।
পুলকিতা বধূ শচী মাতার পিরীতে॥

দিগ্‌বিজয়ীর দর্পচূর্ণ

দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মিরী নবদ্বীপে আসিয়াছেন। বিচারে তাঁহাকে কেহ পরাস্ত করিতে পারে নাই। নবদ্বীপে তিনি জয়ী হইয়া গেলে নবদ্বীপের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হইবে। তার সম্মুখে বিচারে বসিতে কাহারও সাহস নাই।

একদিন গঙ্গাতটে গৌরসুন্দর বসিয়া আছেন ছাত্রগণ সঙ্গে। দিগ্‌বিজয়ী সেখানে উপনীত হইলেন। প্রভুর রূপলাবণ্য দেখিয়া দিগ্বিজয়ী মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। গৌরহরি বলিলেন "আপনি কিছু গঙ্গার মহিমা কীর্ত্তন করুন। বলা মাত্র পণ্ডিত, অনর্গল শ্লোক বলিতে লাগিলেন। সকলে স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন ইনি সরস্বতী বরপুত্র।

গৌরসুন্দর তখন তাহার বর্ণনার মধ্য হইতে একটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া তাহার ব্যাখ্যান শুনিতে চাহিনে। দিগ্বিজয়ী স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

ঝড়ের মত আমি শ্লোক পড়িল
তাহা হৈতে এক শ্লোক কৈছে কণ্ঠ কৈল।

গৌরহরি বলিলেন, সরস্বতীর কৃপায় কেহ দিগ্বিজয়ী হয়, যেমন আপনি হয়েছেন। আর কেহ বা শ্রুতিধর হয়। তিনি বুঝিলেন নিমাই শ্রুতিধর। দিগ্বিজয়ী শ্লোকের ব্যাখ্যান করিলেন। গৌরসুন্দর তার মধ্যে পাঁচটি দোষ দেখাইয়া দিলেন। পরাভব হেতু দিগ্বিজয়ীর মুখ মলিন দেখিয়া গৌরসুন্দর কহিলেন—

তুমিও হইলা ভ্রান্ত অনেক পঢ়িয়া
নিশাও অনেক যায় শুই থাক গিয়া।

দিগ্বিজয়ী গৃহে গিয়া সরস্বতীর মন্ত্র জপিলেন। মন্ত্রবলে মা সরস্বতী উদিতা হইলেন। পণ্ডিত বলিলেন—তুমি মা সর্ব্বদা আমার জিহ্বায় থাকিবে এই বর দিয়াছ। আজ কেন থাকিলে না। শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ায় নিমাই পণ্ডিতের কাছে পরাস্ত হইলাম কেন? মা উত্তর দিলেন—তুমি যাঁর সঙ্গে বিচার করিতেছিলে তিনি আমার প্রভু। তাই লজ্জায় সরিয়া গিয়ছিলাম,

আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখে হইতে আপনাকে লজ্জা বাসি॥

উষাকালে গৌরহরি গাত্রোত্থান করিয়া গঙ্গাস্নান চলিয়াছেন। এমন সময় দিগ্বিজয়ী চরণে দণ্ডবৎ করিলেন। প্রভু তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। পণ্ডিত

বলিলেন, 'প্রভু তুমি সাক্ষাৎ সরস্বতী পতি। শুভক্ষণে নবদ্বীপ আসিয়া ধন্ত হইলাম ; কিছু আদেশ দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। শ্রীগৌরসুন্দর কহিলেন শুন দিগ্বিজয়ী—

'দিগ্বিজয় করিব' বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সে বিদ্যায় সত্য কহে॥
... ...
এতেক ছাড়িয়া বিপ্র! সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল॥
... ...
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি হয়॥

পূর্ব্ব-বঙ্গ বিজয়

নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি
সর্ব্ব নবদ্বীপে সর্ব্ব লোক হৈল ধ্বনি।

শুধু নবদ্বীপে নয় সারা বঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের কথা ছড়াইয়া গেল। তাহার রচিত ব্যাকরণের টীকা ও ন্যায় শাস্ত্রের টিপ্পনী সর্ব্বত্র পঠন-পাঠন হইত। পূর্ব্ববঙ্গেও। সেখানকার পণ্ডিতরাও নিমাই পণ্ডিতকে দর্শনের জন্য আকুল হইয়াছিল। হঠাৎ একদিন ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা জাগিল পূর্ব্ববঙ্গ দেখিতে। আপ্ত শিষ্যবর্গ লইয়া যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীহট্ট জেলায় গোরাচাঁদের পিতৃভূমি। ঐ স্থান নানাপ্রকারে সমৃদ্ধ। তাই শ্রীহট্টের অপর নাম শ্রীভূমি। সেখানে ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে জগন্নাথ মিশ্রের পিতৃভূমি। জগন্নাথ মিশ্রের মাতৃদেবী শোভাময়ী তখনও দেহে বিদ্যমান আছেন। তাঁহাকে দেখা দিবেন এই ছিল গোরাচাঁদের মনে সংকল্প।

নিমাইচাঁদ মাতৃগর্ভে আসেন ঢাকা-দক্ষিণগ্রামে। পিতামহী স্বপ্নে দেখেন তাঁর পুত্রবধূর গর্ভে স্বয়ং নারায়ণ আসিবেন। তিনি গঙ্গাতীরে জন্মিবেন। স্বপ্ন দেখিয়া তিনি পুত্র ও পুত্রবধূকে নবদ্বীপ পাঠাইয়া দেন। বলিয়া দেন পুত্র জন্মিলে আমাকে দেখাইও। গৌরহরি জননীর মুখে ঐকথা শুনিয়াছেন—

তাই শ্রীভূমির প্রতি আকর্ষণ। সত্যসন্ধ গৌরচন্দ্র পিতামহীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র গৌরহরি পরম আদরে ও সম্মানে গৃহীত হইলেন। সকলে বলিলেন—আমা সবাকার মহাভাগ্যোদয় বশতঃ এদেশে তোমার শুভ বিজয় হইল। তুমি বৃহস্পতির অবতার। তুমি ঈশ্বরের অংশ। নতুবা এমন পাণ্ডিত্য মানুষে সম্ভব হয় না। আমাদিগকে "বিদ্যাদান কর। আমাদের শিষ্য কর।"

বঙ্গদেশে পদ্মানদী দেখিয়া গৌরসুন্দরের প্রাণে পরম আনন্দের উদয় হইল। পদ্মার পুলিন, পদ্মার তরঙ্গ, পদ্মার স্রোত সবই মনোহারী। জাহ্নবীর জলে যে ক্রীড়া করিয়াছেন, সেই জলখেলা পদ্মানদীতেও করিলেন।

সেই ভাগ্য ইবে পাইলেন পদ্মাবতী
প্রতিদিন প্রভু জলক্রীড়া করে তথি॥

তরঙ্গহস্তৈঃ শফরীবিলোচনৈঃ
নিতম্বরূপৈঃ পুলিনৈর্বিসারিভিঃ।
পদ্মাবতী তুল্যগুণা মৃগীদৃশাং
চকার কৌতুহলমস্য শাশ্বতাম॥ ৩।৯৩ কর্ণপুর।

গৌরসুন্দরের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য পদ্মাবতী মৃগলোচনা কামিনীগণের ন্যায়—তরঙ্গরূপ কর, সফরীরূপ নেত্র ও পুলিন রূপ প্রশস্ত নিতম্ব বিস্তার করিয়া মধুর রসের সেবা সাধন করিলেন।

পদ্মাদর্শনে গৌরহরির আনন্দ। গৌরহরির দর্শনে পদ্মাবতীর আনন্দ। দূর হইতে সমাগত বহু নরনারী গোরাচাঁদের রূপমাধুর্য্য দর্শনে বিমোহিত হইলেন।

এই সময় হইতেই গৌরহরি বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সকলকে বলিতে লাগিলেন—"পবিত্র শাস্ত্রীয় আচারে থাক—আর সর্ব্ব-দুঃখহারী শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন কর।" অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গে অগণিত গৌরগত প্রাণভক্ত বিদ্যমান। একটিবার যেখানে তাঁহার চরণ-রেণু পতিত হইয়াছে, সেখানে তাঁর অসীম কৃপা শক্তি অদ্যাপি অনুভব করা যায়।

তপন মিশ্র নামক একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ স্বপ্নে জানিয়া গৌরহরির সাক্ষাতে উপস্থিত হন। তিনি সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। গৌরসুন্দর তাহাকে দুই চারটি কথা বলিয়া কাশী যাইতে আদেশ করেন।

বলেন—সেখানে তার সঙ্গে দেখা হবে। এই বাক্য সত্য হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায়, তিনি গৃহত্যাগ করিবেন কাশীধাম যাইবেন তাহা পূর্ব্বেই জানিতেন।

অনেক ধন, ঐশ্বর্য্য, মান যশ, খ্যাতিসহ নিমাই চাঁদ নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

হেনমতে প্রভু বঙ্গদেশ ধন্য করি।
নিজগৃহে আইলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
ব্যবহারে অর্থ বিত্ত অনেক লইয়া।
সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রভু উত্তরিলাসিয়া॥

লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব

প্রভু গৌরসুন্দর বঙ্গদেশে গমন করিলে, প্রিয়তমা লক্ষ্মীদেবী প্রভুর বিরহে অতীব কাতরা হইলেন। সর্ব্বদা যত্ন করিয়া শচীদেবীর সেবা করেন, কিন্তু নিজে কিছুতেই আহার গ্রহণ করেন না "প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন।" একাকিনী শয্যায় বসিয়া সারারাত্রি গৌর বিরহে ক্রন্দন করেন। "একেশ্বর সারারাত্রি করেন ক্রন্দন।" স্বামীর বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার সন্নিধানে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। একদিন চলিয়া গেলেন। কিভাবে গেলেন শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভাষায়—

নিজ প্রতিকৃতি দেহ থুই পৃথিবীতে।
চলিলেন প্রভুপাশে অতি অলক্ষিতে॥

শ্রীলোচন দাসজীর ভাষায়—বিরহ হৈল মূর্ত্তি সর্পের আকার।" বিরহ সর্পের দংশনে লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব হইল।

প্রভু পাদপদ্ম লক্ষ্মী ধরিয়া হৃদয়।
ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয়॥

এই সকল কথা হইতে বুঝা যায় লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব, প্রপঞ্চের জীব আমাদের মত নহে। একটি কোন বিশেষ রহস্য ইহার মধ্যে লুক্কায়িত আছে। প্রভু স্বয়ং মাকে প্রবোধ দিয়া বলিয়াছেন—

স্বামীর আগেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তার বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী॥

আমাদের মনে হয়—বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পতিরূপে পাইবার জন্য বিল্ববনে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

"যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললিতাসরেৎ তপঃ।"

দ্বাপরের সেই বাঞ্ছা আজ পূর্ণ হইল কিছুদিন অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশচীনন্দনকে প্রাণবল্লভরূপে লাভ করিয়া।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ

লক্ষ্মীদেবী স্বামিবিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। নিমাইচাঁদ গৃহে ফিরিয়া দেখেন শচীজননী বধূশোকে বেদনাহতা। নিজের বেদনা অন্তরে চাপিয়া প্রভু জননীকে প্রবোধ দিলেন। "মা, দুঃখ করিও না। ভবিতব্য কেহ খণ্ডাইতে পারে না। এই বিশ্ব সংসার ঈশ্বরের অধীন। তিনি ছাড়া সংযোগ-বিয়োগের কর্ত্তা আর কেহ নাই। তোমার পুত্রবধূ যে কে, কেন আসিল, কেন চলিয়া গেল—সব আমি জানি। তুমি তার জন্য আর শোক করিও না", বলিতে বলিতে মায়ের অশ্রুধারা নিজেই মুছাইয়া দিলেন।

পুত্রবধূ ছাড়া শচীদেবীর বুকখানা খা খা করে। অত পরিপাটি করিয়া কে নিমাইয়ের সেবা করিবে? কে এই সংসারকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে? মায়ের অন্তরে অন্য ভয়ও আছে। নিমাই পাছে বিশ্বরূপের পথ ধরে। সুতরাং আবার বিবাহ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।।

নিমাই পণ্ডিত আবার বিদ্যারসে ডুবিয়া গিয়াছেন। ছাত্রগণকে উষাকালেই পড়ান আরম্ভ করেন। দুইপ্রহর বেলা পর্য্যন্ত চলে। গঙ্গাস্নান করিয়া, পূজাদি সারিয়া—বিকাল হইতে অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত শাস্ত্র চর্চ্চা করেন। গৌরসুন্দরের নিকট একটি বছর পাঠ নিলে ছাত্রগণ পরম পণ্ডিত হইয়া যান।

শচীমা সর্ব্বদা ভাবেন, আমার নিমাইচাঁদের যোগ্যপাত্রী কোথায় মিলিবে। নবদ্বীপে বিখ্যাত রাজপণ্ডিত আছেন সনাতন মিশ্র। পরম ভাগ্যবন্ত, পরম উদার বিষ্ণুভক্ত। মহা সদ্বংশজাত। সর্ব্বদা পরের উপকার করাই তাঁর ব্রত। তাঁর একটি সুচরিতা দুহিতা আছে। দুহিতার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া।

ঐ কন্যা প্রত্যেক দিন দুই তিনবার গঙ্গা স্নান করে। প্রতিদিন শচীদেবীর সঙ্গে পথে দেখা হয়। অতি নম্রতার সহিত সে মাকে প্রণাম করে। মাও সানন্দে আশীর্ব্বাদ করেন—

আইও করেন মহাপ্রীতে আশীর্ব্বাদ।
"যোগ্য-পতি কৃষ্ণ তোমার করুন প্রসাদ॥"

আজ মাতার পুনঃপুনঃ মনে হইতে লাগিল তার কথা। ভাবিলেন—ঐ কন্যারত্ন আমার গৃহে বধূ হইয়া আসিলে আনন্দের সীমা থাকিবে না। নিমাইয়ের যোগ্যপাত্রী সেই বটে।

গঙ্গাজলে আই মনে করেন কামনা।
ঐ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা॥

শচীদেবী কাশীনাথ পণ্ডিতকে ডাকিয়া ঘটকালিতে নিযুক্ত করিলেন। কাশীনাথ অল্প সময় মধ্যেই কাজ হাসিল করিলেন। রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে আনন্দোৎসব আরম্ভ হইয়া গেল। শচীদেবীরও পরমানন্দ।

সনাতন মিশ্র গণক ডাকিলেন—বলিলেন বিবাহের লগ্ন স্থির করিয়া দেন। গণক বলিলেন—শোন মিশ্র একটি ঘটনা বলি। আমি তোমার বাড়ি আসার পথে নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হইল। আমি তাহাকে বলিলাম—কাল তোমার বিবাহের শুভ--অধিবাস। আমার কথা শুনিয়া সে উত্তর করিল—

কহ কোথা কার বিভা—কে বা কন্যা বর।

এই কথা শুনিয়া মনে হইল--এই বিবাহে তার মত নাই। সনাতন মিশ্র ও তাঁহার পত্নী দুঃখের সাগরে ডুবিল, এতদূর অগ্রসর হইয়া এখন এই বিবাহ না হইলে কি যে দুঃখ, তাহা বর্ণনীয় নহে। এই অবস্থা প্রভু জানিতে পারিলেন। শেষে একজন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন। তিনি আসিয়া সবাইকে বলিলেন—ও কথা পণ্ডিতের কৌতুক মাত্র। তখন গণক শুভফল শুভলগ্ন স্থির করিল।

বুদ্ধিমন্ত খাঁ নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ ধনী। তিনি বলিলেন, এই বিবাহের সকল ভার তাঁহার উপর। বামনিয়া বিয়া হ'বেনা—রাজকুমারের মত বিবাহ হবে। সত্যসত্যই তাহা হইল। বিবাহে এত জৌলুস হইল যে কেহ কোনদিন এমন কল্পনাও করে নাই।

শচীমাতার গৃহেও অধিবাসে প্রচুর আনন্দ। অপরাহ্নে সকলে মিলিয়া গৌরসুন্দরের বেশ রচনা করিলেন। শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করিলেন। ললাটে চন্দন দিলেন অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, তার মধ্যে উজ্জ্বল তিলক। মস্তকে অদ্ভুত মুকুট। সুগন্ধি ফুলের মালা। নয়নে কজ্জল। কর্ণমূলে সুবর্ণ কুণ্ডল। বাহুমূলে নবরত্ন

হার। বিশ্ববিনোদন সাজে নিমাই চাঁদ সাজিলেন।

প্রহরেক বেলা থাকিতেই শোভাযাত্রা বাহির হইল। প্রহর খানেক সারা নবদ্বীপ বেড়াইলেন। গোধূলি বেলায় সনাতন মিশ্রের গৃহে আসিলেন অগণিত শিষ্য-ভক্ত সহ মহাপ্রভু। রাজপণ্ডিত জামাতা বরণ করিলেন। পাদ্য অর্ঘ, আচমন, বস্ত্র, অলঙ্কার দ্বারা যথোচিত বরণ করিলেন।

রাজপণ্ডিত কন্যা দান করিতে বসিলেন। সর্ব্বাগ্রে মুখ-চন্দ্রিকা। আত্মীয় স্বজন আসনে উপবিষ্টা বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনিলেন। সাতবার প্রদক্ষিণ করাইলেন গৌরসুন্দরকে। বাদ্যভাণ্ড বাজিতে লাগিল। চতুর্দিকে স্ত্রী-পুরুষের জয়ধ্বনি উঠিল।

প্রভু প্রদক্ষিণ করি সাতবার চৌদিকে ফিরি
করজোড়ে করে নমস্কার।
অন্তঃ পট ঘুচাইলা চারিচক্ষে দেখা হৈল
দোঁহে করে কুসুম বিহরি।

মহাবাদ্য-জয়ধ্বনির মধ্যে মুখচন্দ্রিকা হইল। বিষ্ণুপ্রীতি কামনা করিয়া সনাতন মিশ্র প্রভুর শ্রীপদে কন্যা সমর্পন করিলেন।

সনাতন দ্বিজবরে কন্যা সম্প্রদান করে
পদাম্বুজে কৈল সমর্পণে।

তৎপর বেদাচার, লোকাচার, স্ত্রী-আচার সকল কর্ম্ম যথাযথ হইল। সর্ব্বশেষ হোম কর্ম্ম। তাহাও হইয়া গেল। ভোজনাদি সমাপনান্তে শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া বাসর ঘরে গমন করিলেন।

বাসর ঘরে যাইবার কালে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বামচরণের অঙ্গুলিতে হোচট্ লাগে। অল্প রক্তপাত হয়। এইজন্য দেবী অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন দেখিয়া প্রেমময় প্রভু গৌরহরি নিজ পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ক্ষতস্থান টিপিয়া ধরেন। ইহাতে দেবীর সমস্ত দুঃখ তখনই দূরীভূত হইল।

কিন্তু শুভ বিবাহের রাত্রে ঐরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মনঃক্লেশে স্পন্দনহীন হইয়া পড়েন। শ্রী গৌর সুন্দর তখন প্রাণ প্রিয়তমাকে অভয় দান করিয়া, আনন্দসাগরে ভাসাইতে ভাসাইতে বাসর ঘরে লইয়া যান। এই বিবাহে সনাতন মিশ্র গোষ্ঠীর যে আনন্দ হইল তাহা অতুলনীয়। তবে তুলনা যদি দিতেই হয়—

লগ্নজিত, জনক, ভীষ্মক, জাম্বুবন্ত।
পূর্ব্বে তারা যেহেন হইলা ভাগ্যবন্ত॥
সেই ভাগ্য এবে গোষ্ঠীসহ সনাতন।
পাইলেন পূর্ব্ব বিষ্ণুসেবার কারণ॥

পরদিন অপরাহ্নে গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল দোলায় চড়িয়া গৃহে ফিরিলেন। দোলার শোভার বর্ণনা দিয়াছেন কবি কর্ণপুর—

সন্তপ্তচামীকর গৌর দেহো
দোলামুপেতঃ শরদভ্রশুভ্রাং।
দুগ্ধাম্বুরাশেরুপরি প্ররূঢ়ং
শৃঙ্গং সুমেরোঃ স জিগায় সদ্যঃ॥ ৩।১৪০ কবি কর্ণপুর।

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের আশ্চর্য শোভার কথা আর কি বলিব। তাঁহার শ্রীদেহ, দাহোত্তীর্ণ সুবর্ণ অপেক্ষাও গৌর বর্ণ। তিনি শরৎকালীন মেঘতুল্য শুভ্র দোলায় আরোহণ করিয়া যেন দুগ্ধসাগরের উপরিস্থ সুমেরুর শৃঙ্গকে জয় করিয়াছিলেন।

পথে পথে নবদ্বীপের সহস্র সহস্র নরনারী গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল দর্শনে আনন্দে অধীর হইয়া পরস্পর বলাবলি করতে লাগিলেন—

কেহো বোলে. "এই হেন বলি হর-গৌরী"
কেহো বোলে, "এই দুই—কামদেব-রতি।"
কেহো বোলে, "ইন্দ্র-শচী-লয় মোর মতি॥
কেহো বোলে, "হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।
এইমত বোলে সর্ব্ব সুকৃতি-বনিতা॥

এই নদীয়া যুগল আজও অপনিত ভক্ত-সাধকের নিত্য ধ্যানের সম্পদ। রূপশোভা দেখিয়া পথিমধ্যে সুকৃতি বনিতারা যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহারা কেহই দুজনের সম্বন্ধের গভীর তলদেশে প্রবেশ করিয়াছেন এমন মনে হয় না। পাখির যেমন দুইটি ডানা—ভালবাসার তদ্রূপ দুইটি অবলম্বন—সম্ভোগ আর বিপ্রলম্ভ। মিলন আর বিরহ। যেখানে বিরহ নাই, সেখানে মিলনান্দের মাধুর্য্যও নাই।

হর-গৌরী, রতি-কাম, কমলা-শ্রীহরি—কাহারও বিরহ রসের আস্বাদন নাই। সুতরাং মিলনের বিশেষ মাধুর্য্য নাই। রাম-সীতার বিরহ আছে—তাহা স্বাভাবিক নয়। একটি দুর্ঘটনা—রাবণ কর্ত্তৃক চুরির ফলে সীতার বিরহ

কয়েকমাস। প্রজারঞ্জনের জন্য, বনে দেওয়াও এক দুর্ঘটনা। তার মধ্যেও বিরহের বেদনা দৃষ্ট হয় না। বিরহের আস্বাদনের তীব্রতা শ্রীরাধাকৃষ্ণেই পর্যাপ্ত—এই জন্য তাঁহাদের মিলনও রসপুষ্ট। সুতরাং গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণই তুলনীয়। তাঁহাদের তুলনা দেওয়া হয় নাই। শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া—ব্রজের ও নদীয়ার এই দুই যুগলে আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য এই—ব্রজের নায়িকা পরকীয়া। নদীয়ার নায়িকা স্বকীয়া। পরকীয়ার উজ্জ্বলতার হেতু দুর্লভতা। এই দুর্লভতা রাধাকৃষ্ণে সর্বদাই আছে। সীতা-রামাদি কোন স্বকীয়াতে নাই। কিন্তু কয়েক বৎসর পর বিষ্ণুপ্রিয়া ও গৌরাঙ্গে যে দুর্লভতা সৃষ্টি হইয়াছিল—তাহা ব্রজমাধুরী অপেক্ষাও গভীর ও নিবিড়।

শ্রীরাধা জানিতেন প্রাণনাথের চন্দ্রবদন দর্শন পাইবেনই—কারণ তিনি বাক্য দিয়াছেন "আসিবেন"। কুরুক্ষেত্রে দর্শনাদি হইয়াছেও। আর প্রিয়াজী জানেন--জীবনে আর কোনও দিন প্রাণনাথের বদন দর্শন পাইবেন না। শ্রীরাধা জানিতেন, মথুরায়, দ্বারকায় যেখানেই থাকুন রাজৈশ্বর্য্যে সুখেই আছেন। শ্রীপ্রিয়াজী জানিতেন—নীলাচলের পথে, দক্ষিণদেশের পথে, বৃন্দাবনের পথে নিঃসম্বল পথকষ্টে চলিতেছেন। যখন নীলাচলে তখনও কলাব শুষ্ক পাতায় শয়ন করেন—শত চেষ্টা করিয়াও জগদানন্দ একটুও তেল মাখাইতে বা তুলার শয্যায় শোয়াইতে পারেন নাই। প্রিয়তম এত কঠোরতায় থাকেন এই ভাবনা বিরহ দুঃখকে তীব্রতর করে। বিরহের দিনগুলি প্রিয়াজী যে ভাবে কাটাইতেন তাহা বিশ্বজগতে অতুলনীয়।

সন্ন্যাসী হবেন জানিয়াও কেন প্রিয়াজীকে গ্রহণ করিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর ইহাই মনে হয়—বিশ্বজগৎকে একটি হরি বিরহের সর্ব্বোজ্জ্বল বিগ্রহ দর্শন করাইবেন।

পরমানন্দে শচী-আই বধূকে গৃহে আনিয়া হর্ষসমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন।

জয়ধ্বনিময় হৈল সকল-ভুবন
কি আনন্দ হৈল সে অকথ্য কথন ॥

গয়া বিজয়

নিমাইচাঁদের অন্তরে ইচ্ছা জাগিল গয়া যাইবেন পিতৃকার্য করিতে। সঙ্গে চলিলেন মেসো চন্দ্রশেখর ও ছাত্রগণ। গৌরসুন্দরের বয়স তখন সতেরো। চলিলেন পদব্রজে গয়াধামে।

সেখানে আছেন গয়াসুরের শিরে বিষ্ণু পাদপদ্ম। তাহা দর্শন-স্পর্শন মাত্র গৌরসুন্দরের প্রেমানন্দের উদয় হইল। পদ্মনয়নে অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। লোমহর্ষন, কম্পন, অঙ্গের বিবর্ণতা দেখা দিল। এই হইতে প্রেমভক্তি প্রকাশের আরম্ভ হইল।

সর্ব্বজগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।
প্রেমভক্তি-প্রকাশের করিলা আরম্ভ॥

দীক্ষা গ্রহণ

দৈবযোগে ঈশ্বর ইচ্ছায় মাধবেন্দ্র পুরী গোসাঞির প্রিয় শিষ্য ঈশ্বরপুরী সেখানে উপস্থিত। শ্রীগৌরহরি ঈশ্বরপুরীকে নমস্কার করিলেন। ঈশ্বরপুরীও তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। দুজনের নয়নের জলে দুজনের দেহ ভিজিয়া গেল। প্রভু বলিলেন, তোমার চরণ দর্শনে আমার গয়া যাত্রা সফল।

গৌরসুন্দর বলিলেন—গোসাঞি, তুমি আমাকে সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর। এই দেহ আমি তোমাকে সমর্পণ করিলাম। তুমি আমাকে অমৃত রস পান করাও।

তব পদাম্বুজযুগ্মমিদং প্রভো
বহুল ভাগ্যভরেণ বিলোকিতম্।
বদ যথা হরিভক্তি গুণাম্ভবেৎ
প্রভবতো ভবতোয়ধিশোচনম্॥ ৪।৫৮ কবি কর্ণপুর।

যে প্রকার হরিভক্তির গুণপ্রভাবে ভব-সমুদ্র পার হইতে পারি আমাকে সেই মত উপদেশ প্রদান করুন।

গৌরহরি ঈশ্বরপুরী স্থানে মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন। পুরী গোসাঞি তাঁহাকে দশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিলেন। তখন গোসাঞিকে প্রদক্ষিণ করিয়া গৌরসুন্দর কহিলেন —

এই দেহ আমি দিলাম তোমারে
হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে॥

একদিন প্রভু নিভৃতে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করিতে করিতে আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন—

আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চৈস্বরে
কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া আমারে।

যে প্রভু ছিলেন পরম গম্ভীর। আজ তিনি কৃষ্ণপ্রেমে অস্থির। কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৌরহরি প্রেমের আবেশে রাত্রিশেষে মথুরা অভিমুখে চলিলেন। তখন হঠাৎ দৈব-বাণী শুনিলেন এখন মথুরায় যাইও না। নবদ্বীপে যাও।

"এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি!
যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে।
নবদ্বীপে নিজ-গৃহে চলহ এখনে॥

আকাশবাণী শুনিয়া গৌরসুন্দর ফিরিলেন। চন্দ্রশেখর ও শিষ্যবর্গের সহিত নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নবদ্বীপে প্রেমভক্তির উদয়

গয়ায়া ইত্যেবং স্বগৃহম গমদ্ভুরিকরুণঃ
প্রভুঃ পৌষস্যান্তে সকল তনুভৃত্তা পশনঃ।
অত মাঘস্যাদৌ নিরবাধ নৈজৈঃ কীর্ত্তন রসৈঃ
প্রকাশং চাবেশং ভুবি বিকিরতি স্মানুদিবসম্॥

৪।১৬ কবি কর্ণপুর।

সকল জীবের তাপ উপশমনকারী দয়ালপ্রভু গৌরসুন্দর পৌষ মাসের শেষে গয়া হইতে গৃহে আগমন করিলেন। মাঘ মাসের প্রথম দিন হইতে নিজ কীর্ত্তনরস দ্বারা প্রকাশ ও আবেশ দিন দিন পৃথিবীতে বিকিরণ করিতে লাগিলেন।

গয়াধাম হইতে ফিরিলেন। আর সেই নবদ্বীপের অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিত নাই। নাই আর সেই বিদ্যাদৃপ্ত তর্ক-কুশল নিমাই। আছেন কৃষ্ণপ্রেমে গদগদ, কৃষ্ণবিরহে উন্মাদ এক হরিভক্ত শিরোমণি। আর বিদ্যা চর্চ্চা নাই, শাস্ত্রপাঠ নাই। আছে কেবল রোদন আর অশ্রু বর্ষণ।

অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত ইহারা সকলেই পূর্ব্ব হইতেই বৈষ্ণব মার্গের শ্রেষ্ঠ সাধক। গৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব মহিমা দর্শনে ইহারা বিস্ময়ান্বিত ও অমৃত সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। গোরাচাঁদের "হা কৃষ্ণ" বলিয়া বুক ফাটা আর্ত্তনাদ শুনিয়া সকলে অনুভব করিলেন সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম মূর্ত্ত হইয়া ধরায় নামিয়া আসিয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীবাসের শ্রীঅঙ্গনে আনন্দের হাট বসিল। নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটিতে লাগিল। নিমাই যে সাধারণ মনুষ্য নহে ইহা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিল। মধুময় হরিনাম, খোল-করতালে নর্ত্তন কীর্ত্তন অবিশ্রাম চলিতে লাগিল। কখনও গৌরহরি ভক্তগণকে উপদেশ দেন কৃষ্ণভজনের। কখনও কোথা যাব, কোথা গেলে কৃষ্ণ পাব বলিয়া আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করেন। কখনও নাচেন, সোনার দণ্ডের মত হাত দু'টি উর্দ্ধে তুলিয়া। কখনও ধূলায় গড়ান, অশ্রুধারে ভাসেন, আর সকলকে ভাসান। এই স্বর্গীয় দৃশ্যের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা মুরারী গুপ্ত, বাসুদেব ঘোষ প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে কবি কর্ণপুর লিখিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যে—

ইতি ক্ষণোৎক্ষিপ্ত সমস্ত চেষ্টিতঃ
প্রতিক্ষণঃ সায়তি নির্ভরং মুহুঃ।
পদে পদে রোদিতি রোমহর্ষনৈঃ
বিমুক্তকণ্ঠং করুণাপয়োনিধিঃ॥ ৪।৭৭

করুণার মহাসমুদ্র গৌরসুন্দর আনন্দ আস্বাদনে সমস্ত চেষ্টা আক্ষিপ্ত। প্রতিক্ষণে রোমাঞ্চের সঙ্গে মুক্তকণ্ঠে গান করেন। আর প্রতিপদে বারংবার উচ্চরোদন করিতে লাগিলেন।

ভক্তগোষ্ঠি

কে জানে কে খবর দিল। চারিদিক হইতে প্রিয় পার্ষদবর্গ ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। গৌরসুন্দরের অন্তরের গভীর আকর্ষণেই এই আগমন।

শান্তিপুর হইতে অদ্বৈত আচার্য্য আসিলেন। যিনি গঙ্গাজল-তুলসী-দিয়া অনেক কাঁদিয়াছেন মদনগোপালকে অবতরণ করাইতে। পূর্ব্ব প্রান্তীয় চট্টগ্রাম হইতে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি আসিয়াছেন—যাঁকে প্রভু "বাপ; বাপ" বলিয়া আনিয়াছেন। ফুলিয়া হইতে আসিয়াছেন হরিদাস ঠাকুর। মুসলমান হইয়া হরিনাম করে এইজন্য মুলুকপতি যাঁহাকে বাইশ বাজারে কঠোর বেত্রাঘাত করিয়াছে। তখন যে বলিয়াছে—

খণ্ড খণ্ড হয়ে যদি যায় দেহ প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥

হরিদাস অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য। সর্ব্বদা নামানন্দে বিভোর থাকেন। লোকে বলে নাম-ব্রহ্মের অবতার।

ভারতের সকল তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছেন নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দের জন্মস্থান, রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রামে। বার বছর বয়সে তাঁর পিতা হাড়াই পণ্ডিত পুত্রকে দান করেন এক সন্ন্যাসীর হাতে। সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে সকল তীর্থ ঘুরিয়াছেন। তারপর বৃন্দাবন পৌঁছিয়া বলরামের ভাবে বিভাবিত হইয়া—কেবল ভাই কানাইকে খুঁজিয়াছেন। কোথায় প্রাণের ভাই কানাই বলিয়া পাগলের মত ছুটিয়াছেন। যাকে পেয়েছেন তাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। শেষে একজন ভক্ত তাঁকে বলিয়া দিয়াছে—"তোমার কানাই ভাই এখন গৌড়দেশে—গৌরবেশে।" তাই প্রবল বেগে ছুটিয়া আসিয়াছেন গভীর অনুরাগে। নবদ্বীপে পৌঁছিয়া নন্দন আচার্য্য নামক একজন নিষ্কিঞ্চন ভক্তগৃহে লুকাইয়া আছেন।

নিত্যানন্দ মিলন

একদিন প্রভাতকালে শ্রীগৌরহরি হরিদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন—তোমরা খুঁজিয়া দেখ নবদ্বীপ ভরিয়া, কে আসিয়াছেন। আমি কাল স্বপ্নে দেখিয়াছি—এক দিব্য স্বর্ণকান্তি পুরুষ আমাকে বলিয়াছেন—"তোমাতে আমাতে কাল হ'বে পরিচয়।" ইঁহার আগমনের কথা আমি পূর্ব্বেও তোমাদের বলিয়াছি।

শ্রীবাস ও হরিদাস সারাদিন সকল নবদ্বীপ ঘুরিয়া আসিয়া প্রভু গৌরহরিকে বলিলেন—আগন্তুক কোন মহাত্মার কোন সন্ধান কোথাও পাইলাম না। প্রভু বলিলেন চল আমার সঙ্গে। জয়কৃষ্ণ বলিয়া সকল ভক্তগণ উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। প্রভু গৌরসুন্দর বরাবর গিয়া উপস্থিত হইলেন নন্দন আচার্য্যের গৃহে। সকলে দেখিলেন "কোটি সূর্য্যসম" এক পুরুষ রতন সেখানে বসিয়া আছেন। তাঁর সম্মুখে গৌরসুন্দর পার্ষদগণ সহ দণ্ডায়মান হইলেন—নিতাই একদৃষ্টে গৌরসুন্দরের রূপ দেখিতেছেন—

"রসনায় লেহে যেন দরশনে পাণ
ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায় ঘ্রাণ।"

গৌরসুন্দর শ্রীবাস পণ্ডিতকে ইঙ্গিত করিয়া ভাগবতের একটি শ্লোক পড়িতে নির্দ্দেশ দিলেন। শ্রীবাস শ্লোক পড়িলেন। শ্লোকে কৃষ্ণের রূপের মাধুর্য্য ও বেণুর মাধুর্য্যের কথা। শ্লোকখানি পূর্ব্বরাগবতী গোপীগণের কণ্ঠে উচ্চারিত। শ্রীনিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের পূর্ব্বরাগ—পূর্ব্বরাগের পর

এই প্রথম মিলন—তাই শ্লোকখানি ভাবানুকুল। শ্লোক শ্রবণমাত্র নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত। পরমানন্দে মহামূর্চ্ছা। গৌরহরি শ্রীবাসকে আবার ঐ শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন। শ্লোক শুনিয়া মূর্চ্ছা দূর হইল। আনন্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তারপর উন্মাদের মত উচ্চৈস্বরে সিংহনাদ করিলেন। পৃথিবীর উপর গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। নয়নের ধারায় সকল দেহ সিক্ত হইয় গেল। কি অদ্ভুত ভাববিকার—

বিশ্বম্ভর মুখ চাহি ছাড়ে ঘনশ্বাস।
অন্তরে আনন্দ-ক্ষণে ক্ষণে মহা হাস।
ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে গড়ি, ক্ষণে বাহুতাল।
ক্ষণে জোড়েজোড়ে লাফ দেই দেখি ভাল॥

অদ্ভুত কৃষ্ণপ্রেমের উন্মাদ দর্শন করিয়া ভক্তগণ আনন্দে কাঁদিতে লাগিলেন। গৌরসুন্দরের নয়নের ধারা বহিতে লাগিল। তিনি নিত্যানন্দকে আপনার কোলে লইয়া বসিলেন—

বিশ্বম্ভর কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ
সমর্পিয়া প্রাণ তারে হইলা নিষ্পন্দ
যার প্রাণ তারে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া
আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া।

তখন নিত্যানন্দ চৈতন্যের অনেক আলাপ হইল। কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না।

নিত্যানন্দ-চৈতন্যের অনেক আলাপ।
সর্ব্বকথা ঠারেঠোরে, নাহিক প্রকাশ॥

শচী আইর স্বপ্ন

একদিন নিশিশেষে শচীমাতা এক মধুর স্বপ্ন দেখেন। পরদিন সকালে আস্তে আস্তে নিমাই চাঁদের কাছে বর্ণনা করেন। বাবা নিমাই! শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম। দেখি কি তুমি আর নিত্যানন্দ ছোট যেন পাঁচ বছরের শিশু হইয়া আমার আঙ্গিনায় মারামারি করিতেছ। মারামারি করিতে করিতে দু'জনে গোসাঞির ঘরে প্রবেশ করিলে। একটু পরেই মন্দির হইতে বাহির হইলে চার জন। তোমরা দু'জন—আর বলরাম ও কৃষ্ণ। চারিজনে কি ভীষণ হাতাহাতি ও ঝগড়া।

রাম-কৃষ্ণ দু'জনে তোমাদের দুইজনকে বলেন—তোরা কোথা হ'তে এলি। এতো চিরদিন আমাদের ঘর-দুয়ার। তোরা এখনি বাহির হইয়া যা। এই ঘর বাড়ী, এই দধি-দুগ্ধ-সন্দেশ সব আমাদের। তোরা এখনি বার হ। তাদের কথার জবাবে নিত্যানন্দ বলে—তোদের সে কাল বয়ে গেছে। যে কালে গোয়ালা ছিলি দধি দুধ, নবনী লুট করে চুরি করে খেয়েছিস। গোয়ালার যুগ চলে গেছে। এখন ব্রাহ্মণের যুগ। এখন এসব ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাও। যদি ভালকথায় না যাও—মেরে তাড়াব। নিত্যানন্দের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বলরাম বলে—দোহাই, কৃষ্ণের কোন দ্রব্যে হাত দিওনা—যদি দাও বাঁধিয়া রাখিব। নিতাই বলে, তোর কৃষ্ণকে আমি ডরাই না। "গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর আমার ঈশ্বর।"

তোমরা চারজন একজনের হাতের দ্রব্য আর একজনে কাড়িয়া খাও। একজনার মুখে আর একজন মুখ দিয়া খাও। নিতাই তখন আমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া বলে—'মা অন্ন দাও; বড় ক্ষুধা পেয়েছে।'

এরপরই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্নের কথা শুনিয়া গৌরসুন্দর কহিলেন—'মা বড়ই সুস্বপ্ন দেখিয়াছ। এই সুখের কথা কাহাকেও বলিও না। তোমার ঘরে যে সেবিত ঠাকুর তাঁহারা প্রত্যক্ষ। তোমার স্বপ্নের কথা শুনিয়া আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইল। আমি যখন ঠাকুরকে ভোগ দেই—তখন প্রায়ই দেখি আধাআধি দ্রব্য থাকে না। আমার মনে হইত তোমার বউ বিষ্ণুপ্রিয়া ঐ সব চুরি করিয়া খায়। লজ্জায় কাহাকেও বলি নাই। আজ সন্দেহ গেল। বুঝিলাম ঠাকুরই প্রত্যক্ষ তাঁরাই খান।

"মুই দেখো বারে বার নৈবেদ্যের সাজে।
আধাআধি না থাকে না কহি কারে লাজে॥
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল॥"

আড়ালে থাকিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর বাক্য শুনিয়া একাকীই মধুর হাসি হাসিলেন।

শ্রীহরিবাসর কীর্ত্তন।

একদিন একাদশী, শ্রীহরিবাসর। শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীগৌরসুন্দর আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। চারিদিক ঘিরিয়া ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন

আরম্ভ করিলেন। "গোপাল, গোবিন্দ" এই নাম কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। উষা সময় হইতে প্রভু নৃত্য করিতেছেন। ভক্তগণ তিন দলে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। একদল শ্রীবাস পণ্ডিতের, একদল মধুকণ্ঠ মুকুন্দের, আর একদল গোবিন্দ দত্তের। অদ্বৈত, নিত্যান্দ গদাধর প্রমুখগণ—কীর্ত্তনে, নর্ত্তনে আনন্দে বিহ্বল হইলেন।

হঠাৎ প্রভু গৌরচন্দ্র আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সে ক্রন্দন এমন প্রাণস্পর্শী যে, যে ব্যক্তি শোনে সেই বিহ্বল হইয়া পড়ে। তার পর প্রভু হাসিতে আরম্ভ করিলেন—সে কি অট্ট অট্ট হাসি তাহাও প্রহর খানেক চলিল।

যখন কান্দেন প্রভু প্রহরেক কান্দে
লুটায় ভূমিতে কেশ তাহা নাহি বান্ধে
যখন হাসয় প্রভু মহা অট্টহাস
সেই হয় প্রহরেক আনন্দ বিলাস।

প্রভু নাচিতে নাচিতে ভূমিতে পড়িয়া যান। ভক্তগণ ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু শ্রীদেহ এত ভারী হয় যে দশ বিশ জন তুলিতে পারেন না। আবার কখনো দেহ তুলার মত হালকা হয়। যে কোন একজন প্রভুকে কাঁধে তুলিয়া নাচিতে পারে। কখনো প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া ভক্তগণ কানে হরিবোল ধ্বনি করে। তখন শ্রীদেহে মহাকম্প আরম্ভ হয়। কখনও বা দেহ হইতে এত ঘাম বাহির হইতে থাকে মনে হয় "মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে"

কখনও শ্রীদেহ আগুনের মতন গরম হয়। ভক্তগণ যত চন্দন দেন, সবই ক্ষণকাল মধ্যে শুকাইয়া যায়। কখনও নাক দিয়া ভীষণ ভাবে শ্বাস বহিতে থাকে। কখনো বা প্রভু সকলের পা ধরিতে যান। সকলে চারদিকে ছুটিয়া পালায়। আবার কখনো নিত্যানন্দের পিঠে পিঠ দিয়া বসিয়া মাথায় চরণ তুলিয়া দেন। একবার যার পায়ে ধরে আবার পরক্ষণে—তার শিরে উঠিয়া বসে। কখনও বলদের মত মুখে বাদ্যধ্বনি করে। কখনও ত্রিভঙ্গ হইয়া চরণে চরণ যুড়ে। করে কর দিয়া বাঁশী ধরার৽ছন্দে নয়ন মনোহারী ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া থাকেন। কৃষ্ণাবেশে অপরূপ নৃত্য করেন। ভক্তগণ আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন হইয়া দর্শন করিতে থাকেন।

অপরূপ কৃষ্ণাবেশ অপরূপ নৃত্য
আনন্দে নয়ন ভরি দেখে সবভৃত্য।

প্রভুর প্রকাশ

আবার একদিন শ্রীবাস অঙ্গনে শেষ রাত্রে প্রভু শালগ্রাম কোলে লইয়া বিষ্ণু খট্টায় উঠিয়া বসিলেন। খট্টা মড়মড় করিয়া উঠিল। নিত্যানন্দস্পর্শে খট্টা স্থির হইল। গৌরসুন্দর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"কলিযুগে আমি শ্রীকৃষ্ণ।" অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের আমি ঈশ্বর। তোরা সকলে আমার দাস। তোদের জন্যে আমি এসেছি। তোরা যা দিবি তাই খাব।"

ভোজন লীলা

প্রভুর বাণী শুনিয়া যার যা সামর্থ্য লইয়া আসিতে লাগিলেন। দধি, দুগ্ধ, নবনীত, সন্দেশ, নারিকেল, কদলী, চিপিটক, চাউল ভাজা—যত কিছু ভক্তেরা আনিলেন, প্রভু সব খাইলেন। আরো আন, আরো আন বলিতে লাগিলেন। প্রায় দুইশত লোকের আহার্য আহার করিয়া, প্রভু আরো চাহিলেন। প্রভু সকলি গ্রহণ করিলেন। বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তগণের ত্রাস উপস্থিত হইল।

তখন প্রভুর মূর্ত্তি মহৈশ্বর্য্যময়। নিত্যানন্দ প্রভু শিরে ছত্র ধরিলেন। অদ্বৈত প্রভু জোডকরে সম্মুখে স্তব করিতে লাগিলেন। আর সকল ভক্তেরা যুক্তকরে শির অবনত করিয়া রহিলেন। হঠাৎ প্রভু মূর্চ্ছিত হইলেন। কতক্ষণে প্রভুর বাহ্যদশা ফিরিয়া আসিল। ভাই বান্ধব বলিয়া সকলের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইলেই প্রভুর তৎপর মূর্চ্ছা হয়। মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে দাস্যভাবে বহু অনুনয় বিনয় করেন।

সাত-প্রহরিয়া ভাব

অপর একদিন শ্রীবাস অঙ্গনে নৃত্য করিতে করিতে প্রভু গৌরহরি বিষ্ণু খট্টাতে উঠিয়া বসিলেন। অন্যান্য দিন যে খট্টায় বসেন, মনে হয় না জানিয়া বসিয়াছেন। আজ সেরূপ নহে। সকল মায়ার আবরণ মুক্ত হইয়া যেন স্বাভাবিক ভাবে খট্টারোহণ করিলেন। এত দীর্ঘ সময় আর কোনদিন থাকেন নাই।

"আমার অভিষেক কর", আদেশ করিলেন। কলসী-কলসী গঙ্গা জল আসিতে লাগিল। সকলে একত্র-হইয়া অভিষেক মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। বেদের "পুরুষ-সূক্ত" উচ্চারিত হইতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে নিতাইচাঁদ প্রভুর

শ্রীমস্তকে জল ঢালিলেন। তারপর সকল ভক্তগণ একে একে ঢালিতে লাগিলেন। মুকুন্দ প্রভৃতি মধুকণ্ঠ গায়কগণ অভিষেক মঙ্গল গান করিতে লাগিলেন। পতিব্রতাগণ উচ্চকণ্ঠে জয় জয়কার দিলেন। দেবতাগণ মানবের বেশে আসিয়া অভিষেকে যোগদান করিলেন। শ্রীবাসের বাড়ীর দাস দাসী-গণও প্রভুর অভিষেক করিলেন। দুঃখী-নাম্নী এক ভাগ্যবতী মহিলাকে প্রভু স্বয়ং জল আনিতে বলিলেন। দুঃখী নাম ঘুচাইয়া নাম রাখিলেন "সুখী।"

ষোড়শোপচারে পূজা

অভিষেকের পর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করিয়া ভক্তগণ নূতন বসন পরাইলেন। সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপন করিলেন। প্রভু স্বয়ং খট্টায় উপবেশন করিলেন। নিতাইচাঁদ শিরে ছত্র ধরিলেন। কোনও কোনও ভাগ্যবান ভক্ত চামর ঢুলাইতে লাগিলেন।

পূজার সজ্জা সকল আসিল। পাদ্যঅর্ঘ, আচমনী গন্ধপুষ্প, ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য বস্ত্র, যজ্ঞসূত্র, নানা প্রকার অলঙ্কারাদি। ষোড়শ উপচারে গৌরহরির পূজা হইল। শ্রীচরণে তুলসী মঞ্জরী অর্পণ করিয়া ভক্তগণ পূজা সমাপন করিলেন। তার পর স্তব পাঠ। দণ্ডবৎ প্রণামাদি। সকলের চক্ষে প্রেমের নদী।

শ্রীমুখে বলিলেন "কিছু দাও, খাই।" যে যত পারিলেন উত্তম উত্তম দ্রব্য শ্রীহস্তে দিলেন। করুণাময় সকল গ্রহণ করিলেন। মনে হইল সহস্র লোকের খাদ্য খাইলেন। জয় জয় শ্রীশচীনন্দনের জয়। সহস্র কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠিল। তারপর প্রভু এক একজন বিশেষ বিশেষ ভক্তকে ডাকিলেন। ডাকিলেন অন্তরের গোপন কথা প্রকাশ করিতে।

শ্রীবাস পণ্ডিত প্রতি।

আরে, আরে শ্রীবাস, তোর মনে পড়ে—দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলি। বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলি ভূমিতলে। অজ্ঞ গুরু-শিষ্য কেহই তোর ভাবাবেশ বুঝিতে না পারিয়া বাহির করিয়া দিল। দেবানন্দ কোন বাধা দিল না। তখন আমি তোর দুঃখে বৈকুণ্ঠ হইতে তোর হৃদয়ে অবতরণ করিয়াছিলাম। তোরে প্রেমে কাঁদাইয়া নয়ননীরে ভাসাইয়া ছিলাম। মনে পড়ে?

গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রতি কহিলেন—"হ্যাঁ রে তোর মনে জাগে—রাজভয়ে

রাত্রিকালে পলায়ন করিতেছিলি। খেয়াঘাটে পৌছিয়া কোন নৌকা বা নাবিক না দেখিয়া হতাশায় কাঁদিতেছিলি। তখন আমি খেয়ারী সাজিয়া নৌকা লইয়া তোকে সামান্য গঙ্গা পার করিয়া দিয়াছিলাম।" কথা শুনিয়া গঙ্গাদাস আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

আদেশ দিলেন গৌরসুন্দর। শ্রীধরকে আন গিয়ে।" অর্দ্ধপথ হইতে তার কণ্ঠ শুনিতে পাইবে। উচ্চৈঃস্বরে নাম গাহিতেছে। ভক্তগণ গিয়া শ্রীধরকে কোলে তুলিয়া লইয়া আসিলেন।

খোলা-বেচা শ্রীধর প্রতি

প্রভু বলিলেন "শ্রীধর এস এস। তোমার সঙ্গে অনেক রঙ্গ করিয়াছি। থোড়, খোলা, মোচা কেনাবেচা লইয়া। জোর করিয়া তোমাব হাত হইতে কাড়িয়া নিয়াছি। আজ তোমাকে বর দিব। কি চাও শ্রীধর বল। অষ্ট-সিদ্ধি চাও তো তাও দিব।" শ্রীধর উত্তর দিলেন—

"যে ব্রাহ্মণ কাড়িলেন মোর খোলা পাত।
সেই ব্রাহ্মণ হোক মোর জন্মে জন্মে নাথ॥"

প্রভু বলিলেন "শ্রীধর আমার দিকে তাকাও।" শ্রীধর চাহিয়া দেখিলেন—মহা জ্যোতির্ম্ময় মোহন মুরলীধারী শ্যামসুন্দর। প্রভু কহিলেন—"শ্রীধর তুমি আমার জন্ম-জন্মান্তরের দাস—তাই এই মহা-প্রকাশ দেখিতে পাইলে।"

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে প্রভু বলিলেন—"মাগ নিজ-কার্য্য"। আচার্য্য বলিলেন "যে মাগিনু তাহা পাইনু।" প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, গোলোকধাম হইতে তোমাকে নামাইয়া মর্ত্ত্যলোকে আনিবই। "করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন গোচর" প্রতিজ্ঞা বাক্য পূর্ণ হইয়াছে। আর-চাহিবার কিছু নাই।

শ্রী মুরারি গুপ্তের প্রতি

প্রভু কহিলেন "মুরারি আমার রূপ দেখ। মুরারি নয়ন তুলিয়া তাকাইয়া দেখিলেন—নবদুর্ব্বাদলশ্যাম স্বয়ং রঘুনাথ। প্রভু কহিলেন—"আমি সেই রাঘবেন্দ্র, তুমি হনুমান।" যে তোমার অভিমত বর চাহিয়া লও।" মুরারি উত্তর দিলেন—

প্রভু, আর নাহি চাই।
হেন কর প্রভু যেন তোর গুণ গাই॥

করুণাময় গৌরহরি তখন হরিদাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন —"হরিদাস যখন পাপিষ্ঠরা তোমার গায়ে কঠোর বেত্রাঘাত করিতেছিল— তখন আমি বৈকুণ্ঠ হইতে সুদর্শন পাঠাইয়াছিলাম—কিন্তু সুদর্শন শক্তিহীন হইয়া গিয়াছিল কেন জান? মার খাইবার সময় তুমি পাপিষ্ঠদের মঙ্গল কামনা করিতেছিলে। তুমি যার মঙ্গল চাও সুদর্শনের সাধ্য নাই তার ক্ষতি করে। তোমার গায়ে যতগুলি দাগ পড়িয়াছে—সবই দেখ আমার অঙ্গে। দাগগুলি আমার ভূষণ-হইয়া আছে। হরিদাস তোমার দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া আমি শীঘ্র আসিয়াছি।"

"শীঘ্র আইলু তোর দুঃখ
না পারি সহিতে॥"

প্রভুর মধুময় কথা শুনিয়া হরিদাস ধূলায় লুটাইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

আচার্য্যের প্রতি পুনরায়

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"তুমি আমাকে আনিতে অপার পরিশ্রম করিয়াছ। তুমি গীতা পড়াও, ভক্তিমার্গের ব্যাখ্যা কর। একশ্লোকে ভক্তিযোগ না পাইয়া উপবাস করিয়াছিলে। তোমার উপবাসে আমার উপবাস। তাই স্বপ্নে তোমাকে বলিয়া দেই শ্লোকের শুদ্ধপাঠ।" "সর্ব্বতঃ পানিপাদন্তং" পাঠনহে। সর্ব্বতঃ স্থলে সর্ব্বত্র পাঠ হবে। মনে পড়ে? তখন আমার এ আবির্ভাব হয় নাই।" প্রাণগৌরের মধুর কথা আচার্য্য কহিলেন—

আর কি বলিব মুঞি
এই মোর মহত্ত্ব যে, মোর নাথ তুঞি।"

শ্রীবাস বলিলেন, প্রভু ভক্তবর মুকুন্দ কি অপরাধ করিল। তাকে কেন ডাকেন না? প্রভু বলিলেন মুকুন্দ ভক্তিস্থানে অপরাধী। তাকে ডাকিব না। যেখানে যেখানে যায় সেই মত কথা কয়। অদ্বৈতস্থানে গিয়া বলে ভক্তি বড়। আবার অন্যস্থানে গিয়া বলে—ভক্তি হইতে জ্ঞান বড়। এই অপরাধে মুকুন্দ-কৃপা পাবে না। বাহির হইতে প্রভুর কথা শুনিয়া, মুকুন্দ জানিতে চাহিলেন কোনও দিন পাবো তো?" প্রভু কহিলেন 'কোটি জন্ম পরে।" 'শুনিয়া মুকুন্দ আনন্দে "পাইব, পাইব" বলিয়া মহানৃত্য আরম্ভ করিলেন।

তখন রঙ্গিয়া গৌরাঙ্গ কহিলেন—"মুকুন্দকে ডাক।" আমার কাছে তোমার কোন অপরাধ নাই। কোটি জন্ম পরে পাবে, আমার এই বাক্য অব্যর্থ জানিয়া তুমি নাচিলে। ইহাতে তিলার্দ্ধের মধ্যে কোটি জন্ম কাটিয়া গিয়াছে। মুকুন্দ তুমি আমার গায়ক, চিরকাল সঙ্গে থাক।

প্রভু তাম্বুল চাহিলেন। ভক্তগণ আদরে দিলেন। প্রভু নিজ অধরামৃত সবাইকে বাটিয়া দিলেন। যাহা অবশেষ ছিল নারায়ণীকে দিলেন। প্রভু বলিলেন, "নারায়ণী, কৃষ্ণ বলিয়া কান্দ।" নারায়ণী "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিল। প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল।

"নবদ্বীপ ধামে এমন মধুময় প্রকাশ হইল
যত ভট্টাচার্য্য একজনাও না জানিল"

জগাই-মাধাই উদ্ধার

একদিন ভাবময় গৌরাঙ্গসুন্দর আদেশ দিলেন নিতাই আর হরিদাসকে। ঘরে ঘরে নাম বিলাও। অকাতরে যারে তারে নাম দেও। শুধু বল—কৃষ্ণকে ভজনা কর। কৃষ্ণকে জীবনের সার কর। নবদ্বীপে গৌরময় দুজনে রত হইলেন আজ্ঞা পালনে। কতশত লোক যোগ দিল। সারা দেশ ভরিয়া নগর কীর্ত্তনের বোল উঠিল।

জগন্নাথ আর মাধব। দুইভাই ব্রাহ্মণ সন্তান। লেখাপড়া জানে। নগর কোতোয়ালের কাজ করে। দুইটি বড় দোষ। মদ্যপানে পূর্ণাসক্তি আর হরিনাম কীর্ত্তনে মহা-বিরক্তি। হরিদাস ও নিত্যানন্দ চলিয়াছেন ভজনানন্দে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে। দুই ভাই নিষেধ করিল। তাঁহারা কর্ণপাত করিলেন না। আরও নিকট হইয়া তাহাদের কানের কাছে "কৃষ্ণভজ, কৃষ্ণ কহ" কহিতে লাগিলেন। জগাই ক্রুদ্ধ হইয়া একটি ভাঙ্গা কলসীর কাঁদা নিতাইর প্রতি ছুড়িয়া মারিলেন। কপাল কাটিয়া গেল। দর দর রক্তধারা বহিল। এক বিন্দুও কুপিত না হইয়া দয়াল নিতাইচাঁদ বলিলেন—"মেরেছিস আবার মার—তবু হরিনাম কর"। নিতাই গৌরের অসীম করুণার প্লাবনে জগাই মাধাইয়ের মহা পরিবর্ত্তন ঘটিল। তারা অনুতাপে ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিল।

দুই ভাই দুই ভাইকে বুকে তুলিয়া নিলেন। প্রভু বলিলেন—

তো সভার পাপ যত মুঞি নিল সব।
সাক্ষাতে দেখহ ভাই এই অনুভব॥

দুজনার শরীরে পাতক নাই আর
ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া আকার ॥

এত বড দুই পাষণ্ডের অচিন্ত্যনীয় পরিবর্ত্তনে নদীয়াবাসী নিতাই গৌরের ও হরিনাম কীর্ত্তনের মহা মহিমা উপলব্ধি করিল।

চাঁদ কাজী উদ্ধার

স্মার্ত্ত পণ্ডিতের দল গৌরসুন্দরের মহাবিরোধী ছিল। তাঁহারা নগরের শাসক চাঁদ কাজীর কাছে নালিশ করিল। তাহারা বলিল—এই অদ্ভুত ভজন ধারা হিন্দু ধর্ম্ম বিরোধী। চেঁচামেচি করিয়া ভগবানকে ডাকিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন ও মহামারী পাঠাইবেন। দেশের অকল্যাণ হইবে।

চাঁদ কাজী খোল ভাঙ্গিয়া দিল ও নগরে কীর্ত্তন নিষেধ করিয়া দিল। শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তনের প্রতি নিষেধাজ্ঞা শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি নগরের অগণিত নর-নারী লইয়া কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির করিলেন। আধুনিক ভাষা ব্যবহার করিলে বলা যায়, গৌরহরি সরকারী আইন অমান্য করিলেন। কারণ এই আইন ছিল মানবতা বিরোধী। মানব-সমাজের কল্যাণ বিঘাতক।

শ্রীগৌরসুন্দর সকল ভক্তগণ সমভিব্যাহারে বিরাট নগর কীর্ত্তন বাহির করিলেন। প্রত্যেকের হাতে এক একটি মশাল। প্রভু প্রত্যেককে এক একটি দেউটি লইয়া আসিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এ শোভাযাত্রার অপূর্ব্ব বর্ণনা দিয়াছেন।

সভেই নাচেন প্রভু বেড়িয়া গায়েন।
আনন্দে পূর্ণিত প্রভু-সংহতি যায়েন ॥

... ...

চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
লক্ষ কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে ॥

... ...

চতুর্দ্দিগে কোটি কোটি মহাদীপ জ্বলে।
কোটি কোটি লোক চতুর্দ্দিকে "হরি" বোলে' ॥

এত বড় নগর কীর্ত্তন কেহ কোনদিন দেখে নাই। উদ্ধত লোক কাজীর পুষ্পবন ভাঙ্গিতে লাগিল। প্রভু সবাইকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে নিষেধ করিলেন। প্রভু কাজীর দুয়ারে বসিলেন। ভব্য লোক পাঠাইয়া কাজীকে ডাকাইলেন।

কাজী আসিয়া মাথা নোয়াইয়া দাঁড়াইলেন। প্রভু বলিলেন, "আমি তোমার বাড়ীতে অভ্যাগত, তুমি লুকাইয়া আছ কেন?" কাজী বলিলেন "আমি শুনিয়াছি তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছ। তোমাকে শান্ত করার জন্য লুকাইয়া ছিলাম। এখন শান্ত হইয়াছ তাই আসিলাম। তোমার মত অতিথি পাওয়া আমার মহাভাগ্য। গ্রাম্য-সম্বন্ধে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আমার 'চাচা।' তিনি তোমার 'নানা'। সেই সম্বন্ধে তুমি আমার ভাগিনা হও।

ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥

প্রভু কহিলেন, মামা, তুমি কাজী। হিন্দুধর্ম্মের বিরোধিতা করার অধিকার তোমার আছে। এখন তো আমরা বিরাট নগর কীর্ত্তন লইয়া তোমার বাড়ীতে আসিয়াছি। এখন "এবে যে না কর মানা, বুঝিতে না পারি॥"

কাজী বলিলেন, গৌরহরি ইহার কারণ বলি, শোন। আমি যেদিন হিন্দুর ঘরে গিয়া কীর্ত্তন মানা করিলাম ও খোল ভাঙ্গিলাম—সেই দিন রাত্রে এক মহা ভয়ঙ্কর সিংহ—সিংহের মত মুখ, মানুষের মত দেহ—আমার শয্যার উপর লাফ দিয়া উঠিয়া, আমার বুকে নখ দিয়া বলে—"ফাঁড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে।" এইরূপ যদি আবার কর, সবংশে তোমাদের মারিব ও সকল বিরোধী ধ্বংস করিব।" "এই দেখ আমার বুকে এখনও নখের চিহ্ন আছে।" কাজী বুক দেখাইল। দেখিয়া সকলে বিস্ময়ান্বিত হইল।

প্রভু বলিলেন—"মামা তোমার কাছে একটি দান চাই। নদীয়ায় যেন কীর্ত্তন বন্ধ না কর।

প্রভু কহে এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সংকীর্ত্তন বাদ যৈছে না হয় নদীয়ায়॥"

কাজী উত্তর করিলেন—"আমার বংশে যে জন্মিবে সেও কীর্ত্তনে বাধা দিবে না। যদি দেয় তাহলে তালাক্ দিব—অর্থাৎ বর্জন করিব। কাজী বলিলেন- হিন্দুর ঈশ্বর নারায়ণ। আমার মনে হয় তুমি সেই নারায়ণ। "সেই তুমি হও যেন লয় মোর মন।" পাষণ্ডীরা তোমার বিরুদ্ধে আমাকে অনেক বলিয়াছে।"

তারা বলে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাসাইল নিমাই
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কাঁহো শুনি নাই;
উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালি

মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে যত রাড়বাড
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়।
হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বর-নাম মহা মন্ত্র জানি
সর্ব্বলোকে শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি।

তারা আমাকে বলিল—তোমাকে ডাকিয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিতে আদেশ করিতে। কিন্তু আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস, তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ। তোমাকে কিছু বলিব না। কীর্ত্তন বন্ধ করিব না। কাহাকেও বন্ধ করিতে দিব না।

প্রভু গৌরসুন্দর বলিলেন—তোমার মুখে কৃষ্ণ নাম শুনিলাম। তোমার পাপক্ষয় হইয়া গেল। তুমি পরম পবিত্র হইয়াছ। প্রভু কথা বলিবার সময় কাজীর দেহ স্পর্শ করিয়া কথা বলিলেন। প্রভুর স্পর্শমাত্র কাজী কৃপাধনে ধনী হইল। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা সোনা হইল। কাজীর চক্ষে জল পড়িতে লাগিল!

এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানি।
প্রভুর চরণ ছুঁই কহে প্রিয় বাণী॥
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যে তোমাতে রহু ভক্তি॥

গৃহত্যাগের পূর্ব্বাভাস

একদিন প্রভু গৃহে বসিয়া বিষণ্ণ মনে "গোপী" "গোপী" বলিতেছেন। দৈবে এক পড়ুয়া আসিয়া বলিল—নিমাই তুমি গোপী গোপী বল কেন, কৃষ্ণ নাম কর। এই কথা শুনিয়া প্রভু কৃষ্ণ নামে দোষোদ্গার করিতে লাগিলেন ও পড়ুয়াকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে উদ্যত হইলেন।

পড়ুয়া ভয়ে পালাইয়া গেল। গিয়া সকল পড়ুয়াদের ঐ কথা বলিল। শুনিয়া তারা ক্ষেপিয়া গেল।

"শুনি ক্রোধ কৈল সব পঢ়ুয়ার গণ।
সবে মেলি করে তবে প্রভুর নিন্দন॥
সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাই।
... ...
পুনঃ যদি ঐছে করে মারিব তাহারে॥"

অবস্থা দেখিয়া গৌরহরি ভাবিলেন। সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব। সন্ন্যাসী না হইলে ঐ সকল পড়ুয়াদের মস্তক নীচু হইবে না। যেমন ভাবনা তেমনি সংকল্প। স্থির করিলেন সন্ন্যাসী হইবেন। নিত্যানন্দকে মনের কথা ব্যক্ত করিলেন—নিম্নোক্ত হেঁয়ালী ভাষায়।

"করিল পিপ্পলী খণ্ড-কফ নিবারিতে
উলটিয়া আরো কফ বাঢ়িল দেহেতে ॥"

ভক্তগণ প্রভুর এই কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তবু তাঁদের কেমন যেন একটা ভীতির উদয় হইল।

"নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
জানিলেন—প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর ॥"

মহাকীর্ত্তন পথের নির্দেশ

মহাপ্রভু কাজীর আইন অমান্য করিয়া যে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া চাঁদ কাজীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন ও যে পথ দিয়া নিজগৃহে ফিরিয়াছিলেন তাহার নিখুঁত বর্ণনা শ্রীচৈতন্যভাগবতে তো আছেই, উদ্ধবদাস পদকর্ত্তার একটি পদেও আছে।

প্রভু গৌরসুন্দর নিজের বাড়ীর গঙ্গার ঘাট হইতে কীর্ত্তন শোভাযাত্রা আরম্ভ করিলেন—তারপর মাধাইর ঘাট, বারকোনা ঘাট, নগরিয়া ঘাট—এই চারিঘাট অতিক্রম করিয়া গঙ্গার নগর দিয়া সিমুলিয়া পৌছিলেন।

"গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌররায় ॥
আপনার ঘাটে বহু নৃত্য করি !
তবে মাধাইর ঘাট গেলা গৌরহরি ॥
বারকোনা—ঘাটে নগরিয়া--ঘাটে গিয়া
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া ॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড। ২৩শ অধ্যায়।

নবদ্বীপের শেষ প্রান্তের নগর সিমুলিয়া। প্রভু সেখানে গিয়া কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলেন।

"নদীয়ার একান্ত নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া ॥

... ...

কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য কোলাহল কাজী শুনয়ে প্রচুর॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড। ২৩শ অধ্যায়।

কাজীর বাড়ী গিয়া তার সঙ্গে কথোপকথন করিয়া তাহাকে ভক্তিধনে ধনী করিয়া প্রভু—নিজ গৃহ অভিমুখে ফিরিলেন—গঙ্গার তীর পথ না ধরিয়া নগরের পথ ধরিয়া ফিরিলেন। কোন কোন পাড়া অতিক্রম করিলেন তাহারও বর্ণনা আছে।

প্রথমে শঙ্খবণিক নগরে প্রবেশ করিলেন। তারপর আসিলেন তন্তুবায়ের নগরে। এই দুই পল্লী ঘুরিয়া প্রভু আসিলেন খোলাবেচা শ্রীধরের বাড়ী। সেখানে লৌহপাত্রে জল খাইয়া, গাদিগাছা—পারডাঙ্গা দিয়া, নিজ গৃহে ফিরিলেন।

এই যাতায়াতের পথের বর্ণনা উদ্ধবদাস পদকর্ত্তা মধুর ভাষায় পরপর দিকনির্ণয় করিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনদাসের বর্ণনা ও উদ্ধবদাসের বর্ণনা মিলিয়া যায়।

"যে দিনেতে গৌরহরি কাজীরে দলন করি
নবদ্বীপ করিলা ভ্রমণ।
চারিঘাট উওরিয়া গঙ্গানগর গ্রাম দিয়া
পরে জলাশয় সুশোভন॥
জলাশয় ঐশান্যেতে চাঁদ কাজী করে স্থিতে
সিমুলিয়া নামে সেই স্থান।
কাজীরে দলন করি ভক্ত সনে গৌরহরি
দখিন দিশা করিলা গমন॥
সংকীর্ত্তনে মত্ত হই শঙ্খ তন্তু পল্লী দুই
মহানন্দে করিলা ভ্রমণ।
শ্রীধরের গৃহ হৈঞা গাদিগাছা মাজিদা দিয়া
পশ্চিম দিশা পার-ডাঙ্গা স্থান॥
তাহার উত্তর দিয়া রাজপণ্ডিতের গৃহ হইয়া
ভক্তগণে মহাসুখী করি।

বায়ুকোণে কিছু দূরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে
নিজ গৃহে গেলা গৌরহরি ॥
উত্তরেতে নিজ ঘাটে তার পূর্ব্বে মাধাইর ঘাট
নিকটেতে শ্রীবাস অঙ্গন।
তাহার ঐশিন্যে কোণে বারকোনা ঘাট নামে
যাহা হয় শুক্লাম্বর আশ্রম ॥
তার উত্তরে কিছু দূরে নগরিয়া ঘাট বরে
তার উত্তরে গঙ্গানগর গ্রাম।
এ উদ্ধব মন্দমতি শোধিতে অক্ষমমতি
নগর ভ্রমণ বিরচিল গান ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ও উদ্ধবদাসজীর বর্ণনায় তৎকালীন নবদ্বীপের একটি সুন্দর মানচিত্রফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাপ্রভুর জন্মস্থান ও ঐ সব পাড়া-পল্লী গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া যাওয়ায় ঐ মানচিত্র এখন ধ্যানের বস্তু হইয়া আছে।

প্রসঙ্গতঃ বলিতেছি একটি বিশিষ্ট বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অভিমত এই যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান গঙ্গাগর্ভে যায় নাই। তাহা মায়াপুর নামক স্থানে অবস্থিত। চাঁদ কাজীর বাড়ী যে গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত হয় নাই ইহা সকলেই মানেন। যাঁহারা মহাপ্রভুর জন্মভূমি মায়াপুর বলেন, তাঁহাদিগকে প্রভুর জন্মস্থান হইতে কাজীর বাড়ী যাইবার ও আসিবার পথ দুটি দেখাইয়া দিতে হইবে। যদি না দেখাইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের দাবী ভ্রমাত্মক বুঝিতে হইবে। মহাপ্রভুর জন্মস্থান কোনটি যদি ঠিক করা নাও যায়, তাহা হইলেও যেটি ঠিক নয় সেটি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি গ্রহণ করিবে কিরূপে? মায়াপুর, এই নামটি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—এই তিনটি মহাগ্রন্থের কোথাও দৃষ্ট হয় না। কাজীদলন কাহিনী শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ড ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে। কোথাও "মায়াপুর" নামটি দেখিতে পাই না।

সন্ন্যাসের পরামর্শ।

একদিন প্রভু গৌরহরি নিত্যানন্দের হাত ধরিয়া নিভৃতে বসিলেন। শোন শ্রীপাদ আমি তোমাকে অন্তরের কথা বলি। আমি আসিলাম জগত তারিতে।

এখন দেখি বিপরীত হইতেছে। ওরা যখন আমাকে মারিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তখন ওদের বন্ধন কোটিগুণ বাড়িয়া গেল।

আমাকে মারিতে যবে করিলেক মনে।
তখনেই পড়ি গেল অনেক বন্ধনে॥

আমি যদি শিখা, সূত্র সব মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া, যে মারিতে চাহিয়াছে—তার দুয়ারে গিয়া ভিক্ষুক হই, তবে সে আমাকে দেখিয়া চরণে ধরিবে। নিতাই তুমি যদি জগত জীবের উদ্ধার চাও তাহা হইলে এই কার্য্যে আমাকে নিষেধ করিও না।

প্রভুর কথা শুনিয়া নিতাই চাঁদ উত্তর করিলেন—

নিত্যানন্দ বোলে প্রভু! তুমি ইচ্ছাময়
তোমার যে ইচ্ছা সেই আমার নিশ্চয়॥

নিতাই চাঁদের বাক্যে প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন। পুনঃ পুনঃ তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। নিতাই উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু নিতাইয়ের অন্তরে একটি ভাবনাই বেদনাত্মক।

স্থির হই নিত্যানন্দ গণে মনে মনে।
"প্রভু গেলে—আই প্রাণ ধরিব কেমনে॥

বিরহে ভাবোচ্ছ্বাস

প্রাণের গৌরাঙ্গসুন্দর সন্ন্যাসী হবেন। এখনও হন নাই, হবেন, এই ভাবী বিরহের নিদারুণ বেদনায় ভক্তগণ যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সকল প্রিয়জনেরা ডুবিলেন ভাবী বিরহের দুঃখ সমুদ্রে। প্রাণপ্রিয় মুকুন্দ কাঁদিয়া কহিলেন—প্রভু আমাদের ছাড়িয়া যাবেন তো যাবেনই, কে আপনাকে ঠেকাবে। কিন্তু এখন ওকথা মুখে আনিবেন না। আমাদের নবদ্বীপ ভরিয়া এই আনন্দ আরও চলুক—উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকুক। এখনি সাঙ্গ করিবেন না।

প্রাণধন গদাধরের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল—হৃদয়ের গোরাচাঁদ সন্ন্যাসী হবেন, এই কথা শুনিয়া ভর্ৎসনার সুরে গৌরহরিকে কহিলেন, শিখা-সূত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলে কি হইবে? কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে? এ জগতে গৃহস্থ বৈষ্ণব নাই?

শিখা-সূত্র মুড়াইলে যদি কৃষ্ণ পাই ?
গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই॥

ইহা তোমার আজগুবি মত! বেদাদি শাস্ত্রের এই মত নহে। সন্ন্যাসী হইবা কিন্তু তার আগে মাতৃবধের পাপে ডুবিবা।

"প্রথমে তো জননী বধের ভাগী হবে।"

প্রভু চাঁচর কেশ মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী হবেন শুনিয়া অনেকেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী হইয়া একা একা কেমনে পথ চলিবেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন জল কে মুখে দিবে ভাবিয়া ভক্তগণ অন্ন জল ত্যাগ করিলেন।

এইমত ভক্তগণ ভাবে নিরন্তরে।
অন্ন পান কারো নাহি রোচয়ে শরীরে॥

নিভৃতে প্রাণের দেবতাকে পাইয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া কহিলেন—শুনিলাম তুমি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবে। আমার মাথায় হাত দিয়া বল— যদি একথা হয় আমি এক্ষুনি তোমার সম্মুখে প্রাণ বিসর্জন করিব।

শুন শুন প্রাণনাথ মোর শিরে দেহ হাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি
লোকমুখে শুনি ইহা বিদারিয়া যায় হিয়া
আগুনেতে প্রবেশিব আমি॥

ফুলের মত কোমল তোমার চরণ। আমার কঠোর হাতে সেবা করিতে ভয় লাগে। ঐ চরণে কণ্টকাকীর্ণ বনপথে কি করিয়া চলিবে ?

শিরীষ কুসুম যেন কোমল চরণ তেন
পরশিতে মনে লাগে ভয়।
ভূমেতে দাঁড়াও যবে প্রাণ মোর লও তবে
হেলিয়া পড়এ পাছে সর্বত্র॥

বলিতে বলিতে দেবী নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। নয়নের তপ্ত অশ্রু বুক বাহিয়া অঝোরে ঝরিতে লাগিল। মুখ বন্ধ করিয়া বুকে হাত দিয়া প্রভু গৌরহরি কেবল শুনিলেন।

পুত্র বৎসলা স্নেহের খনি শচীদেবী নিমাইচাঁদকে নিজে কোলে টানিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন—বাপরে আমায় ছেড়ে যাসনে। এই পোড়া পরাণ বেঁচে আছে-শুধু তোমার মুখখানা দেখিয়া।

না যাইয় না যাইয় বাপ! আমারে ছাড়িয়া।
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ দেখিয়া॥

তোর দাদা বিশ্বরূপ আমার বুকে শেল দিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তোর পিতা অকালে চলিয়া গেলেন সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া। আমি এই সকল নিদারুণ দুঃখ ভুলিয়া আছি শুধু তোমার মুখখানির দিকে তাকাইয়া। তুই গেলে এই প্রাণ আর দেহে রইবে না। তোর পদ্মের মত চক্ষু দুটি, তোর চাঁদপানা বদনখানি, তোর মত্ত হাতির মত গমনভঙ্গি, তোর কান জুড়ান বচন, তোর ঘর আলোকরা অঙ্গের বরণ, এসব না দেখিয়া আমার প্রাণ-পাখী এ দেহ খাঁচাটি ছাড়িয়া চলিয়া যাবে।

অমিয়া বরিখে যেন সুন্দর বচন
কেমনে বঞ্চিব না দেখি গজেন্দ্র গমন॥

ঘরে পূর্ণিমার চাঁদের মত বধূমাতা। তার চোখে অবিরল অশ্রুজল দেখিয়া কেমনে দেহে প্রাণ রাখিব। কোন ভাষা দিয়া আমি তার সদাতপ্ত প্রাণে শান্তি দিব। তোর বিরহে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেহত্যাগ করিল আমার সামনে। বিষ্ণুপ্রিয়াকে কোলে পাইয়া আমি তার দুঃখ ভুলিয়াছি। এখন তোর বিরহে বধূ আমার অনাথিনী হবে—ব্যর্থ জীবন লইয়া সে কী করিবে? কি বলিয়া তাকে প্রবোধ দিব!

নিমাই তুই আর ক'দিন থাক। তোর সম্মুখে আমরা দু'জনে প্রাণ বিসর্জ্জন দেই। তারপর যেথা খুসী চলে যা। বলিতে বলিতে শচীদেবী বিবর্ণ হইয়া গেলেন। দিনে দিনে দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গেল। শোকাকুলা জননী ও ঘরণী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কেবল গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শচীমাতা আবার বলিলেন—নিমাই তুই না জগতের লোককে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে এসেছিস। মাকে প্রাণে মারিয়া জগতকে কি ধর্ম্ম শিখাইবি?

তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা
কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥

শোন নিমাই আমার পরামর্শ—নবদ্বীপে থাক—তোর প্রাণের দোসর নিতাই আছে—তোর অভিন্ন প্রাণ গদাই আছে। আর কতশত প্রাণের জন আছে। এদের লইয়া গৃহে থাকিয়া কীর্ত্তনানন্দে ডুবিয়া থাক।

এই বলিয়া মা নিমাইর গলা ধরিয়া হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন। মায়ের তপ্ত অশ্রুধারায় নিমাইর সোনার দেহ ভিজিয়া গেল।

অভিনব প্রবোধ বাক্য

প্রভু গৌরহরি সন্ন্যাস লইবেন—এই সংবাদ চাপা রাখা গেল না। শচীমাতা শুনিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শুনিলেন। ভক্তবৃন্দ শুনিলেন। চতুর চূড়ামণি তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া আশ্বস্ত করিলেন। ভক্তদের বলিলেন—তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ জন্ম জন্মের। প্রত্যেক জন্মেই তোমরা আমার সঙ্গে আছ। এই মত আরও দুই অবতার আছে। তাহাতেও তোমরা আমার সঙ্গে এই মত রঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া রহিবে।

জননীকে বলিলেন—মা তুমি আমার আজিকার মাতা নও। এক সময় তুমি ছিলে পৃশ্নি। তখন তোমার পুত্র হইয়াছিলাম। তারপর তুমি অদিতি, আমি বামন। তুমি দেবহূতি মাতা, আমি পুত্র কপিল। তারপর তুমি কৌশল্যা, আমি রাম, তারপর তুমি দেবকী, আমি দেবকীপুত্র। আরও দুই জন্মে এইরূপে সংকীর্ত্তনারম্ভে আমি তোমার পুত্র হইব। তোমার আমার কখনও ছাড়াছাড়ি হইতে পারে না।

প্রভু সকলকে বলিলেন—

তোমরাই ভাব আমি সন্ন্যাস করিয়া।
চলিলাঙ আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া॥
সর্ব্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে।
তোমা সভা আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে॥

প্রভু সন্ন্যাসী হইবেন এই সংবাদে জননী ও ঘরণী বজ্রাহতের মত নির্ব্বাক হইয়াছিলেন। প্রভুর মধুর কথাবার্ত্তায় তাহারা সকলে বুঝিলেন যে মায়ের অবাধ্য হইয়া পত্নীর প্রাণে ব্যাথা দিয়া তিনি কোন কার্য্য করিবেন না। সকলেই আশ্বস্ত হইলেন।

তখন হইতে নিমাইর অন্যরূপ হইল। মাকে ও গৃহিণীকে ভুলাইবার জন্য গৃহকার্য্যে একান্ত ভাবে মনোনিবেশ করিলেন। ছাত্রগণকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। নিত্য সন্ধ্যাবন্দনা, গৃহদেবতার অর্চ্চনা নিপুণভাবে করিতে লাগিলেন। এমন কি গৃহের আয় ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারেও মনোনিবেশ করিলেন। সংসারের কার্য্যে এত অভিনিবেশ দেখিয়া শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া ভুলিয়াই গেলেন যে তাঁহাদের প্রাণধন কখনও সংসার ছাড়িবে।

বেঁচে আ।

সন্ন্যাসের রাত্র

যেদিন গৌরসুন্দর গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবেন, সেইদিন রাত্রের প্রথম ভাগে তিনি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে আন্তরিক ভাবে আদর-সোহাগ করিলেন।

"যুঞা উরু-উপর, চিবুকে দক্ষিণ কর,
পুছে কিছু মধুর অক্ষর ॥

নিজে তাহাকে পুষ্পমালায় সাজাইলেন। তার হাতে নিজে সাজিলেন। মধুমাখা কথা। মধুময় ব্যবহার দ্বারা তাঁহার মন জয় করিয়া আত্মসাৎ করিলেন। বলিলেন—

"আমি তোমা ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিব গিঞা
একথা বা কে কহিল তোকে।
... ...
ইহা বলি 'গৌরহরি' আশ্লেষ-চুম্বন করি
নানা রস কৌতুক বিহারে।
অনন্ত বিনোদ প্রেমা, লীলা লাবণ্যের সীমা
বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিল প্রকারে ॥"

সেদিন প্রাণের ঠাকুর গৌরাঙ্গসুন্দর দাম্পত্য প্রেমের একটি নিখুঁত লীলা অভিনয় করিলেন। স্বামী সোহাগে আত্মহারা দেবী আনন্দ সাগরে ডুবিয়া গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্না হইলেন।

চতুর চুড়ামণি গৌরাঙ্গসুন্দর শেষরাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ধীরে অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে নীরবে উঠিলেন। নিদ্রিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমমাখা বদন পানে একটিবার মধুর দৃষ্টিপাত করিলেন। উদ্দেশ্যে গৃহদেবতাকে প্রণাম করিলেন। জননীকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। জন্মভূমি আদরের নদীয়াকে প্রণাম করিয়া চিরতরে বিদায় লইলেন।

দ্রুতগতিতে চলিলেন কাটোয়া অভিমুখে। ঐ দিন ১৪৩১ শকের ২৯ মাঘ বুধবার। প্রভুর জন্ম ১৪০৭ শকের ফাল্গুনে। সুতরাং গৃহত্যাগের সময় প্রভুর বয়স ঠিক ২৪ বছর। পরদিন সকালে ৩০শে মাঘ উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। প্রভু নিত্যানন্দকে পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—

"এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে ॥"

সত্য সংকল্প প্রভু যাহা বলিয়াছেন তাহাই করিলেন। পথে প্রথম বাধা দিল ভাগীরথী। প্রভু সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া ভাগীরথীর জল শিরে লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। মাঘ মাসের প্রবল শীতের মধ্যে সাঁতার কাটিয়া খরস্রোতা গঙ্গা পার হইলেন।

কৃষ্ণপ্রেমের আকুল টানে, জীব জগতের কল্যাণের ঐকান্তিক বাসনায় গৌরসুন্দরের এই মহাত্যাগ মানব ইতিহাসে অতুলনীয়।

নদীয়ায় শোকের পাথার

পরদিন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে নদীয়ায় হাহাকার ধ্বনি উঠিল। সকলে শোকের পাথারে ডুবিল। নিমাইচাঁদ গৃহ ছাড়িয়াছে, একথা যে শুনিল সেই বুকে করাঘাত করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। নবদ্বীপের প্রতিটি নর-নারী নিমাইকে গভীরভাবে ভালবাসিত। যারা বাহ্যতঃ বিরোধিতা করিত, তারাও অন্তরে তাঁকে ভালবাসিত। ভালবাসার ধনকে কেহ ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না।

বিরোধীরা বিরোধ করিত তার মতের সঙ্গে, পথের সঙ্গে। কিন্তু এই প্রাণহারী ব্যক্তি পুরুষটি ছিল সকলের পরম আদরের ধন। অত সৌন্দর্য্য, অত মাধুর্য্য, অমন স্নেহ-প্রবণতা, অমন অমায়িকতা আকর্ষণ করিত প্রত্যেকটি পুরুষ নারীকে। গৃহত্যাগের পরই বোঝা গেল শচী-দুলালের প্রতি নদীয়ার প্রত্যেকটি মানুষের প্রীতি প্রবাহ কত নির্ম্মল, কত বেগবতী কত উচ্ছ্বাসময়। অগণিত লোক ছুটিয়া আসিল শচীমাতার শূন্য আঙ্গিনায়। সেখানে কী নিদারুণ দৃশ্য।

শচীমাতা কাঁদেন—আর্ত্তনাদ করিয়া। তাঁর নিমু-নিমু ডাকে সকলের বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া যায়। বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদেন গুমরিয়া। তাঁর দু'চোখের ধারা ছুটে তীব্র বেগে মুখ-বুক ভিজাইয়া। শাড়ীর অঞ্চল সিক্ত করিয়া, আঙ্গিনার ধূলি কর্দমাক্ত করিয়া। বেদনার ঐ মূর্ত্ত বিগ্রহটি যে একটিবার চাহিয়া দেখিল, সে ভূমিতে পড়িয়া হা গৌর, হা গৌর বলিয়া নির্ম্মম ভাবে গড়াগড়ি করিতে লাগিল। এই বিরহ ব্যাথার জুড়ি নাই।

বৃন্দাবনের কৃষ্ণহারা নরনারী জানিত প্রাণকৃষ্ণ মথুরায় আছে। সুখে রাজঐশ্বর্য্যে আছে। বাক্য দিয়াছেন আবার আসিবেন। নদীয়ার প্রিয়জনেরা জানে না তাদের প্রাণ সর্ব্বস্ব কোথায় গেল। কবে আসিবে। আর আসিবে

কি না? সকলেই জানে সন্ন্যাসীর থাকার নির্দিষ্ট স্থান থাকে না। সন্ন্যাসী দুঃখে কষ্টে কঠোরতায় থাকে। আর গৃহে ফেরে না। নারীমুখ দেখে না। সহধর্মিনীরও না। তাই নদীয়াবাসীর বেদনা অপরিসীম। বৃন্দাবনের সঙ্গেই যখন তুলনা চলে না তখন বিশ্বে অতুলনীয়ই বলা যায়। তাদের প্রবোধ দেবার কথা দূরে থাকুক—তাদের অবস্থা বর্ণনা করিতে গেলেও ভাষা মূক হইয়া যায়। লেখনী স্তব্ধ হইয়া থাকে।

হরি বিরহে এই বেদনাই জীবের সাধনা। নিমাইয়ের সন্ন্যাসে সাধনার একটি নূতন দুয়ার খোলা হইল। এই নিগূঢ় পথে রসিক ভক্ত লীলা গহনে প্রবেশ করিবে যুগ যুগ ধরিয়া।

কাটোয়ায় সন্ন্যাস

গঙ্গার নিদয়া ঘাট আজও সেই নিদারুণ দিনের সাক্ষ্য দিতেছে। গঙ্গা সাঁতরাইয়া সিক্ত বসনে নগ্ন চরণে তীর বেগে নদীয়ার প্রাণ প্রবেশ করিলেন কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কুটিয় প্রাঙ্গণে—গৌরহরির প্রবল গতিবেগ স্থির হইল।

"ভারতী গোঁসাই আমাকে সন্ন্যাস দেন" বলিয়া গোরা শশী প্রণত হইলেন ভারতী মহারাজের পাদপদ্মে। ভারতী বিস্ময়ে হতবাক্। বৃদ্ধা জননী—যুবতী ভার্য্যা গৃহে। বয়স মাত্র চব্বিশ। এই যুবক কে, কি করিয়া, কোন প্রাণে—কোন শাস্ত্র বলে সন্ন্যাস দিবেন ভারতী মহারাজ!

সকল দিকে বাধা! শাস্ত্র বাধা দেয়। সমাজ বাধা দেয়। বিচার-বুদ্ধি বাধা দেয়। প্রাণের সহজ প্রেম প্রীতি বাধা দেয়। কিন্তু এই বাধা ঠেলিয়া ফেলিতেই হইল। সেই মহতী ইচ্ছাকে রুখিবে কে?

অগণিত নরনারীর পাষাণ গলা কান্নার রোলের মধ্যে ভারতী যন্ত্রচালিতের মত বাধ্য হইলেন প্রাণধন গৌরসুন্দরকে সন্ন্যাসের বেশ দিতে। প্রভু কহিলেন, গুরুদেব, আমি স্বপ্নে একটি মন্ত্র পাইয়াছি। দেখুন তো এইটিই আমাকে দিবেন কিনা। ভারতী গৌর মুখ হইতে আগে মন্ত্র শ্রুতিগোচর করিলেন। তাহাই আবার নিমাইর শ্রুতিমূলে উচ্চারণ করিলেন। যাঁর ইচ্ছায় নিখিল বিশ্ব চলিতেছে—তার ইচ্ছাতেই বাজীকরের করের পুতুলের মত—ভারতী গোঁসাই যাহা করণীয় সকল করিলেন।

নদীয়া নাগর গৌরসুন্দরের প্রাণ মনোহারী কেশ-বেশ, বসন ভূষণ সকলই

অন্তর্হিত হইল। রহিল মুণ্ডিত মস্তক। কটিতে ডোর কৌপীন। করে দণ্ড। কমণ্ডলু। জ্বলন্ত পাবক শিখার মত একটি সুদীপ্ত মূর্ত্তি। সকলে প্রত্যক্ষ করিল মূর্ত্ত ব্রহ্মণ্য তেজ। গায়ত্রীর বরেণ্য ভর্গঃ প্রকটিত। ছিলেন শুধু নদীয়ার ধন, হলেন বিশ্বজীবের আরাধ্য দেবতা "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।"

আজ গৌরসুন্দরকে সকলে দর্শন করিতেছেন কিরূপ—কবি কর্ণপুরের ভাষায়—

তেতোঽন্যেদ্যুঃ শ্রীমান্ ধৃত করকদণ্ডঃ সদরুণং
বহন্ বাসোদ্বন্দং বহল তড়িদচির্চঃ প্রতিকৃতিঃ।
অকস্মাদেকস্মিন্ পথি গুরুশিখো গৈরিক ময়ো—
ব্যদর্শি স্বর্ণাদ্রিপ্রবর ইব তৈর্গৌরশশভৃৎ॥ ১১।৬৫

আজ গৌরাঙ্গ চন্দ্রকে সকলে দর্শন করিতেছে—একটি গৈরিকময় সোনার পর্ব্বত তুল্য। বিদ্যুৎমালার মত উজ্জ্বলাঙ্গ গৌরহরির শ্রীকরে দণ্ড কমণ্ডলু। সুদীর্ঘ শিখা বিশিষ্ট অরুণ বর্ণ—বহির্ব্বাস ও উত্তরীয়ধারী।

ব্রজযাত্রী—শান্তিপুরে

সন্ন্যাস গ্রহণের পরই আবার গোরাচাঁদের প্রাণে জাগিয়া উঠিল কৃষ্ণ বিরহজ্বালা। কোথায় কৃষ্ণ। কোথায় যাব। কোথায় গেলে কৃষ্ণ পাব এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভু ছুটিলেন ব্রজের পথে। ব্রজ কোথায়, কোন দিকে কোন জ্ঞান নাই। কৃষ্ণ বিরহে জ্ঞান হারা। তিন দিন রাঢ়দেশে ঘুরিলেন। অনাহারে অনিদ্রায় ব্রজনাথের অন্বেষণে যাহাকে নিকটে পান তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন "বৃন্দাবন কতদূরে"। বিরহিনী রাধার ভাবাবিষ্ট গৌরহরি কেবল কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন সম্মুখে শ্রীনিত্যানন্দ। প্রভু অতি সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—শ্রীপাদ কোথায় যাবে? নিত্যানন্দ বলিলেন "তোমার সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন যাব"। পরম আনন্দে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৃন্দাবন আর কতদূর আছে।" "এই ত বৃন্দাবনে এসেছি, সম্মুখে দেখ যমুনা" নিতাইচাঁদ কহিলেন।

"অহো যমুনার তীরে আসিয়াছি, আমার মহাভাগ্য" এই কথা বলিয়া গৌরসুন্দর আনন্দাপ্লুত হইয়া যমুনা মনে করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। সাঁতার খেলিতে খেলিতে যমুনার স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন—

চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।

অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রী ক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥

কতক্ষণ পরে প্রভুর দৃষ্টি পরিল তীরের দিকে। দেখেন অদ্বৈতাচার্য্য দাঁড়াইয়া আছেন। বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

তুমিত অদ্বৈত গোঁসাঞি হেথা কেন আইলা।
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমতে জানিলা ॥

আচার্য্য নিত্যানন্দের চাতুরালী বুঝিলেন। বলিলেন—আমার পরম ভাগ্য তুমি শান্তিপুর আসিয়াছ। মনঃক্ষুন্ন হইয়া গৌরহরি বলিলেন—"সে কি! নিত্যানন্দ আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে। গঙ্গা দেখাইয়া যমুনা কহিয়াছে!"

আচার্য বলিলেন, "শ্রীপাদ নিত্যানন্দ মিথ্যা বলিবেন কেন। যেখানে তুমি বিদ্যমান সেই স্থানই তো বৃন্দাবন। আর গঙ্গার পশ্চিম তীরে স্নান করিলে যমুনাতেই স্নান করা হয়।" আচার্য্যের অনুনয়ে গৌরহরি জল হইতে উঠিলেন। আচার্য্য কর্ত্তৃক আনীত শুষ্ক কৌপীন ও বহির্বাস পরিধান করিলেন। তাঁর সঙ্গে নৌকায় উঠিয়া শান্তমনে শান্তিপুরে পদার্পণ করিলেন।

অদ্বৈতাচার্য্য পরম উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিলেন। গান ধরিলেন—

কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।

আচার্য্যানী সীতাদেবী রন্ধন করিলেন। আচার্য্য ভোগ লাগাইলেন। কত শত শত দ্রব্য যে রন্ধন করিয়াছেন—কত আদর ভক্তিভরে সীতাদেবী যে ভোগ প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। দুই প্রভু লইয়া, আচার্য্য গৃহে গেলেন। প্রসাদ দর্শনে প্রভুর অন্তর আনন্দে ভরিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণকে এমন ভোগ দিয়াছেন এইজন্য আনন্দ।

প্রভু কহিলেন এত উপকরণ সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে। আচার্য্য কহিলেন, সন্ন্যাসের জারিজুরি ছাড। "ভোজন করহ ছাড় বচন চাতুরী।" আচার্য্য ও সীতাদেবীর অসীম আগ্রহে প্রভু প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

নদীয়া জীবন গৌরাঙ্গসুন্দর শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে শুভ-বিজয় করিয়াছেন এই সংবাদ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া গেল। নদীয়ার বিরহ-কাতর ভক্তগণ ছুটিয়া আসিয়াছেন। কবি কর্ণপুর বলিয়াছেন—"মনে হইল যেন সমগ্র নবদ্বীপ নগরীটাই আসিয়াছে।

"কিমন্যদ্বক্তব্যং গতমিব নবদ্বীপমভবৎ।" ১১।৬৪

শোকাতুরা শচী জননী আসিয়াছেন। আচার্য্যরত্ন সঙ্গে দোলায় আনিয়াছেন।

শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া ॥

... ...

অঙ্গ মোছে মুখ চুম্বে করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন ॥

মা বলিলেন—"নিমাই, বিশ্বরূপের মত নিষ্ঠুরতা করিস না। সন্ন্যাসী হইয়া আর দেখা দিল না। তুই তেমন করিলে আমার মৃত্যু হবে।"

গৌরসুন্দর কহিলেন—"মা, এই দেহ তোমারই। তোমারি শরীর এতে মোর কিছু নাই। তুমি যাহা কহ তাহাই করিব। যে আদেশ কর তাহাই পালন করিব।" এই কথা বলিয়া পুনঃপুনঃ নমস্কার করিতে লাগিলেন। নিমাইর উক্তিতে মা তুষ্ট হইয়া পুনঃপুনঃ কোলে করিতে লাগিলেন।

গৌরসুন্দর দশ দিন অদ্বৈত গৃহে ছিলেন। প্রথম দিন সীতাদেবী পাক করিয়াছিলেন; পরে প্রত্যেকদিন শচীমাতাই আদরে শত শত দ্রব্য রান্না করিয়া নিমাইকে ভোজন করাইতেন।

নিমাই কীর্ত্তন করিতে করিতে ধূলায় পড়িয়া যায়। অঙ্গে কত ব্যথা লাগে দেখিয়া শচীমাতা নারায়ণের চরণে প্রার্থনা করিলেন—

যে কালে নিমাই পড়ে ধরণী উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই শরীরে ॥

সকল ভক্তের একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও ধর্ম্মপ্রাণা জগজ্জননী শচীদেবী সন্ন্যাসী পুত্রকে আবার গৃহে ফিরিতে আদেশ দিতে পারিলেন না। শুধু একটি নির্দেশ দিলেন—"তুমি বৃন্দাবনে যাইও না। বড় দূর বৃন্দাবন। পুরীধামে থাক, নবদ্বীপ হইতে অনেক কাছে। তোমার খবর বার্ত্তা সহজে পাব।"

গৌরসুন্দর দিন দশেক শান্তিপুর থাকিলেন। ভক্তসঙ্গে বহু আনন্দলীলা করিলেন। তারপর সকলকে আবার দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া চলিলেন, মাতৃ-আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া, পুরীধাম অভিমুখে।

ভক্তগণ কতদূর পর্য্যন্ত প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তারপর প্রভু সকলকে প্রবোধ দিয়া মধুর কথা বলিলেন—

"চিত্তে কেহো কোনো কিছু না ভাবিহ ব্যথা।
তোমা সভা আমি নাহি ছাড়িব সর্ব্বথা ॥

কৃষ্ণ নাম লহ সভে বসি গিয়া ঘরে।
আমি আসিব দিন-কথেক ভিতরে ॥

প্রভু দক্ষিণ মুখে চলিলেন। ভক্তগণ ভূমিতে আছাড় পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মথুরায় গেলে গোপীগণ যেমন শোক সমুদ্রে ডুবিয়াছিলেন—গৌরভক্তগণেরও আজ সেই দশা হইল। শ্রীবৃন্দাবন দাসজী বলিয়াছেন—

"দৈবে সে-ই প্রভু, ভক্তগণো সে-ই সব।
উপমাও সে-ই সে, সে-ই সে অনুভব ॥"

পুরী পথে

জগন্নাথই কৃষ্ণ। কৃষ্ণই জগন্নাথ। কৃষ্ণ বিরহী গৌরাঙ্গসুন্দর জগন্নাথের বদন দেখিয়া বিরহজ্বালা মিটাইবেন, এই আশায় প্রবল আকুলতা লইয়া ছুটিয়াছেন পুরীর পথে।

প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন—ছয়জন পার্ষদ। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। প্রথমে প্রভু আটিসারা গ্রামে পৌছিলেন। সেখানে অনন্ত পণ্ডিত নামক এক সাধু গৃহে প্রভু থাকিলেন। সারারাত কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে কাটাইলেন।

জাহ্নবীর কুলে কুলে চলিতে চলিতে প্রভু আসিলেন ছত্রভোগ। এইখানে গঙ্গা শতমুখী হইয়াছেন। অম্বুলিঙ্গ ঘাটে শিবলিঙ্গ আছেন। এখানে শিব গঙ্গা দর্শন করিয়া নিজেই জলময় হইয়া গিয়াছিলেন। প্রভু অম্বুলিঙ্গ ঘাটে গিয়া গঙ্গাদর্শন করতঃ বহু নৃত্য করিলেন। শেষে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নিত্যানন্দ কোলে করিয়া বলিলেন—

পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর ॥

কতদূর জগন্নাথ

আবিষ্ট হইলা প্রভু করি আচমন্
"কতদূর জগন্নাথ?" বোলে ঘন ঘন ॥

প্রভু কেবল কাঁদেন "কতদূর জগন্নাথ" বলিয়া। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেন—

আপনেই জগন্নাথ ভাবেন আপনে।

আপনে করিয়া আর্ত্তি লওয়ায়েন জনে॥

দক্ষিণ দেশের অধিকারী রামচন্দ্র খান। প্রভুর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ করিলেন। ভাবাবিষ্ট প্রভু "জয় জয় জগন্নাথ" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কতক্ষণে স্থির হইয়া প্রভু রামচন্দ্র খানকে বলিলেন—আমি কি প্রকারে সকাল সকাল নীলাচল যাইতে পারি, তুমি তার ব্যবস্থা কর। খান বলিলেন, যদিও সময় খুব বিষম, তথাপি তোমার আজ্ঞা পালন করিব।

রামচন্দ্র খান প্রভুর জন্য নৌকা আনিলেন। প্রভু নৌকারোহণ করিয়া প্রিয়জন সহ ছত্রভোগ হইতে যাত্রা করিলেন। শ্রীমুকুন্দ নৌকায় কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নৌকার মাঝিরা বলিল—"কীর্ত্তন করলে ডাকাতরা টের পাবে।" প্রভু বলিলেন "সুদর্শন চক্র রক্ষক থাকিতে ভক্তের কোন ভয় নাই।"

প্রয়াগ ঘাটে গিয়া নৌকা থামিল। সেখান হইতে উড়িষ্যা দেশ আরম্ভ। উড়িষ্যা দেশে পৌঁছিয়াছি বলিয়া প্রভুর আনন্দ। ঐ স্থানে গঙ্গাঘাটে প্রভু স্নান করিলেন। যুধিষ্ঠির স্থাপিত মহেশকে প্রণাম করিলেন। প্রভু ভক্তগণকে বসাইয়া নিজেই একাকী গেলেন গ্রামে ভিক্ষা করিতে। অপর্য্যাপ্ত দ্রব্য ভিক্ষা করিয়া আনিলেন। জগদানন্দ রান্না করিয়া ভোগ লাগাইলেন। সারা রাত্র ভরিয়া কীর্ত্তন চলিল।

ঊষাকালে প্রভু পুনরায় যাত্রা করিলেন। পথে এক দানী (কর আদায়-কারী) দান (কর) চাহিয়া সবাইকে আটক করিল। "আমি একা, আমার কেহ সাথী নাই আমাকে ছাড।" প্রভুর এই কথা শুনিয়া দানী প্রভুকে ছাড়িয়া দিয়া ভক্তগণকে ধরিল। প্রভু ওদিকে গিয়া একাকী বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভুর নয়নের জলধারা দেখিয়া দানী ভাবিল—

"এ পুরুষ কভু নর নহে

মানুষের নয়নে কি এত ধারা বহে।"

সকলে মিলিয়া পরিচয় দিলেন—"ইনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, আমরা সকলে তাঁর ভৃত্য। সকলের প্রেম দেখিয়া দানী-মুগ্ধ হইয়া সবাইকে ছাড়িয়া দিল। প্রভু গৌরহরি দানীর প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিলেন। অসীম করুণা ঢালিয়া দিলেন।

তারপর প্রভু গণসহ জলেশ্বর শিব দর্শন করিলেন। বাঁশদহ গ্রামে আসি-লেন, সেখানে বহু শাক্তের বাস। তারা প্রভুকে নিজ মঠে ডাকিয়া নিয়া গেল।

তাহারা প্রভুকে বলিল "আজ আনন্দ ভোগ কর।" শাক্তেরা মদিরাকে আনন্দ বলে। প্রভু তাহা জানিতেন না। তিনি শাক্তদের সঙ্গে কিছুক্ষণ নৃত্যগীত করিলেন। নানাবিধ রসের কথা তাহাদের সঙ্গে বলিলেন। চলিতে চলিতে প্রভু গৌরহরি আসিলেন রেমুনা। সেখানে গোপীনাথ দর্শন করিয়া প্রভু ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করিলেন। প্রণাম করা মাত্র দর্শকগণের সাক্ষাতে ভগবান গোপীনাথের শ্রীমস্তক হইতে পুষ্পরচিত চূড়া বিচলিত হইয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের মস্তকে গিয়া পতিত হইল।

প্রভোঃ শীর্ষে শীর্ষাদপি ভগবত স্তস্য চলিতা।
প্রসূনানাং চূড়ান্যপতদখিলে পশ্যতিজনে॥

১১।৭৮ কবি কর্ণপুর।

ভক্তবর্গ সঙ্গে প্রভু সেখানে বিস্তর নৃত্যগীত করিলেন। সেখানে প্রভু থাকিলেন "মহাপ্রসাদ ক্ষীর লোভে"।

শ্রীঈশ্বর পুরীর নিকট পূর্ব্বে প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞির কাহিনী শুনিয়াছেন—তার জন্যে যে গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন তাহা প্রভু নিজ শ্রীমুখে ভক্তগণের নিকট বর্ণনা করিলেন। পুরী গোসাঞির সিদ্ধি প্রাপ্তিকালে যে শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন॥ "অয়ি দীন দয়ার্দ্র নাথ হে" সেই শ্লোক উচ্চাবণ করিয়া প্রভু গৌরসুন্দর প্রেমে বিবশ হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। নিতাই চাঁদ কোলে তুলিয়া শান্ত করিলেন। রেমুনা হইতে প্রভু যাজপুর আসিলেন। সেখানে বহু দেবালয়। একাকী নিভৃতে প্রভু সকল দেবালয় দর্শন করিয়া একদিন পর ফিরিলেন। যাজপুর ধন্য করিয়া প্রভু কটক নগরে আসিলেন।

কটকে প্রভু পরমানন্দে সাক্ষী গোপাল দর্শন করেলেন। নিতাই চাঁদের মুখে ভক্তগণসহ মহাপ্রভু সাক্ষীগোপালের লীলা কাহিনী শ্রবণ করিলেন। যখন সাক্ষীগোপালের আগে প্রভু দাঁড়াইলেন তখন "ভক্তগণ দেখে যেন দোঁহে এক মূর্ত্তি।" নিত্যা নন্দ প্রভু ঐ দৃশ্য দেখিয়া ভক্তগণ সঙ্গে "ঠারাঠারি" করিতে লাগিলেন ও মধুর মধুর হাসিতে লাগিলেন। কটকে মহানদীতে স্নান করিয়া ভুবনেশ্বর পৌছিলেন। বিন্দুসরোবরে স্নান করিলেন। শিব সকল তীর্থের জল বিন্দু বিন্দু আনিয়া বিন্দু সরোবর সৃষ্টি করিয়াছেন। ওখানকার একাম্র ক্ষেত্রও শিবের পরম প্রিয়।

নিজ প্রিয় শঙ্করের বৈভব দেখিয়া প্রভু ভক্তগণ সহ পরমানন্দ লাভ

করিলেন। শিবের আগে "শিবরাম গোবিন্দ" বলিয়া বহু নৃত্যগীত করিলেন। সেই রাত্র প্রভু সেখানে বাস করিলেন।

এই প্রকারে প্রভু ক্রমশঃ কমলপুর আসিলেন। সেখানে ভার্গী-নদীর জলে স্নান করিলেন। স্নানকালে প্রভু নিত্যানন্দের হাতে দণ্ডখানি রাখিলেন। তৎপর কপোতেশ্বর দর্শন করিতে গেলেন। দণ্ড হাতে পাইয়া নিত্যানন্দ প্রভুর দণ্ডের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন।

ওরে দণ্ড আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এ-ত যুক্ত নহে॥

এই কথা বলিয়া দণ্ডখানি তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। প্রভু আঠার নালায় পৌছিয়া যখন দণ্ড চাহিলেন তখন নিতাই চাঁদ বলিলেন তিনি দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন, প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কি লাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি"

উত্তরে নিত্যানন্দ বলিলেন।

"ভাঙ্গিয়াছি বাঁশ খান
না পার ক্ষমিতে কর যে শাস্তি বিধান"

প্রভু বলিলেন "যাহে সর্ব দেবের অধিষ্ঠান, সে তোমার মতে হইল বাঁশখান"

"সবে দণ্ড মাত্র ছিল মোর সঙ্গ
তাহো আজো কৃষ্ণের ইচ্ছায় হ'ল ভঙ্গ।
এতেক আমার সঙ্গে কারো সঙ্গ নাই,
তোমরা আগে চলো কিংবা আমি আগে যাই॥"

মুকুন্দ বলিলেন প্রভু তুমি আগে চল। আমরা পিছে আসি, প্রভু তখন আরো দ্রুত গতিতে চলিলেন। প্রভু দেখিলেন জগন্নাথের মন্দিরের চূড়ার অগ্রভাগে এক বালগোপাল তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছেন। অতি বেগে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রাণের ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। অমনি ভাবাবিষ্ট হইয়া মন্দির মধ্যে পড়িয়া গেলেন। ঐ সময় পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম আসিয়াছেন জগন্নাথদেব দর্শন করিতে।

বাসুদেব সার্বভৌম

তৎকালীন ভারতবর্ষে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম। ন্যায়-শাস্ত্রের বেদান্ত শাস্ত্রের তিনি একজন প্রতিভাশালী অধ্যাপক। বাসুদেবের

জন্মস্থান নবদ্বীপে। নবদ্বীপে তাঁহার টোল ছিল। কতশত ছাত্র তাঁহার কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যায়ন করিয়া পণ্ডিত হইয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের আবির্ভাবের কয়েক বছর পূর্বেই তিনি নবদ্বীপ ছাড়িয়া আসিয়াছেন। আসিয়াছেন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের আহ্বানে, তিনি রাজধানী পুরীতে দ্বার-পণ্ডিত। তাঁর বাসস্থান শ্রীমন্দির হইতে অনতিদূরে বালুখণ্ডে মার্কণ্ডেয় সরোবরের তীরে।

প্রত্যেক দিন সকালে আহ্নিক কৃত্য সমাপান্তে শ্রীমন্দিরে আসেন জগন্নাথ দর্শন করিতে। আজও আসিয়াছেন। আসিয়া দেখেন এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। একজন পরম সুন্দর যুবক সন্ন্যাসী মূচ্ছিত অবস্থায় শ্রীমন্দিরে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দেহে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। অঙ্গে সাত্ত্বিক বিকার। পাণ্ডাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে। প্রতিহারিগণ প্রহার করিতে উদ্যত। পণ্ডিত তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন।

এমন সময় মন্দিরের ভোগের সময় হইল। মন্দির এখন বন্ধ হইয়া যাবে। পণ্ডিত সার্বভৌম তখন প্রভুর অচেতন দেহ শিষ্যদের দ্বারা বহন করাইয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন শ্বাস প্রশ্বাস নাই, উদরে কোন স্পন্দন নাই। পণ্ডিত বুঝিলেন ইহা সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব। নিত্যসিদ্ধ ভক্ত ছাড়া মানুষে ইহা সম্ভব নহে।

"এই শক্তি মনুষ্যের কোন কালে নয়॥"

ভক্তগণের অনুসন্ধান

লীলাময় প্রভু আগে আগে ছুটিয়া আসিয়াছেন। পশ্চাদ্বর্ত্তী ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে দৌড়িয়া পারিলেন না। হঠাৎ প্রভু কোন দিক হইতে কোন দিকে গেলেন তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শ্রী মন্দিরের সিংহদ্বারে পৌছাইয়া তাহারা লোকমুখে শুনিলেন এক সন্ন্যাসী জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া ছিল। পণ্ডিত সার্বভৌম তাঁহাকে লইয়া নিজ গৃহে গিয়াছেন।

কে সার্বভৌম, কোথায় তাঁহার গৃহ, তাহা কেহই জানে না। এমন সময় গোপীনাথ আচার্য্য সেখানে উপস্থিত। তাঁহার বাড়ীও নবদ্বীপে। নবদ্বীপবাসী মুকুন্দ তাঁহাকে খুব ভালো করিয়া চেনেন। তিনি গোপীনাথকে কহিলেন আমরা প্রভুর সঙ্গে আসিয়াছি। প্রভু আগে ছুটিয়া আসিয়াছেন। শুনিলাম পণ্ডিত সার্বভৌম তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছেন।

গোপীনাথ বলিলেন, সার্বভৌম আমার নিকট আত্মীয়। তাঁহার বাসস্থান আমি জানি। চল সকলে যাই। সার্বভৌম গৃহে গিয়া সকলে প্রভুকে পাইলেন। কিন্তু তিনি তখনও মূর্চ্ছিত, সকলে মিলিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় প্রহরে চেতনা আসিল।

সার্বভৌম মন্দির হইতে বিস্তর প্রসাদ আনাইলেন, ও প্রভুর সহিত সকলকে তৃপ্তি সহিত মধ্যাহ্ন ভোজন করাইলেন। আহারান্তে বাসুদেব প্রভুকে 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু, "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, ইহাতে সার্বভৌম বুঝিলেন, প্রভু বৈষ্ণব সন্ন্যাসী।

বাসুদেব ও গোপীনাথ

বাসুদেব ভট্টাচার্য্য ও গোপীনাথ আচার্য্য, দুজনের সম্বন্ধ শ্যালক, ভগ্নীপতি। দুইজনে কথোকপথন চলিল। বাসুদেবের আগ্রহে গোপীনাথ প্রভুর সকল পরিচয় দিলেন। পূর্ব্বাশ্রম নবদ্বীপ, পিতা মিশ্র পুরন্দর জগন্নাথ। নীলাম্বর চক্রবর্তী ইহার মাতামহ, বাড়ীর নাম বিশ্বম্ভর। সন্ন্যাস নাম "কৃষ্ণচৈতন্য"। সন্ন্যাসের গুরু কেশব ভারতী। নীলাম্বর চক্রবর্তী সার্বভৌমের পিতা বিশারদের সহাধ্যায়ী,। নবদ্বীপের পরিচয়ে বাসুদেব সুখী হইলেন, তবে বলিলেন, এই যৌবন বয়সে সন্ন্যাস নিয়াছেন। রক্ষা করা খুব কঠিন হবে। আমার ইচ্ছা ইহাকে সর্বদা বেদান্ত শ্রবণ করাই, বেদান্ত শ্রবনে বৈরাগ্য দৃঢ় হইবে। আর ভারতী সম্প্রদায় খুব উত্তম নয়। তোমাদের মত হইলে আবার যোগ পট্ট দিয়া সংস্কার করাইয়া সরস্বতী প্রভৃতি উত্তম সম্প্রদায় প্রবেশ করাইযা দেব।

ভট্টাচার্য্য ও আচার্য্য

সার্বভৌমের কথায় আচার্য্য গোপীনাথ ও মুকুন্দ দুজনেই ব্যথিত হইলেন। গোপীনাথ আচার্য্য বলিলেন, ভট্টাচার্য্য-তুমি কাহাকে বেদান্ত পড়াইতে চাও? ইনি তো স্বয়ং ভগবান। ভগবত্তার সকল লক্ষণ—ইহাতে বিদ্যমান। ভট্টাচার্য্য উত্তর দিবার পূর্বেই তাঁহার শিষ্যগণ বলিয়া উঠিলেন "ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে।" আচার্য্য উত্তরে দিলেন, বিজ্ঞজন যে লক্ষণে ঈশ্বর স্থাপন করেন, আমিও সেই লক্ষণে কহি।

শিষ্যগণ—একমাত্র অনুমান, প্রমাণ দ্বারাই ঈশ্বর স্থাপনীয়। ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং

কার্য্যত্বাৎ যথা ঘটঃ।

আচার্য্য—অনুমান প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর স্থাপনীয় নয়, একমাত্র কৃপা ছাড়া কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না। ভট্টাচার্য্য, তুমিও দ্বিতীয় পণ্ডিত। কিন্তু তোমার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা নাই। তাই তাঁহাকে সম্মুখে দর্শন করিয়াও চিনিতে পার না।

ভট্টাচার্য্য—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা নাই, ইহা সত্য, কিন্তু তোমার প্রতি যে কৃপা হইয়াছে, তাহাও তো প্রমাণ করিতে হইবে।

আচার্য্য দৃঢ়ভাবে উত্তর করিলেন—ভট্টাচার্য্য, তোমার সম্মুখে এই যিনি বসিয়া আছেন ইনি স্বয়ং ঈশ্বর। আমি জানিয়াছি, তুমি জান নাই। ইহাতেই বুঝা গেল আমার প্রতি কৃপা হইয়াছে। তোমার প্রতি হয় নাই।

ভট্টাচার্য্য—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একজন মহান্ত, ইহা মানিতে পারি। কিন্তু অবতার হইতে পারে না। কারণ কলিযুগে বিষ্ণুর অবতার নাই।

আচার্য্য— তুমি শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া এ কি কহ? কলিযুগে অবতারের যথেষ্ট প্রমাণ ভাগবতে, মহাভারতে আছে। তোমার উপর কৃপা নাই তাই প্রমাণ দেখিয়াও মান না। যে মানে না, তাহাকে প্রমাণ দেখাইয়াও লাভ নাই।

প্রভু বলিলেন, গোপীনাথ, পণ্ডিত সার্বভৌম আমার অভিভাবক স্থানীয়। আমার প্রতি স্নেহ আছে, অনুগ্রহ আছে। কিসে আমার সন্ন্যাস ধর্ম-রক্ষা পায় তাহা চিন্তা করেন। বেদান্ত পড়াইতে চাহেন। তোমরা ইহাতে দোষ-দৃষ্টি করিও না।

মহাপণ্ডিত ও মহাপ্রভু

পণ্ডিত মহাপ্রভুকে বলিলেন "বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম।" মহাপ্রভু বলিলেন আমার যাহা করণীয় আপনি বলুন। পণ্ডিত সাতদিন ধরিয়া বেদান্ত সূত্রের অর্থ ও শঙ্করাচার্য্য মত অনুযায়ী ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইলেন। প্রভু শুধু শুনিলেন, কোন একটি বাক্য উচ্চারণ করিলেন না।

অষ্টম দিনে পণ্ডিত বলিলেন—আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহা বুঝিতে পারিতেছ তো? না বুঝিলে তাহাও বলিতে হয়। মহাপ্রভু কহিলেন—আমি মূর্খ, শাস্ত্রাধ্যয়ন নাই। আপনি যখন সূত্রগুলি উচ্চারণ করেন, তখন তাহা পরিস্কার। বেশ বুঝিতে পারি। যখন ভাষ্য পড়েন তখন সূত্রের মুখ্যঅর্থ ঢাকিয়া কাল্পনিক অর্থ করিতে থাকেন।

ব্যাসের সুত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘ করে আচ্ছাদন ॥

বেদ বলেন। ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু। তিঁনি ঈশ্বর। তিঁনি সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ। আপনি কল্পনা করিয়া তাঁহাকে নিরাকার বলেন।

শ্রুতি যেখানে যেখানে বলিয়াছেন ব্রহ্মের হস্তপদ নাই—"অপাণিপাদঃ", তখন তাহার অর্থ বুঝিতে হইবে-অপ্রাকৃত হস্তপদ আছে। বেদে বাক্য আছে —ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, ব্রহ্মেতেই জগতের লয়—ব্রহ্ম দ্বারাই জগৎ সঞ্জীবীত। ব্রহ্ম অপাদান কারক, অধিকরণ কারক ও করণ কারক। এই তিন কারকত্ব যেখানে আছে, তিনি নির্বিশেষ হইবেন কি প্রকারে? আপনি ব্রহ্মকে নিরাকার ও নিঃশক্তিক বলেন-ইহা বেদ-বিরুদ্ধ কথা।

ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর তিনটি প্রধান শক্তি। অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি, জীব তটস্থাশক্তি আর বহিরঙ্গা শক্তি জগৎ। এই তিন শক্তিতে যিনি সর্ব্বদা শক্তিমান তাঁহাকে নিঃশক্তিক বলেন কোন যুক্তিতে?

ঈশ্বর মায়াধীশ। জীব মায়াবশ। জীব ও ঈশ্বরে যে আপনি অভিন্ন কহেন, ইহা শাস্ত্র বাক্য নহে। আপনার কল্পনা মাত্র। ঈশ্বর সাকারও নহেন নিরাকারও নহেন। তিনি চিদাকার। আপনি যে তাঁহার বিগ্রহ মানেন না। ইহা পাষণ্ডের লক্ষণ। সূত্রকার বেদব্যাস সর্ব্বত্র পরিণামবাদ স্থাপন করিয়াছেন। আপনার ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য মনগড়া বিবর্ত্তবাদ-স্থাপন করিয়া জগৎ মিথ্যা বলিয়াছেন। জগৎ-ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তি। জগৎ মিথ্যা নহে। ব্রহ্ম জগৎ রূপে পরিণত হইয়াও নির্ব্বিকার।

বেদের মহাবাক্য ও সিদ্ধান্ত

বেদের মহাবাক্য "প্রণব"। "প্রণব" ঈশ্বরের মূর্ত্তি। আচার্য্য শঙ্কর তাহা না মানিয়া প্রাদেশিক বাক্য "তত্ত্বমসি"কে মহাবাক্য বলেন। ইহাও কাল্পনিক। শঙ্করাচার্য্যের দোষ নাই। তিনি ঐরূপ কাল্পনিক ব্যাখ্যা করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

বেদের স্বরূপ সিদ্ধান্ত কহিতেছি, শুনুন। বেদে তিনটি বস্তুর কথা আছে। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। ভগবান কৃষ্ণ, সম্বন্ধ। তাঁহার প্রতি শুদ্ধাভক্তি অভিধেয়। তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে সর্ব্বাধিক প্রয়োজন যে বস্তুর, তাহা হইতেছে প্রেম। ইহা ছাড়া আর যত কথা সবই কল্পনা মাত্র।

প্রভুর বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনিয়া সার্ব্বভৌম স্তব্ধ। প্রভু আবার বলিলেন—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ্ এই চারিটিই পুরুষার্থ নয়। জীবের পুরুষার্থ প্রেম। ইহা পঞ্চম পুরুষার্থ। এই কথা বলিয়া প্রভু ভাগবতের "আত্মারামশ্চ মুনয়ঃ", এই শ্লোক উপস্থাপন করিলেন।

ভট্টাচার্য্য শ্লোকের অর্থ শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, প্রভু বলিলেন, আগে আপনি ব্যাখ্যা করুন। তারপর আমি করিব। ভট্টাচার্য্য শ্লোকটির নয় প্রকার অর্থ করিলেন।

প্রভু বলিলেন—পণ্ডিত, আপনি বৃহস্পতি তুল্য। আপনার ব্যাখ্যা সব বুদ্ধিবলে করিয়াছেন। শাস্ত্রের যাহা হার্দ্দ্য, তাহা স্পর্শ করেন নাই। প্রভু তখন শ্লোকের আঠার প্রকার অর্থ করিলেন, পণ্ডিতের নয়টি ব্যাখ্যার একটিও স্পর্শ না করিয়া।

চমৎকার শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া বাসুদেব পণ্ডিত বিস্ময়োবিষ্ট। ভাবিলেন ইনি স্বয়ং কৃষ্ণ। আমি গর্ব্ববশে অপরাধ করিয়াছি। এই ভাবিয়া তিনি শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণে শরণাগত হইলেন।

প্রভু তাহাকে নিজ ষড়ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া আত্মসাৎ করিলেন।

সার্বভৌমের নবজীবন

সার্ব্বভৌম পণ্ডিত প্রভুর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ করিলেন। পরে নতজানু হইয়া একশত আটটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া অভিনব একটি স্তব করিলেন। বলিলেন প্রভু তুমি যে বিশ্বজগৎ উদ্ধার করিবে ইহা বড় কথা নয়। আমাকে যে উদ্ধার করিলে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য কথা। তুমি শৃগালকে সিংহ করিয়াছ। কাককে গরুড় করিয়াছ, তর্কশাস্ত্র আমাকে লৌহপিণ্ড করিয়াছিল, তুমি করুণার প্রচণ্ড প্রতাপে লৌহকে স্বুবর্ণ করিয়াছ।

একদিন সকালে প্রভু জগন্নাথের শয্যা উত্থান দর্শন করিলেন। পূজারী প্রভুর হাতে মালা ও প্রসাদান্ন দিলেন। উহা লইয়া প্রভু সার্ব্বভৌমের বাড়ী আসিলেন। ভট্টাচার্য্য চেতন পাইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন। কৃষ্ণ নাম শুনিয়া প্রভুর আনন্দ হইল। প্রসাদান্ন তখন প্রভু ভট্টাচার্য্যের হাতে দিলেন, তখন তিনি সন্ধ্যাবন্দনা করেন নাই। তবু প্রসাদান্ন হাতে পাইয়াই ভক্ষণ করিলেন। ইহাতে প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন—আজ তোমার

মন কৃষ্ণ প্রাপ্তি যোগ্য হইল। মহাপ্রসাদ গ্রহণে বুঝিলাম তোমার মায়া-বন্ধন কাটিয়াছে।

সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একতান।
মহাপ্রভু বিনে সেব্য নাই জানে আন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান, এই জপ এই লয় নাম॥

দক্ষিণ দেশ উদ্ধার লীলা

অষ্টাদশাহানি স তত্র নীত্বা
বিলোক্য তং দেবমতীবহর্ষাৎ।
প্রচক্রমে চংক্রমনায় নাথো
বিমোহয়ন্ কাংশ্চন বিপ্রয়োগৈঃ॥ ১২।৯৪ কর্ণপুর।

নীলাচলধামে শ্রীগৌরচন্দ্র আঠার দিন যাপন করিয়া অতীব হর্ষ সহকারে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া, নিজ ভক্তগণকে বিমোহন পূর্ব্বক তীর্থ ভ্রমণে চলিলেন। কবি কর্ণপুরের এই উক্তি হইতে জানা যায় প্রভু নীলাচলে মাত্র আঠার দিন ছিলেন। কিন্তু এই দিনের সংখ্যা কবিরাজ গোস্বামীর উক্তিতে সমর্থিত হয় না।

কবিরাজ বলেন—"মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস। ফাল্গুনে কৈল নীলাচলে বাস। ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল। চৈত্রে বহি কৈল সার্ব্বভৌম বিমোচন। বৈশাখে প্রথমে দক্ষিণে যাইতে হৈল মন।" এই হিসাবে গোটা চৈত্রমাস ও ফাল্গুনের অর্দ্ধেকটা ও বৈশাখের অর্দ্ধেকটা ধরিলে প্রভুর অন্ততঃ দুই মাস নীলাচল বাস স্থির হয়।

প্রভু বলিলেন—সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে, অবশ্য চলিব আমি তার অন্বেষণে। কবিরাজ গোস্বামী বলেন—"দক্ষিণ দেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল।" প্রভুর ইচ্ছা যাবেন একাকী। ভক্তগণের একান্ত অনুরোধে কৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইলেন। তার কার্য্য জলপাত্র ও বহির্ব্বাস বহিবেন।

বিদায় কালে সার্ব্বভৌম বলিলেন—গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে রায় রামানন্দ সঙ্গে মিলিত হইবেন। তাহাকে সম্ভাষণ করিলে তার মহিমা জানিতে পারিবেন।

পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম।
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহ একজন॥

তাহার বাক্য অঙ্গীকার করিয়া প্রভু চলিলেন। সকলের কাছে আশীর্ব্বাদ চাহিলেন যেন আবার আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইতে পারেন। বিচ্ছেদ ব্যাকুল ভক্তগণ বিদায় হইলেন। প্রভু চলেন—"প্রেমাবেশে যায় করি নাম সংকীর্ত্তন।"

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥

যাকে পথে দেখেন তাকেই বলেন "হরি হরি বল।" প্রভুর মুখে নাম শুনিয়া লোকে প্রেমোন্মত্ত হয়। তারপর নিজগ্রামে গিয়া, "যারে দেখে তারে বলে লহ কৃষ্ণ নাম। এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম।"

সারা দেশ বৈষ্ণব করিতে করিতে প্রভু সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত চলিলেন। কৃষ্ণ-নামামৃত বন্যায় প্রভু দক্ষিণ দেশ ভাসাইতে ভাসাইতে চলিলেন।

নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণ দেশে॥

চলিতে চলিতে প্রভু কূর্ম্মস্থানে আসিলেন।

বাসুদেব-উদ্ধার

প্রভু গৌরসুন্দর কূর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীকূর্ম্ম বিগ্রহ দর্শন করিলেন। ঐখানে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ গৃহে ভিক্ষা লইয়া প্রভু চলিয়া গেলেন।

প্রভু কূর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছেন শুনিয়া ঐ দেশী একজন ব্রাহ্মণ বহুকষ্টে পথ চলিতে চলিতে কূর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া তিনি ভূমিতে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত। সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ। নাম বাসুদেব। তার দেহ হইতে কুষ্ঠের কীট মাটিতে পড়িয়া গেলে, তিনি আবার তাহা উঠাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দেন। প্রভু চলিয়া গেছেন, শুনিয়া অশেষ প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য—সেইক্ষণে প্রভু সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন দিলেন ও সকল ব্যাধির দুঃখ চিরতরে দূর করিয়াদিলেন।

সেই ক্ষণে আসি প্রভু তারে আলিঙ্গিলা।
প্রভু স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল।

তাহাকে সুন্দর করিয়া দিয়া প্রভু গৌরহরি কহিলেন—কৃষ্ণনাম উপদেশ দিয়া জগৎ-জীবের কল্যাণ কর। শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন। এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন।

রামানন্দ মিলন

তারপর প্রভু জীয়ড় নৃসিংহক্ষেত্র হইয়া গোদাবরী তীরে উপনীত হইলেন। গোদাবরী দেখিয়া প্রভুর যমুনা স্মরণ হইল। তীর বন দেখিয়া বৃন্দাবন স্ফুর্ত্তি হইল। নদীতটে আসিয়া প্রভু মৃদু মধুর নাম-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

অনেক বাদ্য-ভাণ্ড সহ সেই সময় রামানন্দ রায় স্নান করিতে আসিলেন। অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী গোদাবরী তটে দেখিয়া রায় রামানন্দ নিকটবর্ত্তী হইলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রায় রামানন্দ ?" রায় কহিলেন "তেহো কহে সেই হও দাস শূদ্র মন্দ।"

প্রভু তখন তাহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ফলে দুজনেই অচেতন হইলেন। অতি স্বাভাবিক ভাবেই দুজনে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। উভয়ের অঙ্গে স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বিবর্ণতা সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। উভয়েই গদ্‌গদ কণ্ঠে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

দোঁহার মুখেতে শুনি গদ্‌গদ কৃষ্ণবর্ণ
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার॥

রামানন্দ রায় সঙ্গে স্নান করিতে অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। তাহারা মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন।

এই সন্ন্যাসীর অঙ্গের তেজ ব্রহ্মজ্যোতি তুল্য। ইহার মত লোক শূদ্র স্পর্শ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। আরও আশ্চর্য্য, আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। চক্ষে ধারা বহিতেছে। আবার রাম রায় রাজা তুল্য লোক। মহাপণ্ডিত, মহাগম্ভীর। তিনি একজন সন্ন্যাসীর স্পর্শে এই মত অস্থির হইলেন কেন ?

বিজাতীয় লোকের এই জাতীয় আলোচনা শুনিয়া দুইজনেই ভাব সংবরণ

করিলেন। প্রভু বলিলেন, "তোমার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য আমাকে সার্ব্বভৌম বলিয়া দিয়াছেন। এইজন্যেই আমি এখানে আসিয়াছি। ভাল হইল, সহজেই সাক্ষাৎ মিলিল।"

রায় কহিলেন, "সার্ব্বভৌম আমাকে ভৃত্যতুল্য ভালবাসেন। পরোক্ষেও আমার কল্যাণ চিন্তা করেন। তাঁহার কৃপায় তোমার দুর্লভদর্শন লাভ করিলাম। তুমি আমাকে নিস্তার করিতেই এখানে আসিয়াছ। এই রাজসেবী, বিষয়ী, শূদ্রাধমকে দর্শন করাও তোমার শাস্ত্রীয় নীতি নয়। আজ তুমি অপার-করুণা করিয়া আমাকে স্পর্শ-আলিঙ্গন দিলে। তোমার কৃপাশক্তি তোমাকে নিন্দ্য কর্ম্ম করাইল।"

"শাস্ত্রে বলে মোহান্তের এই স্বভাব। নিজের কোন কার্য্য না থাকিলেও কৃপা করিবার জন্য অন্যত্র গমন করেন। আমার সঙ্গী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তোমার দর্শনে আনন্দে বিগলিত হইয়াছেন।" প্রভু বলিলেন—"তা নয় রামানন্দ,তুমি ভাগবতোত্তম—তোমার দর্শনে সকলের মন দ্রবীভূত হইয়াছে। আমি যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী-আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি।"

রায় কহিলেন, "যদি কৃপা করিয়া আসিয়াছ—দিন দশেক থাকিতে হইবে। নতুবা আমার মন শোধন হইবে না।"

প্রভু গৌরহরি রায় রামানন্দের নিকট দশদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার নিকট "সাধ্যের নির্ণয়" শুনিতে চাহিয়াছিলেন। প্রভুর অশেষ কৃপা শক্তিতে রামানন্দের মুখ হইতে তাহা অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মহাপ্রভুর হার্দ্দ্য যে সাধন-ভজন তার দার্শনিক ভিত্তি, রামানন্দ-সংবাদে প্রকটিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে, মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে ইহা বর্ণিত আছে।

বিদ্যানগর হইতে লীলা রসময় শ্রীগৌরসুন্দর গৌতমী-গঙ্গা; মল্লিকার্জ্জুন, অহোবল নৃসিংহ, সিদ্ধবট, স্কন্দক্ষেত্র, ত্রিমল্ল, বৃদ্ধকাশী, বৌদ্ধস্থান, ত্রিপদী, ত্রিমল্ল, বিষ্ণুকাঞ্চী, ত্রিকালহস্তী, বৃদ্ধকোল, শিয়ালী, ভৈরবী, কাবেরী তীর হইয়া শ্রীরঙ্গমে প্রবেশ করিলেন।

সিদ্ধবটে একজন রামভক্ত গৃহে বাস করিলেন। পরে স্কন্দক্ষেত্র ও ত্রিমল্ল ঘুরিয়া যখন আবার সিদ্ধবটে গেলেন, তখন দেখিলেন রামভক্ত বিপ্র কৃষ্ণভক্ত হইয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ কি প্রভু জিজ্ঞাসা করিলে বিপ্র বলিলেন—

তোমা দেখি কৃষ্ণনাম একবার আইল।
সেই হইতে কৃষ্ণ নাম জিহ্বাতে পশিল॥

বৌদ্ধ মুখে কৃষ্ণ কথা

বৃদ্ধকাশীর নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে বহু বৌদ্ধের বাস। তাহারা প্রভুর সহিত শাস্ত্র লইয়া তর্ক করিল। প্রভু তাহাদের মত খণ্ডন করিয়া বৈষ্ণব মত স্থাপন করিলেন। বৌদ্ধেরা ক্রুদ্ধ হইয়া এক কুমন্ত্রণা করিল।

এক থালা অপবিত্র অন্ন প্রভুর নিকট মহাপ্রসাদ বলিয়া আনিল। এমন সময় একটি প্রকাণ্ড পক্ষী ঠোঁটে করিয়া থালা লইয়া গেল। অপবিত্র অন্ন বৌদ্ধদের গায়ে ছড়াইয়া পড়িল। থালা খানা পাখীর ঠোঁট হইতে পড়িয়া গিয়া বৌদ্ধ আচার্য্যের মাথায় পড়িল। তাঁহার মাথা কাটিয়া গেল। তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। সকলে তখন প্রভুপদে ক্ষমা চাহিলেন। প্রভু বলিলেন—গুরুর কর্ণে কৃষ্ণনাম দেও। তাহাতে তিনি চৈতন্য লাভ করিবেন। তখন কৃষ্ণনাম সকল বৌদ্ধদের মনে ও মুখে লাগিয়া গেল। আর সে নাম ছাড়িতে পারিল না।

শ্রীরঙ্গমে বেঙ্কটভট্ট গৃহে প্রভু অতিথি হইলেন। তার গৃহে প্রভু কৃষ্ণকথা রসে চারিমাস থাকিয়া চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করিলেন। প্রভুর সান্নিধ্যে আসিয়া লক্ষ লক্ষ লোক বৈষ্ণব হইয়া গেল।

গীতাপাঠী বিপ্র

রঙ্গক্ষেত্রে এক গীতাভক্ত ব্রাহ্মণ নিত্য গীতা পাঠ করেন উচ্চৈস্বরে। পাঠকালে বহু অশুদ্ধ উচ্চারণ হয়। শুনিয়া লোকে উপহাস করে। অশুদ্ধ পাঠ করিতে নিষেধ করে। কিন্তু গীতা পাঠকালে ব্রাহ্মণের অশ্রু, কম্প, পুলক হয়। প্রভু গৌরহরি তাহার গীতা পাঠ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করেন—আপনি অশুদ্ধ উচ্চারণ-করেন, অর্থ বোধ হয় না, কিন্তু এত আনন্দ কিসে হয়? বিপ্র বলিলেন, "প্রভু আমি মূর্খ। গুরুর আজ্ঞায় গীতা পড়ি। যখন পাঠ করি তখন দেখি—অর্জ্জুনের রথে শ্রীকৃষ্ণ অশ্বরজ্জু ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আর উপদেশ দিতেছেন। এই দৃশ্য যত দেখি, তত সুখ হয়। পাঠ শেষ হইলে আর দেখি না।" প্রভু বলিলেন, "গীতাপাঠে আপনার অধিকার আছে। গীতার সার অর্থ আপনি জানেন।"

প্রভু কহে গীতা পাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার ॥

নারায়ণ ও কৃষ্ণ

বেঙ্কট ভট্ট শ্রী সম্প্রদায়ী। তাহাদের লক্ষ্মী-নারায়ণ উপাসনা। প্রভু উপহাস করিয়া বলিলেন—"তোমার লক্ষ্মী সতী পতিব্রতা হইয়া নারায়ণ ছাড়িয়া কৃষ্ণপতি কামনা করেন কেন?" ভট্ট বলিলেন, "নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ একই বস্তু। শ্রীকৃষ্ণে মাধুর্য্যের আধিক্য।"

আবার প্রভু বলিলেন—লক্ষ্মী রাসে যাইতে পারিলেন না কেন? ভট্ট উত্তর দিতে পারিলেন না।

প্রভু বলিলেন—লক্ষ্মী গোপীর আনুগত্যে ভজন করেন নাই। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তি গোপীদের মন হরণ করিতে পারে না।

শ্রীরঙ্গম হইতে প্রভু আসিলেন ঋষভ পর্ব্বতে। সেখানে পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে মিলিত হইলেন। পুরী গোসাঞিকে প্রভু নীলাচলে আসিয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে আদেশ করিলেন। তথা হইতে প্রভু শ্রীশৈল দক্ষিণ মথুরা হইয়া কামকোষ্ঠী আসিলেন। সেইখানে এক বিপ্র সারাদিন উপবাসী থাকেন। তাঁহার দুঃখ, পাপিষ্ঠ রাবণ—লক্ষ্মী স্বরূপিনী সীতাদেবীকে চুরি করিল। এই দুঃখে তিনি উপবাস করেন।

প্রভু বলিলেন, "শুন বিপ্র, রাবণ সীতাকে স্পর্শও করে নাই। রাবণ আসিতেছে দেখিয়া সীতা অন্তর্দ্ধান করিলেন। তৎস্থলে রহিল এক মায়া সীতা। রাবণ সেই মায়াসীতাকে লইয়া গিয়াছে।" প্রভুর বাক্যে তাঁহার মনে শান্তি আসিল। রামচন্দ্র যখন সীতার অগ্নিপরীক্ষা করেন, তখন মায়া সীতা অগ্নিতে অন্তর্দ্ধান করেন। সত্যসীতা আসিয়া শ্রীরামের অগ্রে উপনীতা হইলেন। এই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া ব্রাহ্মণ আনন্দে পাক করিলেন। প্রভুকে প্রসাদ পাওইয়া নিজে গ্রহণ করিলেন।

প্রভু তারপর তাম্রপর্ণী, ত্রিপতি হইয়া তীলকাঞ্চী, জিয়ডতলা, গজেন্দ্র-মোক্ষণ-তীর্থ; পানাগড়তীর্থ; চামতাপুর, মলয়পর্ব্বত; কন্যাকুমারী, আমলীতলা দর্শন করিয়া মল্লার দেশে আসিলেন। সেখানকার ভট্টমারী স্ত্রীধন দেখাইয়া কৃষ্ণদাসকে ভুলাইয়া ছিল। প্রভু তাহাদের নিকট হইতে কৃষ্ণদাসকে ফিরাইয়া আনিলেন।

সেখান হইতে পয়স্বিনী তীরে আসিয়া প্রভু কেশব দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইলেন। সেই স্থানে প্রভু ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থ পাইলেন। তাহা লিখাইয়া লইলেন। এই গ্রন্থ বৈষ্ণব শাস্ত্রের সার। তারপর মৎস্যতীর্থ দর্শন করিয়া প্রভু তুঙ্গভদ্রায় আসিলেন। সেখানে তত্ত্ববাদীরা বাস করিতেন। প্রভুকে মায়াবাদী মনে করিয়া খুব একটা অভ্যর্থনা করিলেন না। পরে তাঁহারা প্রভুকে মহাবৈষ্ণব জানিয়া, প্রণাম বন্দনা করিলেন।

প্রভু তাঁহাদের সঙ্গে "সাধ্য-সাধনা তত্ত্ব" আলোচনা করিয়া তাঁহাদের মতবাদ খণ্ডন করিলেন। তাঁহারা মুক্তি ও কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠস্থান দেন। প্রভু প্রেমকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে রাখিলেন। প্রভু বলিলেন, "তোমাদের সম্প্রদায়ের একটি মাত্র গুণ আছে—কি না শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ সত্য মান।"

তারপর প্রভু ফল্গুতীর্থ, ত্রিতকূপ, পঞ্চপ্সরা তীর্থ, শূর্পারক তীর্থ, দেখিয়া লক্ষ্মী ক্ষীর ভগবতী, লাঙ্গা-গণেশ; চোরা পার্ব্বতী দর্শন করিলেন। সেই স্থান হইতে পাণ্ডুপুর আসিয়া ভীমা নদীতে স্নান করিলেন। সেখানে বিঠ্ঠল রাজ দর্শন করিয়া নৃত্য-গীত করিলেন প্রচুর। সেখানে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গ-পুরীর সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, "একবার নবদ্বীপ গিয়া জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম। তাঁহার পত্নীর রান্না মোচাঘণ্টের স্বাদ আজও মনে পড়ে। তাঁহার একপুত্র সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। এই তীর্থে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।" প্রভু বলিলেন—"নবদ্বীপের মিশ্রঘরণী আমার গর্ভ-ধারিণী। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমারই অগ্রজ। সেই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।"

সেখান হইতে প্রভু কৃষ্ণবেন্না তীরে আসিয়া কৃষ্ণকর্ণামৃত পাঠ শুনিয়া এই গ্রন্থ লিখাইয়া লইলেন। তারপর প্রভু তাপী নদীতে স্নান করিয়া মাহিষ্মতীপুর হইয়া নর্মদার তীরে তীরে ধনুতীর্থ ও ঋষ্যমুক গিরি দর্শন করিলেন। সপ্ততাল বৃক্ষ দেখিয়া প্রভু আলিঙ্গন করিলেন। অমনি সপ্ততাল অন্তর্দ্ধান করিলেন। শূণ্যস্থান দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। সকলে জানিল প্রভু গৌরই শ্রীরামচন্দ্রের অবতার। প্রভু পম্পা সরোবরে স্নান করিয়া পঞ্চবটী; নাসিক দর্শন করিলেন। সকলে ব্রহ্মগিরি আসিলেন। সপ্ত গোদাবরী দর্শন করিয়া পুনরায় বিদ্যানগরে উপনীত হইলেন। রামানন্দ রায়কে নীলাচল আসতে আদেশ করিয়া প্রভু আলালনাথে আসিলেন। কৃষ্ণদাসকে পুরী পাঠাইয়া খবর দিলেন।

জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দ সকলে ছুটিয়া আসিল। প্রভু সার্ব্ব-

ভৌম গৃহে সেই দিন ভিক্ষা করিলেন। ভক্তগণ সঙ্গে তীর্থের কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তারপর হইতে প্রভু রাজপুরোহিত কাশী মিশ্রের ঘরে অবস্থান করিলেন।

যখন মহাপ্রভু নীলাচলে আসেন, তখন রাজা প্রতাপরুদ্র কটকে ছিলেন। যখন পুরীতে ফিরিয়া আসেন তখন প্রভু দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছিলেন। রাজা সার্ব্বভৌমকে বলিলেন—"এমন রত্ন পাইয়া ছাড়িলেন কেন?" সার্ব্বভৌম বলিলেন—"তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তবে আবার আসিবেন বলিয়া গিয়াছিলেন।" প্রতাপ রুদ্র প্রভুকে দর্শনের জন্য প্রবল আগ্রহ জানাইলেন। প্রভু ফিরিয়া আসিলে, সার্ব্বভৌম তাঁহার কাছে প্রতাপরুদ্রের দর্শন বাঞ্ছা জানাইলেন। প্রভু কঠোরভাবে অস্বীকার করিলেন। বলিলেন—"সন্ন্যাসীর রাজদর্শন নিষেধ। এইরূপ অনুরোধ আমাকে আবার করিলে আমি শ্রীক্ষেত্র ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।" পণ্ডিত সার্ব্বভৌম রাজাকে এই কথা জানাইলে, তিনি অতি বেদনার্ত্ত হইলেন। অতি দুঃখে বলিলেন, "প্রতাপরুদ্রকে বাদ দিয়া জগৎ উদ্ধার করিতে কি তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন? প্রভু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—রাজ-দর্শন করিবেন না। আমারও প্রতিজ্ঞা প্রভু বিনে প্রাণ ত্যাগ করিব।"

রাজা যখন প্রভু-দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল, তখন ভক্তগণ প্রভুর নিকট যাচ্ঞা করিয়া তাঁহার প্রসাদী একখানি বহির্বাস লইয়া রাজাকে দিলেন। রাজা প্রসাদীবস্ত্র পাইয়া সাক্ষাৎ প্রভু-জ্ঞানে তাহা বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। কিন্তু দর্শন উৎকণ্ঠা কমিল না, আরও বাড়িল। তারপর বহু অনুনয়ে প্রভু প্রতাপরুদ্রের পুত্রের সহিত মিলিত হইতে স্বীকৃত হইলেন। রাজপুত্র প্রভু সান্নিধ্যে আসিলেন। তাহার কিশোর বয়স, শ্যামল বর্ণ দেখিয়া প্রভুর কৃষ্ণস্ফুর্ত্তি হইল ও পুনঃপুনঃ তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রভুর স্পর্শে রাজপুত্রের দেহে স্বাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল। প্রতাপরুদ্র সেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া যেন মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ স্পর্শ পাইলেন এইরূপ অনুভব করিলেন। কিন্তু দর্শনোৎকণ্ঠা কমিল না। অনন্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রথযাত্রার দিন রথে যখন জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্র আরোহণ করিয়াছেন তখন প্রতাপরুদ্র ঝাড়ু লইয়া পথ মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাজা স্বহস্তে তুচ্ছ সেবা করিতেছেন দেখিয়া প্রভুর কৃপার উদয় হইল।

রথ যখন চলিতে লাগিল তখন রথাগ্রে প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে

লাগিলেন। বলগণ্ডি নামক স্থানে যখন রথ থামিল, তখন প্রভু ক্লান্ত হইয়া পার্শ্ববর্তী উপবনে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। মৃদুমন্দ বাতাস বহিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গের ঘর্ম অপনোদন করিতে লাগিল।

প্রেমের আবেশে প্রভু পড়িয়া আছেন। তখন প্রতাপরুদ্র রাজবেশ ছাড়িয়া বৈষ্ণবের বেশে একাকী তপোবনে প্রবেশ করিলেন। প্রভু নয়ন মুদিত করিয়া ভূমিতে শয়নে আছেন। প্রতাপরুদ্র অতি ধীরে সন্তর্পণে শ্রীচরণ সংবাহন করিতে লাগিলেন।

পাদসংবাহন করিতে করিতে রাজা ভাগবতের গোপী-গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। যখন "তব কথামৃতং তপ্তজীবনং" এই শ্লোক পড়িলেন, তখন প্রভু "ভুরিদা-ভুরিদা" বলিয়া প্রেমাবেশে প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি প্রভুর কৃপার প্লাবনে ভাসিয়া গেলেন।

গৌড়ীয় ভক্তসঙ্গে

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ১৪৩১ শকে মাঘ মাসে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পুরীধামে কিছুদিন অবস্থানের পরই দক্ষিণ দেশে যাত্রা করেন। ফিরিয়া আসিতে লাগে প্রায় দুই বৎসর। সুতরাং ১৪৩২ ও ১৪৩৩ শকে পুরীর রথযাত্রা দর্শন করেন নাই। প্রভুর বিরহ কাতর গৌড়দেশী ভক্তগণ প্রতি বৎসরই গোরাচাঁদের বদনচন্দ্র দর্শনের লোভে পুরীধাম আসিতেন। উক্ত দুই বৎসর ভিন্ন আর কোন বৎসরই বাদ যায় নাই এইরূপ মনে হয়। নদীয়ার, শান্তিপুরের, কুলীন-গ্রামের শ্রীখণ্ডের সকল স্থানের ভক্তগণ সংখ্যায় প্রায় দুইশত, সুদীর্ঘ পথ প্রতি বৎসর পদব্রজে আসিতেন। পথের সকল প্রকার দায়িত্ব বহন করিতেন শিবানন্দ সেন।

যে যে পথ দিয়া গৌরসুন্দর গৌড়দেশ হইতে পুরীধামে গিয়াছেন সেইসব পথ ধরিয়া সেই সেই স্থানের মধুময় লীলাকথা স্মরণ করিতে করিতে তাঁহারা আসিতেন। প্রাণ-গৌরের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ যে কত সুগভীর তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহারা শুধু হাতে আসিতেন না। গৌরচন্দ্রের প্রিয় দ্রব্যাদি বহন করিয়া আনিতেন।

দেবী দময়ন্তীর প্রস্তুত "ঝালী" হাঁড়ি ভরিয়া মাথায় বহন করিয়া আনিতেন রাঘব পণ্ডিত। এক বৎসর এক মাস চাউল বহন করিয়া আনিয়াছিলেন নিতাই চাঁদ স্বয়ং। শ্রীধর ঠাকুর থোড, মোচা, পাতা লইয়া

আসিতেন। কি অপরিসীম প্রেমের আবেগে তাঁহারা আসিতেন তাহা অনুধাবন করিতেও আমরা অক্ষম।

যিনি যে দ্রব্য আনিতেন, তাহা সেবক গোবিন্দের হাতে সকলে দিতেন। দিয়া বলিতেন, "ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি"। "অমুক ভক্ত এই দ্রব্য আনিয়াছেন" গোবিন্দ প্রভুকে জানায়। প্রভু বলেন, "ধরি রাখ"। এইরূপে দ্রব্যাদি রাখিতে রাখিতে ঘরের কোণ ভরিয়া যায়।" প্রত্যেকেই গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার দেওয়া দ্রব্য প্রভুকে খাওয়াইছো তো?" গোবিন্দ নানা কথা বলিয়া তাহাদের ফাঁকি দেন।

একদিন গোবিন্দ প্রভুকে বলিলেন—"তোমার জন্য ভক্তেরা এতদ্রব্য আনিয়াছেন, তুমি খাও না। তাঁহারা বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করে। আমি আর কতদিন তাঁহাদের বঞ্চনা করিতে পারি। "কত বঞ্চনা করিব, কিমতে আমার নিস্তার।" প্রভু বলিলেন, "দুঃখ কর কেন; কে কি দিয়াছে আন।" এই কথা বলিয়া প্রভু ভোজন করিতে বসিলেন। গোবিন্দ যে যে দ্রব্য দিয়াছে তার নাম উচ্চারণ করিয়া প্রভুর সম্মুখে ধরেন। প্রভু আনন্দে তাহা গ্রহণ করেন। তার মধ্যে এমন দ্রব্যও আছে-যাহা দুই-তিন মাসের বাসি। বিস্বাদ হইয়াছে। তবু প্রভু পরমানন্দে সব ভোজন করেন। একশত লোকের ভক্ষ্য প্রভু খাইয়া ফেলিলেন।

শতজনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল
আর কিছু আছে বলি গোবিন্দে পুছিল।

গোবিন্দ বলিলেন, "শুধু রাঘবের ঝালি আছে।" প্রভু বলিলেন, "আজ থাক আর একদিন পাব।" রাঘবের ঝালির মধ্যে এমন সব দ্রব্য আছে যাহা বৎসর যাইলেও নষ্ট হইবে না। তাহাতে আছে নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্য দ্রব্য। প্রভুর যোগ্য ভোগ। "বৎসরেক মহাপ্রভু করিবেন উপভোগ।"

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার।" সহস্র প্রকার দ্রব্যের কয়েকটির নাম করিতেছি। আম-কাসুন্দী, আদা-কাসুন্দী, ঝাল-কাসুন্দী, লেবু-আদা, আম্রকোলি, আমসী, আম্রখণ্ড, তৈলাম্র আমতা, কোলিশুটী, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড, শতপ্রকার আচার, শুকুতা পাতা, অমৃত কর্পূর, শালি কাচুটি ধানের আতপ চিড়া, ঘৃতে ভাজা চিড়া, হুড়ুম, ঘৃত ভাজা শালি ধান্যের খৈ, ফুট কলাই চুর্ণ ইত্যাদি। প্রভু সব আদরে গ্রহণ করেন।

ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়
সুক্তা পাতা কাসন্দিতে মহাসুখ পায় ॥

গৌরহরি তাহার গৌড়ীয় ভক্তদের লইয়া কত শত মধুর লীলা করেন। গুণ্ডিচা মার্জ্জন, নেত্রোৎসব দর্শন, পাণ্ডববিজয় দর্শন, স্নানযাত্রা দর্শন, রথাগ্রে নৃত্য-গীত, ইন্দ্রদ্যুম্নে ক্রীড়া, নরেন্দ্র সরোবরে ক্রীড়া প্রভৃতি।

দুই চারিটি মধুর লীলার কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিতেছি। রথ আরোহণ করিয়া জগন্নাথ গুণ্ডিচা মন্দিরে গিয়া নয় দিন থাকেন। বৎসরে এইখানে এই একবার যান। সারা বৎসর ব্যবহার না হওয়ায় ঐ মন্দির ধূলি মলিন হইয়া থাকে। মহাপ্রভু পার্ষদগণসহ ঐ মন্দির ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করেন।

ঐ কার্য্য ভৃত্যজাতীয় লোকের কাজ। কিন্তু প্রভু রথের পূর্ব্বদিন কাশীমিশ্র পড়িছাপত্র ও সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে ডাকিয়া তাহাদের কাছে গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন ভিক্ষা মাগিয়া লইতেন। সেব্যধন সেবামাগে ইহা কত মধুর।

তিনজনার কাছে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন সেবা মাগি নিল ॥

পড়িছাপত্র প্রভুর নিকট শতশত সম্মার্জ্জনী ও শত শত ঘট আনিয়া দেন। প্রভু প্রত্যেক ভক্তের হাতে হাতে উহা বিতরণ করেন। সকলের অঙ্গে নিজ হাতে চন্দন দিয়া গুণ্ডিচা মার্জ্জনে সদলে যাত্রা করেন।

প্রভুর মনের ভাব—কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে আছেন। কাল বৃন্দাবন কুঞ্জে আসিবেন। প্রভু গুণ্ডিচাকে ব্রজকুঞ্জ ভাবেন। রথের সমারোহে সেই স্থানটাকে কুরুক্ষেত্র মনে করেন। ভক্তগণ লইয়া, প্রভু রাধাভাবে কুঞ্জ সাজাইতে বলেন। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ প্রভুর এই ভাব বুঝিতে পারেন। গুণ্ডিচা মন্দিরের ভিতর-বাহির, ছোট-বড় মন্দির, জগমোহন, ভোগমণ্ডপ চত্বর, দেয়াল ভিত্তি, সর্ব্বশেষে সিংহাসন-অপূর্ব্বভাবে প্রভু মার্জ্জন করেন। তখন প্রভুর ধূলিমাখা দেহের এক অপরূপ শোভা হয়। মুখে নাম-হাতে কাজ। ইহা প্রভুর শিক্ষা—

প্রেমোল্লাসে গৃহশোধে লয় কৃষ্ণ নাম।
ভক্তগণ "কৃষ্ণ" কহে, করে নিজ কাম ॥

কেহ বা নিজ-অশ্রুজলে মার্জ্জন করেন। কেহ বা মন্দিরে জল ঢালিতে ঢালিতে ছল করিয়া প্রভুর শ্রীচরণে জল দেন। প্রভুকে আড়াল করিয়া তাহা পান করেন, অন্যকে বিলাইয়া দেন। সে এক অপূর্ব্ব লীলা। কবিরাজ

গোস্বামী বলেন—মন্দির মার্জ্জন ও প্রক্ষালন করিয়া ভক্ত চিত্তের ন্যায় শীতল, উজ্জ্বল ও শ্রীকৃষ্ণের উপবেশনের যোগ্য করেন।

তারপর প্রভু উচ্চ কীর্ত্তন করিতে করিতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে গিয়া জলক্রীড়া করেন। তারপর তীরে উঠিয়া আইটোটা উদ্যানে গিয়া পঞ্চশত লোক লইয়া ভোজন করেন। অন্তরঙ্গগণ লইয়া প্রভু একটু উচু পিণ্ডার উপরে বসেন। সকলে আনন্দধ্বনি করেন। প্রভুর সাথে বসিয়া সার্ব্বভৌম বলেন—

মহাপ্রভু বিনে কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন হয়॥
তার্কিক-শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি।

তারপর নেত্রোৎসব। পক্ষকাল পরে জগন্নাথ দর্শন। লোকের ভিড়। আগে যান কাশীশ্বর "লোক নিবারিয়া" পাছে গোবিন্দ জলকরঙ্গ লইয়া। প্রভুর অগ্রে পুরীভারতী, দুই পার্শ্বে স্বরূপ, অদ্বৈত।

তৃষ্ণার্ত্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমর যুগল।
গাঢাসক্ত্যে পিয়ে কৃষ্ণের বদন কমল॥

রথাগ্রে নর্ত্তনকীর্ত্তনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ। রথাগ্রে গৌড়বাসী-ভক্তগণকে প্রভু চারি সম্প্রদায়ে ভাগ করেন—স্বরূপ, শ্রীবাস, মুকুন্দ ও গোবিন্দ ঘোষ। এই চারিজন চারিদলে মুলগায়ক। প্রত্যেক দলে দুইজন মৃদঙ্গবাদক ও কীর্ত্তনিয়া ছয়জন। চারি সম্প্রদায় জগন্নাথের অগ্রে। দুই পাশ্বে দুই সম্প্রদায়, পশ্চাতে এক সম্প্রদায়। কুলীনগ্রামের দল, শান্তিপুরের আচার্য্যের দল, শ্রীখণ্ডের দল। সাত সম্প্রদায়, চৌদ্দ-মাদল।

প্রত্যেকে দেখেন প্রভু-তার সম্প্রদায়েই নৃত্য করিতেছেন। কখনও একই সময়ে সাতদলে প্রভু নৃত্য করেন।

আর এক শক্তি প্রভু করিলা প্রকাশ।
একবারে সাত ঠাঞি করেন বিলাস॥

জগন্নাথ নিজে আনন্দে কীর্ত্তন শোনেন, রথ থামাইয়া। রথ চলে না। প্রভু রথের পিছনে গিয়া শ্রীমস্তক দিয়া রথ ঠেলিয়া দেন। প্রভু গৌরহরি জগন্নাথ দর্শন করিয়া কাঁদেন। জগন্নাথও প্রভুকে দর্শন করিয়া প্রেমের সাগরে ডুবিয়া যান।

মুহুর্দৃষ্ট্বা তস্যাননশশিনমত্যন্ত মধুরং
গলন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্বতনুমভিষিক্তাময়রচয়ৎ।
জগন্নাথোঽপ্যেনং নিমিষরহিতৈরক্ষিকমলৈ
বিলোক্য প্রেমাব্ধৌ নিরবধি নিমগ্নোঽভবদিব। ১১।৮৬ কবি কর্ণপুর।

গৌরচন্দ্র জগন্নাথদেবের মধুর মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া নয়নজলে নিজ তনু অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। জগন্নাথদেবও যেন গৌরচন্দ্রকে অনিমেষ লোচনে অবলোকন করিয়া প্রেমাম্বুধিতে নিমগ্ন হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন চলিয়াছেন এই ভাবনায় শ্রীরাধাভাবে গৌরহরি স্বরূপকে গান গাইতে আদেশ করেন। স্বরূপও ললিতা সখীর ভাবাবিষ্ট হইয়া গান করেন—

সোই সোইত পরাণনাথ পাইলুঁ
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেলুঁ।

রথস্থ শ্যামসুন্দর ও পথস্থ গৌরসুন্দরে অপূর্ব্ব ঠেলাঠেলি চলিতে থাকে—

গৌর যদি আগে না যায় শ্যাম হয় স্থির
গৌর আগে যায় শ্যাম চলে ধীরে ধীরে
এইমত গৌর শ্যাম করে ঠেলাঠেলি
সরথ শ্যামেরে রথে গৌর মহাবলী।

গৌড়ীয় ভক্তগণ সঙ্গে এই সকল মধুর লীলা গৌরসুন্দর প্রতিবৎসর করিয়া থাকেন। মর্ম্মী ভক্তগণ বলেন-অদ্যাপি করেন।

সচল জগন্নাথ

নীলাচলে গৌরসুন্দর কীর্ত্তনানন্দে বিহার করিতেছেন। দিনরাত নৃত্যগীতে ও আনন্দের আবেশ। সকলেই প্রভুকে দেখিয়া বলেন-এই'ত সচল জগন্নাথ। যখন তিনি যে পথ দিয়া চলিয়া যান চারিদিকের লোক উচ্চৈঃস্বরে 'হরি বোল' 'হরি বোল' বলে। হাটিলে যেখানে প্রভুর চরণ যুগল পড়ে, সেখানের ধূলি লোক লুট করিয়া লইয়া যায়।

প্রভুর নয়নে সদা আনন্দের ধারা, বদনে হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, নাম উচ্চারণ, গতি মত্ত সিংহের মত, কণ্ঠ হইতে দোদুল্যমান মালায় বিশাল বক্ষ আবৃত। রূপ দেখিয়াই পুরুষ নারী চরণে আত্মসমর্পণ করে।

চন্দ্রাবতী রাত্রিতে যখন দক্ষিণা বাতাস বহিত তখন প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে

আসিয়া সমুদ্র উপকূলে বসিতেন। চন্দ্রের জ্যোৎনায় সমুদ্র তরঙ্গের শোভা দেখিয়া প্রভু হাস্যময় দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতেন। কোনও কোনও দিন সারারাত্রি সমুদ্রতীরে অতিবাহিত করিতেন। মাঝে মাঝে কীর্ত্তন চলিত।

প্রভু কীর্ত্তন হইলেই তাণ্ডব নৃত্য করিতেন। রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, গর্জ্জন—অষ্টসাত্ত্বিক ভাব সর্ব্বদা শ্রীঅঙ্গে খেলা করিত। প্রাণপ্রিয় গদাধর সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। প্রভুর সম্মুখে বসিয়া গদাধর ভাগবৎ পাঠ করিতেন। শুনিতে শুনিতে প্রভু প্রেমরসে মহামত্ত হইতেন।

যেভাগ্য দ্বাপরে যমুনা নদী পাইয়াছে, যেভাগ্য ভাগীরথী পাইয়াছে, আজ নীল সিন্ধু সেই মহা সৌভাগ্য লাভ কবিল। তাঁহার তীবে নারে গৌরচন্দ্র বিহার করিতে লাগিলেন।

কূপে গঙ্গার বিজয়

নীলাচলে পরমানন্দ পুরী গোসাঞিঁর মঠ। মঠে সম্প্রতি তিনি জলের জন্য একটি কূপ খনন করিয়াছেন। কূপে জল উঠিয়াছে, অখাদ্য, অপেয়। হঠাৎ প্রভু গোসাঞিঁর মঠে আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কূপের জল কেমন হইল?" প্রভু গোসাঞিঁ বলিলেন, "ঘোলা কাদার মত;" প্রভু তখন কূপের নিকট আসিয়া দুই হাত তুলিয়া বলিলেন—"মহাপ্রভু জগন্নাথ আমায় এই বর দাও, যেন গোসাঞিঁর কূপে গঙ্গা প্রবেশ করে। পাতালে যে ভোগবতী গঙ্গা আছে তাহাকে আদেশ কর—এই কূপে প্রবেশ করিতে।"

এই কথা বলিয়া প্রভু বাসায় চলিয়া গেলেন। পরদিন সকালবেলা

প্রভাতে উঠিয়া সবে দেখেন অদ্ভুত।
পরম নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ কূপ॥

অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া পুরী গোসাঞিঁর আনন্দ ধরে না। তিনি আনন্দের আতিশয্যে অচেতন হইয়া পড়িলেন। কূপ প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্তগণ বলিতে লাগিলেন—"কূপে স্বয়ং গঙ্গাদেবী বিজয় করিয়াছেন।" প্রভু নিজে আসিয়া দর্শন করিলেন। বাহু তুলিয়া বলিলেন—

এই কূপের জলে স্নান বা ভক্ষণ করিলে তার গঙ্গাস্নানের ফল হইবে।

"সত্য সত্য হবে তার গঙ্গাস্নান ফল।
কৃষ্ণে ভক্তি হবে তার পরম নির্ম্মল।"

জগন্নাথ দর্শন

শ্রীগৌর সুন্দর নিত্য জগন্নাথ দর্শন করেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপলক নেত্রে তাকাইয়া থাকেন। দুই নয়নে অবিরল ধারা বহিতে থাকে। বক্ষ বাহিয়া বহির্বাস ভিজে। মাটিতে পড়িয়া জল গড়াইতে থাকে।

গরুড় স্তম্ভের পাশে আছে এক নিম্ন খাল
সেই খাল পূর্ণ হইল নয়নের জলে॥

এত অশ্রুধারা কেহ কোন দিন দেখা দূরের কথা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। গরুড় স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখেন। গরুড় ভক্তরাজ। তার আনুগত্যে দেখেন—ভক্তকে পিছনে ফেলিয়া দেখেন না। ভক্ত মর্যাদা রক্ষা করিয়া দেখেন। গরুড় স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইলে আর একটি ব্যাপার হয়। সিংহাসনে যে জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা আছেন—এই তিনজনকে দেখা যায় না। শুধু জগন্নাথের বদনখানিই দেখা যায়। প্রভু গৌরহরি তাহাই দেখিতে চান।

প্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া জগন্নাথরূপী মদনমোহনকে দর্শন করেন। আশে পাশে অন্য কেহ থাকিলে মহাভাবময়ীর ভাবে ক্ষুন্নতা আসে। প্রভুর ভাব তিনি রাধা—শ্রীবৃন্দাবনে শ্যামকে দেখিতেছেন। সুভদ্রা পার্শ্বে থাকিলে সে ভাব থাকে না। সুভদ্রা ব্রজের জন নহেন—তার সঙ্গে সম্বন্ধ দ্বারকা কুরুক্ষেত্রে। সুভদ্রা মাঝে মাঝে চক্ষে পড়ে—তখন মনে করেন কুরু-ক্ষেত্রে আছি—অন্তরে সাধ জাগে এ স্থান ছাড়িয়া ব্রজে যাবেন। রথযাত্রার সময় এই ভাব প্রবল হয়। গুণ্ডিচা যেন বৃন্দাবন—তাড়াতাড়ি সেখানে রথ টানিয়া নিতে চাহেন।

স্ব-মাধুর্য্য অর্থাৎ কৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে গৌরের আবির্ভাব। সেই আস্বাদন লালসা পূর্ণভাবেই মিটাইতেন জগন্নাথের বদন দেখিয়া। এইজন্যই নীলাচলে আসা।

ব্রজযাত্রা ও অর্দ্ধপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

লীলারঙ্গী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীবৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা করিলেন। বলিলেন, "গৌড়দেশ হইয়া যাইব। জাহ্নবী ও জননী দর্শন করিয়া যাইব।" সন্ন্যাস গ্রহণের পর পঞ্চম বর্ষে বিজয়া দশমী দিনে ব্রজযাত্রা করিলেন। সঙ্গে চলিলেন পুরীগোঁসাই, স্বরূপ-দামোদর, রামানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথ ও আরো অনেকে। প্রভু চিত্রোৎপলা নদীতে

স্নান করিলেন। সেখান হইতে কেহ কেহ বিদায় নিলেন। যাজপুর হইতে অনেকে বিদায় নিলেন। রামানন্দ রায় ভদ্রক পর্যন্ত আসিয়াছিলেন।

প্রভুর সঙ্গে গদাধর পণ্ডিত চলিয়াছেন। ক্ষেত্র সন্ন্যাস ও গোপীনাথের সেবা ত্যাগ করিয়া গদাধর যান, ইহা প্রভুর ইচ্ছা নয়। গদাধর অতি সহজভাবে বলিলেন "ক্ষেত্র সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল" কোটি গোপীনাথ সেবা ত্বৎপদদর্শন।" প্রভু বলিলেন, "তুটি ধর্ম ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে গেলে সে ধর্মত্যাগজনিত পাপ আমাতে বর্তিবে।" গদাধর বলিলেন, "তোমার সঙ্গে যাইব না।" আমি শচিমাকে দেখিতে গৌড় দেশে যাব।" প্রভু নীরব রহিলেন। কটক পর্য্যন্ত গিয়া প্রভু কঠোর ভাবে গদাধরকে পুরীতে ফিরাইয়া দিলেন।

ঐ সময় পথঘাট রাজনৈতিক বিপদ সঙ্কুল ছিল। একজন বিশিষ্ট মুসলমানের সহায়তায় প্রভু পিছলদা হইতে নৌকা করিয়া মন্ত্রেশ্বর নদী পার হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়া, গঙ্গার মোহনা ধরিয়া পানিহাটীতে পৌছাইয়া গেলেন।

পানিহাটী রাঘব পণ্ডিতের গৃহে একদিন থাকিলেন। কুমারহট্টে শ্রীনিবাসের গৃহে উঠিলেন। শিবানন্দ, বাসুদেব, মাধব দাস প্রমুখ ভক্তগৃহে একত্র কয়েকদিন রহিলেন।

গৌড়দেশে বাচস্পতিগৃহে

তারপর প্রভু—বিদ্যাবাচস্পতি পণ্ডিতের গৃহে আসিলেন। বাচস্পতি পণ্ডিত সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা। প্রভু আচম্বিতে আসিয়া তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। বাচস্পতি সগোষ্ঠী চরণে দণ্ডবৎ করিলেন। প্রভু বলিলেন—আমি মথুরা যাইব। কয়েকদিন গঙ্গাস্নান করিবার ইচ্ছা। কয়েকদিন তোমার গৃহে গোপনে থাকিয়া গঙ্গাস্নান করিব। আমার আগমন তুমি গোপনে রাখিবা।

সূর্য্যের উদয় কে গোপন করিবে! চারিদিকে রটিয়া গেল—

বাচস্পতি গৃহে আইলা সন্ন্যাসী চূড়ামণি
নবদ্বীপ আদি সর্ব্ব দ্বীপে হইল ধ্বনি।

লক্ষ লক্ষ লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল। খেয়াখাটে এক অদ্ভুত দৃশ্য হইল। সহস্র সহস্র লোক এক নৌকায় চড়িল। মধ্য গঙ্গায় নৌকা গঙ্গায় পড়িয়া গেল। যাহারা খেয়া না পাইল তাহারা সাঁতরাইয়া গঙ্গাপার হইল।

কেহ কেহ কলাগাছের ভেলা তৈরী করিয়া তাহাতে পার হইল। কেহ কেহ কলাগাছ ধরিয়া সাঁতরাইল। কেহ বা ঘট বুকের নীচে দিয়া সাঁতরাইয়া গঙ্গা পাড়ি দিল।

লক্ষ লক্ষ লোক বাচস্পতি গৃহে আসিয়া তাহাকে বলিল আমাদের প্রভুকে দর্শন করাও। লক্ষ লক্ষ লোকের মুখে হরি ধ্বনি শুনিয়া প্রভু গৌরসুন্দর নিজেই আনন্দে বাহির হইয়া আসিলেন। বিরাট জনতার প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"কৃষ্ণে মতি হৌক।

বোলকৃষ্ণ ভজকৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ নাম
কৃষ্ণ হউক সবাকার জীবন ধন প্রাণ।"

কুলিয়া পলায়ন

প্রভুর দর্শনার্থী লোকের সংকট ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, কেবলই নূতন লোক আসে। যাহারা আসে তাহারা আর ফিরিয়া যায় না। বাচস্পতি গৃহ প্রাঙ্গন ভরিয়া বিরাট জনতা। হঠাৎ প্রভু কাহাকেও কিছু না বলিয়া কুলিয়া চলিয়া গেলেন।

নানা রঙ্গ জানে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর
লুকাইয়া গেলা প্রভু কুলিয়া নগর।

বাচস্পতি নিজেও জানিলেন না, গভীর রাত্রিতে প্রভু কোথায় গিয়াছেন। তিনি জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন "প্রভু আমার গৃহে নাই। কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছেন।" জনতা তাঁহার বাক্য বিশ্বাস করিল না। প্রথমে অনুরোধ, উপরোধ—তারপর কঠোর গালাগালি করিতে লাগিল।

কেহ বোলে বিপ্রকিছু কপটহৃদয়।
পর উপকারে তত নহেন সদয়॥

একে প্রভুর বিরহে বাচস্পতি কাতর তদুপরি জনতার তীব্র ভৎসনা। তিনি দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তখন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া বাচস্পতির কানে কানে কহিলেন—প্রভু কুলিয়া নগরে চলিয়া গিয়াছেন। তখন বাচস্পতি জনতার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন আপনারা আমাকে অকারণ গালাগালি করিতেছেন। প্রভু কুলিয়া নগরে চলিয়া গিয়াছেন। অল্পক্ষণ মধ্যে কুলিয়ার কি অবস্থা হইল—

ক্ষনেকে কুলিয়া গ্রাম নগর প্রান্তর।
পরিপূর্ণ হইল স্থান নাহি অবসর।
অনন্ত অর্বুদ লোক লয় হরিধ্বনি
বহির না হয় গুপ্তে আসে ন্যাসিমণি—

বাচস্পতি একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে জনসমুদ্রের মধ্যে। এমন সময় করুনাময় তাহাকে ডাকিয়া নিজ নিকটে আনাইলেন। বাচস্পতি আসিয়া দণ্ডবৎ শ্রীচরণে পতিত হইলেন। তারপর কাতর কণ্ঠে কহিলেন—প্রভু তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, ইচ্ছাময়ী আপনি ইচ্ছাতে বিচরণ কর। সর্ব্বকার্য্যে তোমার আপন ইচ্ছায়। বিরাট জনতা আমাকে গালাগালি করে—বলে আমি তোমাকে ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছি। তুমি তিলার্দ্ধের জন্য বাহির হও।

তুমি প্রভু তিলার্দ্ধেক বাহির হইলে।
তবে মোরে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া লোকে বলে॥

তার প্রর্থনা শুনামাত্র গৌরাঙ্গ সুন্দর বাহিরে আসিলেন। দর্শনে সকল লোক আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিল।

কুলিয়াগ্রামেতে চৈতন্যের পরকাশ
ইহার শ্রবনে চিন্তে সর্ব্ব কার্য্য পাশ॥

কুলিয়ার পণ্ডিত দেবানন্দ প্রভুর শ্রীচরণ সান্নিধ্যে উপনীত হন। প্রভু তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করেন।

পূর্ব্বে তান যতকিছু ছিল অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ॥

কুলিয়ার বাচস্পতি গৃহে কয়েকদিন রহিলেন। চারিদিকের লোকের জানাজানি হইয়া গেল। অগনিত জনসমাগমে কুলিয়ায় প্রভুর থাকা দায় হইল। প্রভু লোকভয়ে লুকাইয়া অতি কষ্টে রামকেলী পৌছাইলেন। রামকেলী হইতে কানাইনাটশালা পর্যন্ত গিয়া অনেক স্থানে নৃত্য গীতাদি করিয়া নীলাচল যাব বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কেন ফিরিলেন এই সম্বন্ধে দুইটি প্রাণস্পর্শী কাহিনী যুক্ত। প্রভু যখন আনন্দে নৃত্যগীত করিতে করিতে রামকেলির দিকে অগ্রসর হইতেছেন তখন একজন গুপ্তচর নবাব হোসেন শাহকে খবর দিয়াছেন বহুলোক সহ একজন বিরাট পুরুষ রাজধানীর অভিমুখে আসিতেছেন, শুনিয়া হোসেন শাহ রাজপ্রসাদের উপরে উঠিয়া দর্শন করিলেন। নামিয়া আসিয়া নগররক্ষক কেশব ছত্রির কাছে জানিতে চাহিলেন, ঘটনাটি

কি? ছত্রী মহাশয় বলিলেন, একটা গাছতলায় ফকীর হৈ চৈ করিয়া বেড়ায়, চেলা চামুণ্ডা সঙ্গে অনেক জুটিয়াছে। আপনার কাছে তুলিবার মত ঘটনা নহে। আপমার কি মনে হয়?' নবাব বলিলেন—

"যিনি দানে লক্ষলোক যার পিছে ধায়
সেই তো গোসাঁই ইথে নাহিক সংশয়।

এই গোসাঁই রাজধানীর মধ্য দিয়া চলিয়া যাইবেন, কোথাও কোন অশান্তি না হয় এই মর্ম্মে ঢোল সহরৎ ও পরোয়ানা দিয়া দেন।" ছত্রী মহাশয় তাহা করিলেন কিন্তু গোপনে প্রভুর কাছে খবর দিলেন রাজধানীর দিকে না যাওয়াই যুক্তিযুক্ত।

প্রভু রামকেলি আছেন। রাত্রিকালে দবীরখাস ও সাকর মল্লিক আসিয়া —শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীচরনে পতিত হইলেন। তাহাদের সমর্পিত জীবনকে প্রভু আত্মসাৎ করিয়া সনাতন ও রূপ নব নামকরণ করিলেন। এই দুইজন হোসেন শাহর মন্ত্রী। সনাতন বলিলেন "প্রভু গৌড়রাজ তোমাকে ভক্তি করেন। তথাপি এত লোকজন লইয়া রাজ্যমধ্যে প্রবেশ না করাই ভাল।" আর এক কথা, বৃন্দাবনে চলিয়াছেন।

যার সঙ্গে চলিয়াছে লোক লক্ষকোটি
বৃন্দাবনে যাবার এতো নহে পরিপাটী।

পরদিন সকালে প্রভু রামকেলি ছাড়িয়া কানাইনাটশালা গেলে সেখানে কিছুক্ষণ নৃত্যগীতাদি করিলেন। হঠাৎ বলিলেন "নীলাচল ফিরিয়া যাইব। বৃন্দাবন যখন যাব একাকী যাব না, সঙ্গে একজন মাত্র লইব। এই বলিয়া প্রভু ফিরিলেন। ফিরিবার পথে সাতদিন শান্তিপুরে ছিলেন। জাহ্নবী ও জননী দর্শন করিয়া ছিলেন। নীলাচল ফিরিয়া প্রভু বলিলেন, "গদাধরকে ব্যথা দিয়া গিয়াছি এইজন্য যাওয়া হইল না।"

আর একটি অলৌকিক কাহিনী নৃসিংহানন্দ নামক একজন পরম ভক্ত শুনিলেন প্রভু পদব্রজে নীলাচল যাবেন। প্রভুর পথকষ্ট ভাবিয়া তিনি অতীব বেদনার্ত্ত হইয়া মানসে রাস্তা তৈরী করিতে থাকেন। খুব সুন্দর মনের মত পথঘাট করেন। রাস্তার পার্শ্বে সরোবর করেন, ছায়াতরু রোপন করেন। কানাই নাটশালা পর্যন্ত মানসে পথ রচনা করিয়া তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ধ্যানে মন বসিল না। তিনি ভবিষ্যদুক্তি করিলেন প্রভু

বৃন্দাবন যাইতে পারিবেন না। কানাই নাটশালা হইতে ফিরিয়া আসিবেন। ঠিক তাহাই ঘটিল।

অচ্যুত-তাত অদ্বৈত গৃহে গৌরহরি

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কানাইনাটশালা হইতে ফিরিলেন। নীলাচল যাব বলিয়া ফিরিলেন কিন্তু গঙ্গাতীর ধরিয়া চলিতে চলিতে শান্তিপুর অদ্বৈত মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। প্রভু পৌঁছিবার অল্পদিন পূর্বে একটা ঘটনা ঘটিয়াছে অদ্বৈত গৃহে।

একজন সন্ন্যাসী একদিন অদ্বৈতাচার্য্য কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন কেশব-ভারতী চৈতন্যদেবের কি হয়? আচার্য্য কহিলেন "কেশব ভারতী চৈতন্যের গুরু" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ সেখানে উপস্থিত হইয়া পিতাকে বলিলেন-বাবা একী কথা বলিলেন! চৈতন্যদেবের গুরু একথা আপনি কি করিয়া জিহ্বায় উচ্চারণ করিলেন!

যাহা হৈতে হয় আদি জ্ঞানের প্রচার।
তান গুরু কিমতে বোলহ আছে আর॥

এই কথা পুত্র মুখে শুনিয়া আচার্য্য পুত্রকে বক্ষে ধরিয়া কহিলেন—

তুমি সে জনক বাপ মুই সে তনয়
শিখাইতে পুত্ররূপে হইলা উদয়॥

তখন অচ্যুতানন্দের বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। সন্ন্যাসীও "যোগ্য যোগ্য মহাযোগ্য অদ্বৈত নন্দন" বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন।

আচার্য্য বসিয়া পুত্রের কথা ভাবিতেছেন—মনে করিতেছেন "চৈতন্যের পার্ষদ জন্মিলা মোর ঘরে"—ঠিক সেই সময় সপার্ষদ গৌরাঙ্গসুন্দর উপস্থিত হইলেন। অচ্যুতকে কোলে লইয়া গৌরহরি প্রেমজলে তার সর্বাঙ্গ ভিজাইয়া দিলেন।

শচীর রন্ধন—শাকের মহিমা

সীতানাথ শচীদেবীকে সংবাদ দিলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত জননীকে লইয়া শান্তিপুর আসিলেন, জননীকে দর্শন করিয়া গৌরচন্দ্র দণ্ডবৎ করিয়া বলিলেন—

তুমি যদি শুভ দৃষ্টি কর জীব প্রতি
তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণ রতি মতি॥

শ্রীগৌরবদন দেখিয়া শচী তাই পরমানন্দে জড় হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর স্থির হইয়া মা চলিলেন রন্ধন কার্যে। মা জানেন নিমাই শাক খুব ভালবাসে। তাই বিংশতি প্রকার শাক রান্না করিলেন। অন্যান্য বহু দ্রব্য ত আছেই। ভোজন করিতে বসিয়া প্রভু মধুর হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন—

প্রভু বলে এই যে অচ্যুত নামে শাক।
ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ ॥
পটোল বাস্তুক কাল শাকের ভোজনে
জন্মে জন্মে বিহরয় বৈষ্ণবের সনে
সালিঞ্চ হিলঞ্চা শাক ভক্ষণ করিলে
আরোগ্য থাকয়ে তার কৃষ্ণভক্তি মিলে।

এই মত শাকের মহিমা বলিতে বলিতে প্রভু পরমানন্দে ভোজন করিলেন।

মুরারির অষ্ট শ্লোক

বিশ্রামান্তে প্রভু গৌরসুন্দর মুরারি গুপ্তকে বলিলেন, তুমি শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা বর্ণনা করিয়াছ একটি অষ্টকে। তাহা শুনাও। মুরারি পড়িতে লাগিলেন।

অগ্রে ধনুর্দ্ধরবরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গো,
জ্যেষ্ঠানুসেবনরতো বরভূষনাঢ্যঃ
শেষাখ্যধামবরলক্ষ্মণনাম যষ্য
রামং জগত্রয়গুরং সততং ভজামি ॥

শ্লোক শুনিয়া প্রভু ব্যাখ্যা করিতে আদেশ করিলেন মুরারি বলিতে লাগিলেন—

দুর্ব্বাদলশ্যামল কোদণ্ড দীক্ষাগুরু।
ভক্তগণ প্রতি বাঞ্ছাতীত কল্পতরু ॥
হাস্যমুখে রত্নময় রাজসিংহাসনে।
বসিয়া আছেন শ্রীজানকীদেবী বামে ॥
অগ্রে মহাধনুর্দ্ধর অনুজ লক্ষ্মণ।
কনকের প্রায় জ্যোতি কনক ভূষণ ॥
সর্ব্ব মহাগুরু হেন শ্রীরঘুনন্দন।
জন্ম জন্ম ভজোঁ মুঞি তাঁহার চরণ ॥

এই ভাবে মুরারি আটটি শ্লোক পাঠ ও তাহার মধুময় ব্যাখ্যা করিলেন। তখন

পরম তুষ্ট হইয়া শ্রীগৌরহরি মুরারির মস্তকে শ্রীপাদ পদ্ম দিলেন। দিয়া বলিলেন—

শুন গুপ্ত এই তুমি আমার প্রসাদে।
জন্ম জন্ম রামদাস হও নির্ব্বিরোধে॥

কুষ্ঠ রোগীর প্রতি কৃপা

একজন কুষ্ঠ রোগী আসিলেন প্রভুর সম্মুখে। দণ্ডবৎ পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। কুষ্ঠ রোগের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি। প্রভু রক্ষাকর।

প্রভু বললেন, "তুমি বৈষ্ণবনিন্দক এইজন্য তোমার এই শাস্তি।" রোগী বলিল, "প্রভু সত্যসত্যই বৈষ্ণব নিন্দা করিয়াছি তখন আমার উপায় কি বলুন।"

প্রভু বলিলেন, "আমি কিছু করিতে পারিব না। তোমার অপরাধ শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে।"

তাঁব ঠাই তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিস্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ॥

রোগী তখন ছুটিয়া গেলেন শ্রীবাসপণ্ডিতের কাছে। তার পাদপদ্ম ধরিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

মুক্ত হৈল খণ্ডিল সকল অপরাধ।

মাধবেন্দ্র পুরীর তিথি আরাধনা

অদ্বৈতাচার্য্যের গুরু মাধবেন্দ্রপুরী। তার আরাধনা তিথি উপস্থিত হইল। আচার্য্যের আনন্দ আর ধরে না। প্রভুর সন্নিধানে এই উৎসব আর কখনও উদ্‌যাপনের ভাগ্য পান নাই। মাধবেন্দ্রপুরী গৌরসুন্দরের পরম গুরু। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদিমূল শ্রীমাধবেন্দ্র। তাহার আরাধনা তিথিতে আচার্য্য যে সমারোহ করিলেন তাহা দর্শন করিয়া স্বয়ং প্রভুও বিস্ময়ানিত হইলেন।

অতি অমানুষী দেখি উৎসব সম্ভার।
চিত্তে যেন প্রভু হইলেন চমৎকার॥

প্রভু বলিলেন, আচার্য্য শিবের অবতার। নতুবা এত সম্পদ কোথায় পাইলেন। এ সম্পত্তি সকলে সম্ভবে মহাদেবে। "মাধবেন্দ্র আরাধনাতিথিতে আইর রন্ধন।" মহাপ্রভু সানন্দে ভোজন করিতে বসিলেন—

প্রভু বোলে মাধবেন্দ্র আরাধনা তিথি।
ভক্তি হয় গোবিন্দে ভোজন কৈলে ইথি ॥

আহারান্তে প্রভু সকল বৈষ্ণবগণকে জনে জনে শ্রীহস্তে মালা চন্দন দিলেন। শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়া বৈষ্ণবগণ উচ্চৈস্বরে হরিধ্বনি দিলেন।

অদ্বৈতের যে আনন্দ অন্ত নাহি তার।
আপনে বৈকুণ্ঠপুর নাথ গৃহে যার ॥

কুমার হট্টে—শ্রীবাস মন্দিরে

অদ্বৈত ভবন হইতে প্রভু আসিলেন কুমারহট্টে শ্রীবাস মন্দিরে। শ্রীবাস ছিলেন কৃষ্ণধ্যানানন্দে। আচম্বিতে সম্মুখে পাইলেন ধ্যানের ধন। সংবাদ পাইয়া সব ভক্তগণ আসিলেন। আচার্য্য পুরন্দর, শিবানন্দ সেন, বাসুদেব দত্ত আরো কতজন আসিলেন, বাসুদেব প্রভুর শ্রীচরণ ধরিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

আপনে শ্রীগৌর চন্দ্র বলে বার বার।
এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার।

এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ প্রেমানন্দে জয়ধ্বনি দিলেন।

একদিন প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীবাসকে বলিলেন, শ্রীবাস তুমি তো কোথাও যাওনা। কেমন করিয়া সংসার চালাও। তোমার পরিবারও ছোট নয়। সকলে নির্ব্বহ কি করিযা হয়। শ্রীবাস বলিলেন যার অদৃষ্টে যা থাকে তাহাই হবে। প্রভু বলিলেন—তাহইলে তুমি সন্ন্যাসী হও।

শ্রীবাস বলিলেন—তাও পারিবনা। প্রভু কহিলেন সন্নাসীও হইবা না। ভিক্ষা করিতেও কারো দুয়ারে যাইবা না। পরিবারের পোষন কি করিয়া করিবা কিছুই বুঝিতে পারি না। তখন পণ্ডিত শ্রীবাস হাতে তিনটা তালি দিয়া বলিলেন "এক দুই তিন এই কলিলুঁ ভানিয়া।"

প্রভু জানতে চাইলেন—এক দুই তিনের অর্থ কি? শ্রীবাস কহিলেন—একদিন দুইদিন তিনদিন উপবাস দিব তারপর গিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।

শ্রীবাসের এই উক্তি শুনিয়া গৌরসুন্দর হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন—কি বলিলি—তোর অন্নের দুঃখে উপাস হবে!

যদি কদাচিৎ বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে
তথাপিহ দারিদ্র নহিব তোর ঘরে ॥

যে যে জনে চিন্তে মোরে অনন্য হইয়া।
তার ভক্ষ্য দেই মুঞি মাথায় বহিয়া ॥

প্রভুর বাণী শুনিয়া সকল ভক্তগণ আনন্দ ধ্বনি করিলেন। শ্রীবাস মন্দিরে কিছুদিন বাস করিয়া প্রভু পানিহাটী রাঘব পণ্ডিতের মন্দিরে গমন করিলেন।

রাঘব ভবনে

করুণাময় গৌর সুন্দর রাঘব ভবনে আসিয়া উপস্থিত। অপ্রত্যাশিত-ভাবে আরাধ্যজনকে পাইয়া রাঘবেব চিতে অপরিসীম আনন্দের উদয় হইল। সংবাদ পাইয়া গদাধর দাস, পরমেশ্বর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, রঘুনাথ বৈদ্য সকল প্রিয়জনেরা ছুটিয়া আসিলেন। যে আনন্দের উদয় হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না।

একদিন প্রভু রাঘবকে নিভৃতে ডাকিয়া নিতাইচাঁদের তত্ত্বটি নিজ শ্রীমুখে প্রকাশ করিলেন।

"রাঘব তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই
আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই ॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েণ আমারে।
সে-ই করি এই আমি বলিল তোমারে ॥"

বরাহনগরে ভাগবতাচার্য্য

রাঘব ভবন হইতে গৌরচন্দ্র আসিলেন বরাহনগরে। মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণ গৃহে অবস্থান করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ ভাগবতের পণ্ডিত। প্রভু গৃহে পাইয়া তাঁহাকে ভাগবত শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহার ভক্তিরসময় পাঠ শুনিয়া প্রভু আনন্দে আবিষ্ট হইলেন। "বোলবোল" বলিয়া প্রভু আরও শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পণ্ডিতও উল্লাসে পাঠ করিতে লাগিলেন।

প্রভু বাহ্যজ্ঞান পাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তির মহিমাত্মক শ্লোক শুনিয়া গৌরহরি পুনঃপুনঃ আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিলেন। এই প্রকার রাত্রি তিনপ্রহর পর্য্যন্ত চলিল। বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রভু বলিলেন, এমত ভাগবত ব্যাখা আমি কাহারো মুখে শুনি নাই।

এতেক তোমার নাম ভাগবতাচর্য্য।
ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য ॥

এই প্রকার গঙ্গা তীর তীরে ভক্ত গৃহে গৃহে বিহার করিয়া গৌরাঙ্গ সুন্দর নীলাচলে চলিয়া আসিলেন।

বনপথে ব্রজগমন

বৃন্দাবন যাইবার জন্য প্রভুর অন্তরে প্রবল উৎকণ্ঠা। সংকল্প করিলেন এবার ব্রজে একাই যাবেন। ভক্তগনের একান্ত অনুরোধে বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে সংগে লইলেন। তিনি জলপাত্র ও বর্হিবাস বহিবেন ও ভিক্ষা করিয়া সেবার ব্যবস্থা করিবেন। প্রভুর ভয় একবার ব্রজের পথে চলিলে নিতাইচাঁদ চতুরতা করিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। তাই শেষ রাত্রে কাহাকেও না জানাইয়া প্রভু বলভদ্রসহ ব্রজযাত্রা করিলেন। পথ ছাড়িয়া উপপথে চলিলেন, কটক ডাহিনে রাখিয়া বনে প্রবেশ করিলেন।

নির্জ্জন বনে রঙ্গিয়া গৌরাঙ্গহরি চলিয়াছেন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' গাহিতে গাহিতে। হাতী, বাঘ, পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। একটি দু'টি নয়, পালে পালে বাঘ, পালে পালে শূকর, গণ্ডার—তাদের মধ্য দিয়া মহা আবেশে প্রভু চলিতেছেন। এমনি প্রভুর প্রতাপ সকলে পাশ কাটিয়া পথ ছাড়িয়া দিতেছে। ইহার দ্রষ্টা একজন বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।

একটা বাঘ শুইয়া আছে। প্রভু গৌরসুন্দরের শ্রীচরণ লাগিল বাঘের গায়ে। প্রভু বলিয়া উঠিলেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ। তৎক্ষনাৎ বাঘ উঠিয়া কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে লাগিল। সর্ব্বজীব নাথ প্রভু আমার নদীতে স্নান করিতেছেন। একদল মত্ত হাতী সেখানে জলপান করিতে আসিল। 'কৃষ্ণ কহ' বলিয়া প্রভু জল ছিটাইয়া দিলেন। সেই জলবিন্দুর এক কণাও যার গায়ে লাগিল সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে লাগিল। কেহ ভূমিতে পড়িয়া গেল কেহ চীৎকার করিল।

উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু চলিয়াছেন। তাহা ময়ূরের কণ্ঠ ধ্বনি মনে করিয়া মৃগীগণ ছুটিয়া আসিতেছে। তখন পাঁচ সাতটা বাঘ আসিল। বাঘ আর হরিণ গায়ে গায়ে প্রভুর সঙ্গে চলিতেছেন।

শচীদুলালের শ্রীমুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মধুর উচ্চারণ শুনিয়া বাঘ আর হাতী নাচিতে লাগিল কাঁদিতে লাগিল একত্র হইয়া। স্বভাব বৈরতা ভুলিয়া গেল। ময়ূরগুলি প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে নাচিতে চলিতেছে। মোহনিয়া গৌরসুন্দর হরিবোল হরিবোল বলিয়া উচ্চ ধ্বনি দিয়াছেন তখন

ধ্বনির মাধুর্য্যে বৃক্ষ লতাগুলি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। ঝারিখণ্ডের স্থাবর জঙ্গম সকলেই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গেল। এই যে অপরূপ দৃশ্য ইহা স্বর্গীয় দৃশ্য, গোলকের দৃষ্ট যাহাই বলা যায় কোনটাতেই বলা হবে না—কারণ কোন স্বর্গে বা গোলকে বৈকুণ্ঠে এই দৃশ্য নাই। একমাত্র ঝাড়িখণ্ডের পথেই এই অপরূপ দৃশ্য একদিন প্রকট হইয়াছিল। সেদিন রাধাভাব মণ্ডিত তনু ব্রজবন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ঝাড়িখণ্ডের বনপথ দিয়া ব্রজের পথে নাচিয়া চলিয়াছেন। সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া চলিতেছে। এই দৃশ্য যে দেখিল সেই ধন্য হইল। তাহাদের চরণরেণুর স্পর্শে ধরণীর ধূলা ধন্য হইল।

প্রভু নির্ঝরের উষ্ণ জলে তিনবার স্নান করেন। ভট্টাচার্য্যের পাককরা অন্ন আহার করেন, ফল মূল শাক-পাতা। সন্ধ্যায় আগুনের তাপে শ্রীদেহ উষ্ণ করেন। শুষ্ক কাঠের অভাব নাই। মাঝে মাঝে বলেন "অহো বনপথে ব্রজ যাওয়ার কি অপরিসীম আনন্দ—দুঃখের লেশমাত্র নাই।" বলেন, "সনাতনের মুখে কৃষ্ণ আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন—তাই এই বনপথে এত আনন্দে চলা।"

কখনও বলভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলেন—তোমার প্রসাদে এত আনন্দ পাইলাম. বলভদ্র দৈন্যে জড়সড় হইয়া বলেন—"প্রভু আপনি এ অধম কাককে গরুড় করিযাছেন। মোর হাতে ভিক্ষা নিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন প্রভু—আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর আপনি স্বয়ং ভগবান।"

কাশীধাম—প্রয়াগধাম—মথুপুরী

এইভাবে বনপথে চলিতে চলিতে প্রভু কাশীধামে পৌছিলেন। মনি-কর্ণিকার ঘাটে তপন মিশ্রের সাথে দেখা হইল, তারপর বৈদ্য চন্দ্র শেখরের সঙ্গে। চন্দ্রশেখরের গৃহে থাকেন আর তপনমিশ্রের গৃহে ভিক্ষা। কাশী হইতে প্রয়াগে আসিয়া ত্রিবেনীতে স্নান করিলেন। মাধব দর্শন করিলেন। প্রেমের আবেগে যমুনায় ঝাপাইয়া পড়িলেন, প্রয়াগে তিনদিন বাস করিয়া মথুরায় আসিলেন।

কৃষ্ণ জন্মস্থানে কেশব দেখিয়া প্রনত হইলেন। প্রভুর প্রেমাবেশ দেখিয়া সকল লোকের চিত্তে চমৎকার লাগিল। এক ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া আবেশে নৃত্য করিতে লাগিল। প্রভু ব্রাহ্মণকে গোপনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এই প্রেমধন কোথায় পাইয়াছ?" ব্রাহ্মণ নিজেকে

মাধবেন্দ্র পুরী গোসাইর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন। শুনিয়াই প্রভু তার চরণে প্রনাম করিলেন। একদিন তার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন।

মধুপুরীর লক্ষ লক্ষ লোক প্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন। প্রভু যমুনার চব্বিশ ঘাটে স্নান করিলেন। স্বয়ম্ভু বিশ্রাম দীর্ঘ বিষ্ণু, ভূতেশ্বর, গোকর্ন প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করিলেন। সেই ব্রাহ্মনকে সঙ্গে লইয়া প্রভু মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন প্রভৃতি দ্বাদশ দর্শন করিলেন।

পথে গাভীর দল দেখিয়া প্রভু প্রেমানন্দে দণ্ডায়মান হন। গাভীগণ আসিয়া প্রভুর অঙ্গলেহন করিতে থাকে। প্রভু গাভীদের অঙ্গ কণ্ডুয়ন করেন। তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলে। রাখাল বহুকষ্ট করিয়া ধেনুর দল গৃহে ফিরিয়া লয়।

প্রভু উচ্চৈস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গান করেন কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া মৃগীর পাল আসে। মৃগমৃগী মিলিয়া দুইজনে প্রভুর অঙ্গ লেহন করে। কোকিল; ভ্রমর প্রভুকে দেখিয়া পঞ্চমস্বরে গান করে। ময়ুর ময়ুরী সঙ্গে পেখম তুলিয়া নৃত্য করে। ময়ূরের কণ্ঠ দেখিয়া প্রভুর কৃষ্ণ স্ফুর্ত্তি হয়। প্রেমাবেশে ধূলায় পড়িয়া যান। বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম প্রভুর সঙ্গে মিলিয়া কৃষ্ণ নামধ্বনি করে। প্রভু প্রত্যেকটি বৃক্ষলতা জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করেন। শুক, শারী প্রভুর হাতের উপর উড়িয়া পড়ে। শুক কৃষ্ণ গুন গায়, শারী রাধাগুন গায়। শুনিয়া প্রভু প্রেমে গদগদ হইয়া পড়েন। ব্রজে আসিয়া প্রভু রাত্রিদিন প্রেমের আবেশে থাকে। স্নানাহার করেন কেবল দেহের অভ্যাস বশতঃ। বৃন্দাবনে আসিয়া কপট বৃন্দাবনবিহারী গৌরহরি যে মহা আনন্দে ডুবিলেন, ভাসিলেন, ভাসাইলেন তাহা ভাষায় বর্ণনা করিবার সামর্থ্য সহস্র বদন অনন্তের ও নাই।১

শ্রীরাধাকুণ্ড উদ্ধার

শ্রীবৃন্দাবনে অরিট গ্রামে আসিয়া প্রভু গৌরসুন্দর জনে জনের কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্রীরাধা কুণ্ড কোথায় অবস্থিত।" কেহ কোন উত্তর দিতে পারিল না, নিকটে দুই ধান্য ক্ষেত্র। তাহাতে অল্প অল্প জল। প্রভু সেই জলে স্নান করিলেন। সেখানে বসিয়া রাধাকুণ্ডের শ্যামকুণ্ডের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। ওখানকার মৃত্তিকা তুলিয়া প্রভু তিলক করিলেন। কিন্তু মৃত্তিকা বহির্বাসে বাঁধিয়া লইলেন সকলেই জানিলেন এই স্থানেই শ্রীরাধাশ্যাম কুণ্ডদ্বয় বিরাজিত প্রভু স্বয়ং এবং পরে রূপ সনাতন প্রমুখ পার্ষদগণ বৃন্দাবনের বহু

লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিলেন। শ্রীবৃন্দাবন তত্ত্ব, বৃন্দাবনীয় রসের ভজন এবং বিশিষ্ট লীলাস্থলী সকলই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর করুণায় প্রকটীভূত হইয়াছেন।

প্রয়াগে রূপানুগ্রহ

বৃন্দাবনে থাকাকালে দিনের পর দিন লোকসংঘট্ট বাড়িতে লাগিল। বলভদ্র প্রভুকে বলিলেন "চলুন প্রভু এখন ব্রজ ছাড়িয়া প্রয়াগের দিকে যাই।" এখন রওয়ানা হইলে প্রয়াগে মকরস্নান পাইব। পদযাত্রীর পথ ধরিয়া যাইব। প্রভু রাজী হইলেন। বলিলেন তুমি ব্রজ দর্শন করাইয়া ঋণী করিয়াছ। এখন যাহা কহিবে তাহাই শুনিব। প্রয়াগ যাইবার পথে প্রভু দুইজন দুর্দ্ধর্ষ পাঠানকে কৃষ্ণভক্ত করিলেন। তাঁহাদের লোকে "পাঠান বৈষ্ণব" বলিত তাহারা সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ঘোষনা করিয়া বেড়াইতেন।

পশ্চিমদেশ প্রেমে ভাসাইয়া প্রভু প্রয়াগে আসিলেন। ত্রিবেণীতে মকরস্নান করিয়া প্রভু দশদিন থাকিলেন। এই সময়ে সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া রাজমন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করিয়া শ্রীরূপ কনিষ্ঠ বল্লভকে সঙ্গে লইয়া প্রয়াগধামে উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাহাদের আত্মসাৎ করিলেন। ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দিয়া শ্রীরূপকে শক্তি সঞ্চার করিলেন। প্রভুর উদ্দেশ্য বৃন্দাবনীয় রসকেলিবার্ত্তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাকে আবার পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া সুষ্ঠুভাবে ভক্ত হৃদয়ে সংস্থাপিত করা। এই সকল কার্য্যের জন্য প্রভু শ্রীরূপ ও শ্রীসানাতনকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীরূপকে শক্তি সঞ্চার করিয়া বলিলেন—"বৃন্দাবনে গিয়া গ্রন্থ রচনা কর ও লুপ্ততীর্থ উদ্ধার কর।"

কাশীধামে গৌরহরি

প্রয়াগ ধাম হইতে পতিতপাবন শ্রীগৌরহরি কাশীধামে আসিলেন। চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস করিলেন। একদিন সকালে প্রভু চন্দ্রশেখরকে কহিলেন —"তোমার দ্বারে একজন বৈষ্ণব আছে তাহাকে লইয়া আইস।" চন্দ্রশেখর কাহাকেও দেখিল না। প্রভু বলিলেন—"দুয়ারে কেহই কি নাই।" চন্দ্রশেখর বলিলেন "একজন দরবেশ আছেন।" প্রভু বলিলেন—"তিনিই বৈষ্ণব তাঁহাকেই চাই।"

প্রভু ডাকিয়াছেন শুনিয়া সনাতন আনন্দে গৃহে প্রবেশ করিয়া দণ্ডবৎ করিলেন। প্রভু উঠিয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। প্রভুর স্পর্শে

সনাতন প্রেমাবিষ্ট হইলেন। প্রভু তাঁহার নিজপার্শ্বে বসাইলেন। পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সনাতন পরমদৈন্যে বলিতে লাগিলেন "প্রভু আমাকে স্পর্শ করিও না।" প্রভু বলিলেন—"তোমাকে স্পর্শ করিতেছি নিজেকে পবিত্র করিতে। কৃষ্ণ পরম কৃপাময়। মহারৌরব হইতে তোমাকে উদ্ধার করিয়াছেন।" সনাতন বলিলেন, আমি কৃষ্ণ চিনি না, তুমিই কৃপা করিয়া আমার উদ্ধার বিধান করিয়াছ।

সনাতন প্রশ্ন

"কে আমি কেন আমায় জারে তাপত্রয়"

প্রভুর আদেশে সনাতন 'ভদ্র' বেশ ধারণ করিলেন। প্রভুর পাদপদ্ম পার্শ্বে বসিয়া সনাতন প্রশ্ন করিলেন—তিনটি। (১) আমি কে? (২) ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জ্জরিত হইতেছি কেন? (৩) কিসে হিত হইবে অর্থাৎ দুঃখ নাশ হইবে? প্রভু সনাতনের প্রশ্নের উত্তর দিলেন—জীবের স্বরূপ কৃষ্ণের দাস। কৃষ্ণের তিনটি শক্তির মধ্যে তটস্থা শক্তি জীবের স্বরূপ। তাহার কার্য্য কৃষ্ণ সেবা, কৃষ্ণের সুখবিধান।

কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের অভেদও আছে ভেদও আছে। কৃষ্ণ অনন্ত অসীম, পূর্ণ। জীব ক্ষুদ্র সমীম, কনা। কৃষ্ণ পূর্ণানন্দঘন—জীব চিৎকন। প্রথম প্রশ্নের উত্তর হইল।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, কৃষ্ণকে ভুলিয়া আছে বলিয়াই—জীবের যত দুঃখ। দুঃখের এই একটি মাত্র কারণ সাধু কৃপায়, শাস্ত্র কৃপায়, ও গুরু কৃপায় যেইমাত্র জীব কৃষ্ণউন্মুখী হয় তখনই তাহার দুঃখ দূর হইতে থাকে। যাহাতে আমরা কৃষ্ণকে না ভুলি.এই জন্য সর্ব্বদা তিনি নিজেকে জানান। জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে থাকিয়া জানান। শাস্ত্ররূপে নিজেই ব্যক্ত হইয়া জীবের স্বরূপ কি, কর্ত্তব্য কি তাহা জানান—আবার গুরুরূপে প্রকট হইয়া কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় কি তাহা জানান। শাস্ত্রকৃপায় গুরুকৃপায় যেইমাত্র জীব কৃষ্ণের প্রতি উন্মুখী হয় অমনি তার দুঃখ ঘুচিতে থাকে।

এইভাবে সহজ কথায়, অল্প কথায় তিন প্রশ্নের উত্তর দিয়া প্রভু বিস্তার করিয়া বলিতে লাগিলেন—বেদশাস্ত্রে তিনটি তত্ত্বের কথা কহিয়াছেন—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণই সম্বন্ধ। ভক্তি অভিধেয় তাকে পাইবার উপায়। জীবের চরম প্রয়োজন প্রেম। প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ, এই

কৃষ্ণ ভক্তি-তত্ত্ব, প্রেম তত্ত্ব লইয়া প্রভু সুবিস্তারে আলোচনা করিলেন। সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদিয়া বিশেষভাবে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিলেন। তারপর "আত্মারাম" শ্লোকের বহুপ্রকার অর্থ-সনাতন শুনিতে চাহিলে-প্রভু অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া এক শ্লোকের একষট্টি (৬১) প্রকার অর্থ করিলেন। সনাতনকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। গ্রন্থরচনা করিতে ও লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিতে।

সন্ন্যাসী উদ্ধার

"বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া নগর"

কাশীধাম জ্ঞান—প্রধান স্থান। শঙ্কর পন্থী সন্ন্যাসীর প্রধান কেন্দ্র কাশী। তখন যত সন্ন্যাসী ছিলেন সকলের প্রধান ছিলেন প্রকাশানন্দ সরস্বতী। প্রভু যখন কাশীতে আছেন তখন কেহ কেহ আসিয়া সরস্বতীর কাছে প্রভুর রূপ, গুণ মহিমার কথা বলিলে তিনি উপহাস করিয়া কহিতেন—"শুনিয়াছি গৌড়দেশের একজন ভাবুক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন—কেশব ভারতীর শিষ্য। চৈতন্য তার নাম, কতগুলি ভাবুক লইয়া গ্রামে গ্রামে নাচে। এমন মোহিনী বিদ্যা জানে যে দেখে সেই তাকে ঈশ্বর বলে। শুনিয়াছি পুরীর পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমও এই মহাইন্দ্রজালীর ফাঁদে পড়িয়াছে। লোকটি নামে মাত্র সন্ন্যাসী আসলে ভণ্ড প্রতারক। কাশীধামে তার ভাবকালী বিকাবে না।

এই সকল কথায় প্রভু হাসেন। বলেন যদি কাশীতে না বিকায় বিনামূল্যে দিয়া যাব। একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া একদিন প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন—তিনি সন্ন্যাসীদের তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন—প্রভুও যদি কৃপা করিয়া আসেন তাহা হইলে তিনি কৃতার্থ হন। প্রভু রাজী হইলেন।

প্রভু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গেলেন। সন্ন্যাসীগণ বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহাদের নমস্কার করিয়া পা ধোয়ার জায়গায় গিয়া পা ধুইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া শ্রীদেহে ঐশ্বর্য্য বিকাশ করিলেন। শ্রীতনু হইতে কোটি সূর্য্যের তেজ বহির্গত হইতে লাগিল। প্রকাশানন্দ বলিলেন শ্রীপাদ ঐ অপবিত্র স্থাতে কেন বসিয়াছ এখানে কাছে এস। প্রভু বলিলেন আমি হীন সম্প্রদায় ভুক্ত এই জন্য এখানে বসিয়াছি। প্রকাশানন্দ তখন নিজে হাত ধরিয়া প্রভুকে মধ্যস্থলে বসাইলেন।

বসাইয়া বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"

তুমি কেশব ভারতীর শিষ্য। তুমি আমাদের সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী। আমাদের সংগে মিলামিশা না করিয়া তুমি নাচ, গান কীর্ত্তন এসব কর কেন? তোমার অঙ্গজ্যোতিঃ দেখিলে মনে হয় তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ কিন্তু বেদান্ত পড় না কেন? শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর মধুর হাসিয়া উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন—গুরুদেব আমাকে মূর্খ জানিয়া বলিলেন তোমার বেদান্ত শাস্ত্র অধিকার নাই। তুমি কৃষ্ণ নাম জপ কর। এই যুগে হরেনামৈব কেবলম্। গুরুর আদেশে আমি নাচি কাঁদি। উহা আমি আপন ইচ্ছায় করি না। নামের শক্তিতে করায়। আমি পাগল হইয়াছি মনে করিয়া গুরুদেবকে সুধাইলাম তিনি বলিলেন তোমার পঞ্চম পুরুস্বার্থপ্রেম লাভ হইয়াছে। আমি গুরুবাক্য বিশ্বাস করিয়া সর্বদা কৃষ্ণনাম গাই। কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ সিন্ধুর আস্বাদন ব্রহ্মানন্দ তাহার কাছে একটা জোনাকী পোকার মত।

শঙ্কর-ভাষ্যের সমালোচনা

সূত্র উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া।
আচার্য্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া।
আচার্য্য কল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে।
মুখে হয় হয় করে হৃদয়ে না মানে।

সর্বেশ্বর হরির মধুময় কথা শুনিয়া সন্নাসীর চিত্ত গলিয়া গেল। তাহারা বলিলে তুমি যাহা বলিয়াছ সবই শাস্ত্রসম্মত—ঠিক কথা। কৃষ্ণ প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু তুমি সন্ন্যাসী হইয়া বেদান্ত শ্রবন কর না কেন? প্রভু বলিলেন বেদান্ত সূত্র ঈশ্বর বচন ইহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু তোমাদেব আচার্য্য শঙ্কর অসদ্ব্যাখ্যা করিয়াছেন শাস্ত্রের মুখ্যার্থ বাদ দিয়া গৌনার্থ কল্পনা করিয়াছেন। ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু, নিরাকা নহেন তিনি চিদাকার তিনি ও তাহার লীলা পার্ষদগণ সবই চিদানন্দময় যারা তাকে নিরাকার বলেন তারা ভ্রান্ত। ভগবানের চিন্ময় শ্রীদেহকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করিলে মহা অপরাধ হয়।

শাস্ত্রের প্রত্যেক শব্দের অর্থ হইবে মুখ্য বৃত্তিতে। আচার্য্য শঙ্কর শ্রুতির অর্থ করিয়াছেন গৌন বৃত্তিতে। শব্দ শ্রবন করিয়া সহজে যে অর্থ বোধহয় তাহা মুখ্যবৃত্তি। প্রকৃত সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষনা দ্বারা কষ্টে যে অর্থের বোধহয় তাহা গৌণবৃত্তি। আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তের অর্থ মুখ্যবৃত্তিতে না করিয়া গৌণবৃত্তিতে করিয়াছেন। উহা শুনিলে সর্বনাশ হয়।

ব্রহ্মতত্ত্ব

ব্রহ্ম নিরাকার নহে, চিদাকার। তাহার সকল শক্তি বিভূতি সবই চিদাকার। যারা নিরাকার বলেন তাহারা চিদ্বিভূতি আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাকে নিরাকার বলেন। ভগবান কৃষ্ণই ব্রহ্ম। তাঁহার স্থান পরিকর ধাম সবই চিন্ময়। প্রকৃত সত্ত্বের বিকার নহে।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদেহ চিন্ময় বিকার রহিত—অপ্রাকৃত। বেদান্তের সকল সূত্রের ভাষ্য মুখ্যার্থে হইবে এবং পরিনামবাদ স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ব্যাসের হার্দ্দ পরিনামবাদ। শঙ্কর তাহা আবরণ করিয়া বিবর্ত্তবাদে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাদের যুক্তি পরিনামবাদ স্বীকারে ব্রহ্ম পরিনামী, বিকারী নয়। এই যুক্তি বিচার সত্য নহে। ব্রহ্ম অধিকারী থাকিয়াই সৃষ্টি করেন। চিন্তামণি রত্ন হইতে রত্নের প্রকাশ হয়। কিন্তু মূল চিন্তামণি অধিকারী থাকে প্রাকৃত বস্তুতেই যখন এই অবিচিন্ত্য শক্তি আছে তখন ব্রহ্মে থাকিবে না কেন? ব্রহ্ম বিকারী না হইয়াই সৃষ্ট্যাদি কার্যের কর্ত্তা হন।

দেহে আত্মবুদ্ধি হইল বিবর্ত্ত। ভগবানের সৃষ্টি কার্যে কোথাও বিবর্ত্ত নাই। সবই পরিণাম। ব্রহ্ম পরিনামী হইয়াও অধিকারী। এই কথাটি শঙ্করাচার্য্য বুঝিতে পারেন নাই—অথবা বুঝিয়াও ভগবৎ ইচ্ছার ঐ রূপ কার্য্য করিয়াছেন।

চিৎকন জীবকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন মনে করিলে শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা হয়। সর্ব্বশাস্ত্র জীব শক্তিকে ব্রহ্মেরই তটস্থা শক্তি বলিয়াছেন। অংশকে পূর্ণের সহিত অভিন্ন মনে করিলে সে ব্যাখ্যা অশেষ দোষপূর্ণ হইবে।

কৃষ্ণেতে অনুরাগই প্রেম। এই প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ। প্রেমদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য রস আস্বাদিত হয়। অন্য কোন উপায়ে নহে। প্রেমে কৃষ্ণ ভক্তের বশ হন। প্রেম হইতেই কৃষ্ণ সুখ লাভ হয়। নাম কীর্ত্তনে সেই প্রেমের উদয় হয়। প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিয়া সন্ন্যাসীদের মন ফিরিয়া গেল—তারা সানন্দে কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিলেন।

সব কাশীবাসী করে নাম সংকীর্ত্তন।
প্রেমোল্লাসে কান্দে গায় করায় নর্ত্তন॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবৎ বিচার।
বারাণসী দেশ প্রভু করিলা নিস্তার॥

এইমত দিন-পঞ্চ থাকিয়া কাশীবাসীদের উদ্ধার করিলেন। একদিন রাত্রে উঠিয়া একাকী প্রভু নীলাচল অভিমুখে চালিলেন। তপন মিশ্র, রাঘুনাথ,

মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ, চন্দ্রশেখর ও পরমানন্দ—এই পাঁচজন দ্রুত দৌড়াইয়া প্রভুকে ধরিলেন। সকলেই প্রভুর সংগে নীলাচল যাইতে চাহেন। প্রভু কাহাকেও সংগে নিলেন না। সনাতন গোস্বামীকে শ্রীবৃন্দাবন পাঠাইয়া দিলেন। রাধাকৃষ্ণ লীলাতত্ত্ব প্রচার করিবেন, গ্রন্থ লিখিয়া আরও লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারণ করিয়া ব্রজের সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন—এই দুইকার্য্যে পাঠাইলেন। আরও এক কথা বলিয়া দিলেন—

কাঁথা করঙ্গিয়া......মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইলে তার করিও পালন।

সুবুদ্ধি রায়ের ব্রজবাস

একসময় সুবুদ্ধি রায গৌড় রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। সৈয়দ হোসেন শা তার চাকুরী করিত। রায় হোসেনসাকে একটা দীঘী খনন করিবার দায়িত্ব দিয়াছিলেন। হোসেন শা সেই কার্য্যে অনেক ফাঁকী দিয়াছিলেন। অসৎ আচরনের জন্য সুবুদ্ধিরায় তাহাকে একটা চাবুকের আঘাত করিয়াছিলেন।

হোসেন শা পরে ভাগ্যবশে গৌড়ের রাজা হইলেন। তিনি সুবুদ্ধি রায়কে খুব মর্য্যাদা দিতেন। হোসেন শার স্ত্রী স্বামীর পৃষ্ঠে চাবুকের দাগ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন সুবুদ্ধি রায়ের শিরচ্ছেদ কর অথবা জাতি নাশ কর নতুবা আমি প্রাণত্যাগ করিব। হোসেন শা অগত্যা করোয়ার পানি মুখে দিয়া তার জাতি নাশ করিয়া দিল।

রায় কাশীতে গিয়া পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্ত বিধান চাহিলেন। পণ্ডিতেরা বলিলেন—তপ্ত ঘৃত খাইয়া প্রাণত্যাগ কর। গৌরসুন্দর যখন কাশীধামে আসিলেন তখন সুবুদ্ধিরায় তাঁর শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত হইয়া সকল নিবেদন করিলেন। প্রভু বলিলেন কেন তপ্ত ঘৃত খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবে? আমি যাহা বলি তাহাই কর।

প্রভু কহে ইহাঁ হৈতে যাহ বৃন্দাবন
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন।
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে
আর নাম হইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে।

সুবুদ্ধি রায় প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীবৃন্দাবন চলিলেন।

নীলাদ্রি প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বলভদ্রকে সংগে লইয়া বনপথে নীলাচল যাত্রা করিলেন। আঠারনলা পৌছিয়া প্রভু বলভদ্রকে পাঠাইলেন ভক্তদের সংবাদ দিতে। আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভক্তগণ নরেন্দ্র সরোবর পর্য্যন্ত আসিয়া প্রভুর সংগে মিলিত হইলেন। ভক্তবৃন্দ সংগে লইয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিলেন। তৎপর কাশীমিশ্রের বাসায় আগমন করিলেন।

গৌড়বাসীর আগমন

প্রভু গৌরসুন্দর দক্ষিণদেশ বিজয় করিয়া ফিরিয়াছেন এই সংবাদ স্বরূপ দামোদর কালাকৃষ্ণ দাস মাধ্যমে গৌড়দেশে পাঠাইলেন। গৌড়দেশ বাসী দুইশত ভক্ত প্রভুর দর্শনাশায় নীলাচল যাত্রা করিলেন। কুলীন গ্রামের শিবানন্দ সেন সবাইকে দেখাশুনা করিয়া লইয়া চলিলেন। রাজায় রাজায় যুদ্ধে পথঘাট নিরাপদ নয়। মাঝে মাঝেই শুল্কঘাটি, সেখানে অনেক বিড়ম্বনা ছিল। এই সকল পথের ব্যাপার সমাধানের দায়িত্ব শিবানন্দ স্বেচ্ছায় সানন্দে গ্রহণ করিতেন।

ভক্তদের সংগে একটি কুকুর ছিল। কুকুর প্রসাদ ছাড়া খাইত না। একদিন শুল্কঘাটীতে শিবানন্দের অনেক দেরী হয়। কুকুরকে প্রসাদ দিতে ভৃত্য ভুলিয়া যায়। সেইদিন কুকুর কোথায় চলিয়া যায়। অনেক অনুসন্ধানে তাকে পাওয়া যায় না। তজ্জন্য সকলের দুঃখ হয়।

স্নানযাত্রার পর জগন্নাথদেবের দর্শন কয়েকদিন বন্ধ থাকে। তখন গৌরসুন্দর আলালনাথ দর্শনে যান। গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ আসিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া প্রভু সত্বর নীলাচলে আসেন। ভক্তগণ আঠারনালা হইতে কীর্ত্তনানন্দ করিয়া পথ চলিতে চলিতে আসেন। প্রতাপরুদ্র মহারাজ নিজ প্রাসাদের ছাঁদ হইতে দর্শন করেন। সংগে সার্ব্বভৌম। গোপীনাথ সবাইকে চিনাইয়া দেন।

প্রভু গৌরহরি স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দদাসকে দিয়া মালা পাঠাইয়া দেন ভক্তগণকে সম্বর্দ্ধনা করিতে। স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দ দুইজনেই অদ্বৈতাচার্য্যকে মালা দিয়া সম্বর্দ্ধনা জানান। প্রতাপরুদ্র জানিতে চাহেন এই যে সূর্য্যের মত জ্যোতির্ময় পুরুষবর যাকে দুজনে মালা পরাইল ইনি কে? গোপীনাথ বলিলেন এই অদ্বৈতাচার্য্য। ইনি গৌর আনা ঠাকুর। গঙ্গাজল

তুলসী দিয়া ইনি কাঁদিয়া ডাকিয়া গৌরকে আবতরণ করাইয়াছেন। ইনি শান্তিপুরেশ্বর আচার্য্যবর্য্য। স্বয়ং মহাপ্রভুও ইহাকে মান্য করেন। ইনি সকলের শিরোমণি। প্রতাপরুদ্র বলিলেন—মানুষের দেহে এত তেজ জীবনে কখনও দেখি নাই। ইহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। গোপীনাথ একে একে শ্রীবাস, গদাধর, শিবানন্দ, মুরারি, বক্রেশ্বর সবাইকে পরিচয় করাইয়া দিলেন। নর্ত্তন, কীর্ত্তন হরিধ্বনি শুনিয়া রাজা কহিলেন—

ঐছে নৃত্য ঐছে কীর্ত্তন ঐছে হরিধ্বনি
কভু নাহি দেখি ঐছে কভু নাহি শুনি।

গোপীনাথ বলিলেন—মহারাজ তোমার বাক্য সুসত্য।

চৈতন্যের সৃষ্টি এই নাম সংকীর্ত্তন।

ভক্তগণ সকলে কাশীমিশ্র ভবনে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘ বিরহের পর মহাপ্রভুর দর্শন স্পর্শহ আপ্যায়ন আলিঙ্গন লাভে কৃতকৃতার্থ হইলেন। উড়িষ্যাবাসী ভক্তদের সংগে গৌড়দেশবাসী ভক্তগণেরও পরম মিলনানন্দ হইল।

অনুগৃহীত কুকুর

শিবানন্দ সেন শ্রীশ্রীপ্রভুর সংগে মিলিত হইলেন। প্রভু আলিঙ্গন করিয়া পার্শ্বে বসাইলেন। সেন দেখিলেন সেই কুকুরটি প্রভুর পার্শ্বে বসিয়া আছে। ভৃত্য প্রসাদ দিতে ভুল করায় যে কুকুরটি কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল—সেই কুকুরটি। প্রভু তার সম্মুখে নারিকেল শস্য ফেলিয়া দেন আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলেন। কুকুর প্রভুর প্রসাদী নারিকেল শস্য খান আর কৃষ্ণ বলেন। তার উচ্চারণ স্পষ্ট কুকুরের ভাগ্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ। শিবানন্দ কুকুরকে দণ্ডবৎ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন। তারপর হইতে কুকুরটিকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। সে সিদ্ধ দেহ পাইয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীরূপের ভাবানুরূপ শ্লোক

শ্রীশ্রীপ্রভু যখন জগন্নাথের রথাগ্রে অগনিত ভক্তসঙ্গে মধুর নর্ত্তন কীর্ত্তন করেন তখন শ্রীমুখের·দিকে তাকাইয়া একটি শ্লোক পড়েন। শ্লোকটি প্রকৃত রসের প্রায় অশ্লীল পর্য্যায়। শ্লোকটির অর্থ এইরূপ—

বিবাহের পর পত্নী পতিকে বলিতেছেন—তোমার সংগে মিলনে সুখ

হইতেছে না। বিবাহের পূর্ব্বে রেবানদীর তীরে বেতসীকুঞ্জের আড়ালে মিলনে যে সুখ হইত সে সুখ আজ আর নাই।

প্রভু কেন এইরূপ একটি শ্লোক পড়েন তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। এক বৎসর রথের সময় শ্রীরূপ আসিয়াছেন। তিনি শ্লোক শুনিয়া প্রভুর ভাবানুরূপ আর একটি শ্লোক লিখিলেন—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলী পঞ্চমজুষে,
মনো মে কলিন্দী পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি॥

শ্লোক পডিয়া প্রভু আনন্দে অধীর হইলেন। শ্রীরূপে পিঠে চাপড় দিয়া বলিলেন "আমার অন্তর তুই জানিলি কেমন? শ্লোকের সংক্ষেপার্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ
জগন্নাথ দেখি যৈছে প্রভুর ভাবন।
শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন
যদ্যপি পায়েন তবু ভাবেন ঐছন
রাজবেশ সাতী ঘোড়া মনুষ্য গহন
কাঁহা গোপবেশ কাঁহা নির্জ্জন বৃন্দাবন
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পুরণ।

শ্রীরূপের শ্লোকে গৌরতত্ত্ব

শ্রীরূপ গোস্বামী নাটক লিখিতেছেন। প্রভুর নির্দ্দেশে একখানি গ্রন্থকে দুইখানি করিয়া লিখিতেছেন। বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব। রসিক ভক্তগণ সঙ্গে স্বয়ং গৌরসুন্দর উপবিষ্ট। রায় রামানন্দ বিদগ্ধ মাধবের প্রারম্ভে ইষ্টদেব বন্দনায় কি লিখিয়াছ? শ্রীশ্রীপ্রভু নিকটে বসিয়া শ্রীরূপ শ্লোক পাঠ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। কারণ শ্লোক প্রভুর তত্ত্ব মহিমা বর্নিত আছে। প্রভু তাহা বুঝেন নাই। তিনি বলিলেন "রূপ সঙ্কোচ কর কেন? বৈষ্ণব সমাজে গ্রন্থ শুনানো মহাভাগ্যের কথা।" তথাপি শ্রীরূপ চুপ করিয়া থাকিলে স্বরূপ দামোদর লেখা হাতে নিয়া পাঠ করিলেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

শ্লোক শুনিয়া সকল ভক্ত আনন্দে অধীর। প্রভুর চূড়ামনি গৌরসুন্দর মন্তব্য করিলেন—"অতি স্তুতি হইয়া গিয়াছে।"

প্রভু সকল ভক্তদের বলিলেন—"তোমরা সকলে রূপকে আশীর্ব্বাদ কর যেন রসতত্ত্ব বর্ণনা করিতে পারে। ভক্তগণ বলিলেন—"তুমি নিজেই ইহাকে অশেষ কৃপা করিয়াছ। আমাদের আর কিছু করিতে হইবে না।"

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কথা

প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামক একজন কৃষ্ণভক্ত শ্রীশ্রীগৌরহরির নিকট কৃষ্ণ কথা শুনিতে চাহিলেন। প্রভু বলিলেন—আমি কৃষ্ণকথা জানি না। রামানন্দ রায় জানেন। তাহার কাছে যাও। প্রভুর বাক্য অনুসারে প্রদ্যুম্ন রায়ের গৃহে গেলেন। রায় গৃহে ছিলেন। তাহার সেবক বলিল—"রায় এখন কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। তিনি দুইটি দেবকন্যাকে নৃত্যাদি শিক্ষা দেন। তাহারা লীলাভিনয় করিয়া জগন্নাথদেবকে শুনাইবেন।

কিশোরী সুন্দরী মেয়েদের নাচ শিক্ষা দেন শুনিয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্রের মনে অশ্রদ্ধা হইল। তিনি তখন ফিরিয়া গিয়া প্রভুকে বলিয়লন—"রাম রায়ের কার্য্যাদি শুনিয়া আমার শ্রদ্ধা হইল না তাই চলিয়া আসিয়াছি। প্রভু বলিলেন তুমি আবার যাও। রামানন্দকে তুমি চিনিতে পার নাই। রামানন্দ নির্বিকার জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। ঐরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহ নাই। তাহার দেহ অপ্রাকৃত। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলা আস্বাদন করিতে করিতে তিনি কামবিকার শূন্য হইয়াছেন। তুমি আমার নাম লইয়া আবার তাহার কাছে যাও।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র নিজের ভুল বুঝিয়া আবার গেলেন। রামরায় প্রাণ ভরিয়া কৃষ্ণলীলা তত্ত্বমাধুর্য্য কীর্ত্তন করিলেন বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত। বক্তা শ্রোতা দুইজনেই প্রেমাবেশে বাহ্যস্মৃতি শূন্য হইয়া রহিলেন। প্রদ্যুম্ন মিশ্র "কৃতার্থ হইলাম" বলিয়া বিদায় লইলেন।

বঙ্গীয় কবির নাটক

বঙ্গদেশীয় এক বিপ্র শ্রীশ্রীপ্রভুর চরিত্রের একখানি নাটক লিখিয়া আনিয়াছেন। অনেক ভক্ত তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছেন। সকলের ইচ্ছা প্রভু শোনেন। প্রভু বলিলেন—আগে স্বরূপ দামোদরকে শোনাও। সে যদি কহে শ্রবনযোগ্য তাহা হইলে আমি শুনিব।

স্বরূপের নিকট প্রথম নান্দীশ্লোক পাঠ করিলেন। শ্লোকটি সুন্দর। তার তাৎপর্য্য এই যে—সম্প্রতি নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীগৌরসুন্দর দ্বারা আত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ জগন্নাথ দেহ, গৌরহরি আত্মা। তিনি এখন অজ্ঞান জীবকে জ্ঞান দান করিতেছেন। তিনি সকলের মঙ্গলবিধান করুন।

শ্লোকের অর্থ শুনিয়া সকলেই প্রশংসা করিলেন। কিন্তু স্বরূপ দামোদর বিমনা হইলেন। তিনি কহিলেন—"শ্লোকের ব্যাখ্যান কর।" কবি বলিলেন—"সুন্দর শরীর জগন্নাথ আর চৈতন্য গোসাই শরীরী। জড জগৎকে চেতন করাইতে কৃষ্ণ চৈতন্য রূপে আবিভূত। তিনি মঙ্গল বিধান করুন।" স্বরূপ গোসাই বলিলেন, তোমার শ্লোক দোষযুক্ত হইয়াছে। দুইজন ঈশ্বরের একজনেও তোমার বিশ্বাস নাই। জগন্নাথ পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ। তাহাকে জডদেহের সহিত তুলনা করিয়াছ। আর পূর্ণ ষডৈশ্বর্য্য শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান। তাহাকে তুমি চিৎকন জীবাত্মার সহিত তুলনা করিয়াছ। দুই ঈশ্বরের কাছেই তোমার অপরাধ।

আরও এক অপরাধ করিয়াছ। ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী-ভেদ—এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা হইয়াছে তোমার শ্লোকে। একজনকে দেহ ও অপর একজনকে দেহী বলায়।

আবার শ্লোকের শদর্থও করা যায়।

জগন্নাথ কৃষ্ণের আত্মা স্বরূপ। তিনি দারুব্রহ্ম রূপে বিরাজমান, তাঁহারই সহিত অভিন্নরূপে। তাঁহার সহিত আত্মতায়, একরূপ হইয়া কৃষ্ণ এক তত্ত্ব দুই রূপ হইয়া লোক নিস্তারের জন্য জঙ্গম ব্রহ্মরূপে আবিভূত হইয়াছেন। জগন্নাথ 'দারুব্রহ্ম স্থাবর স্বরূপ' আর গৌরচন্দ্র জঙ্গমরূপে কৈল অবতার। এই অর্থে শ্লোক নির্দোষ হয়।

রঘুনাথ দাসের প্রতি কৃপা

সপ্তগ্রামের বড জমিদার গোবর্ধন দাসের ছেলে রঘুনাথ। গৌরসুন্দরের

আবির্ভাব বার্ত্তা, নাম গুণ গান শুনিয়া রঘুনাথ শান্তিপুরে প্রভুর পাদপদ্মে গিয়া পৌছান। প্রভু গৌরহরি তাহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বলেন। একটু বেশ কঠোর ভাষাতে বলেন—

"মর্কট বৈরাগ্য না করিহ লোক দেখাইয়া
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।"

রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া যান। পিতামাতা তাহাকে সংসারবদ্ধ করিবার জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। রঘুনাথ সংসারে মন দিলেন। তাহা শুধু বাহিরে। অন্তর তীব্র বৈরাগ্যময়। একদিন রাত্রে উঠিয়া একাকী পলায়ন করিলেন। পিতা সন্ধান করিয়া পথ হইতে ধরিয়া গৃহে আনেন এবং সর্ব্বদা পাহারায় রাখিলেন।

দয়াল নিতাইচাঁদ পানিহাটীতে আসিয়াছেন শুনিয়া রঘুনাথ সেখানে ছুটিয়া আসিলেন। রঘুনাথ ইতিপূর্ব্বে নিতাইচাঁদকে দর্শন করেন নাই। আজ প্রথম দেখিলেন। গঙ্গাতটে এক বৃক্ষমূলে এক পিণ্ডার উপর বসিয়া আছেন। অঙ্গে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের জ্যোতিঃ। চারিদিকে ভক্তবৃন্দ ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। প্রভুর প্রভাব দেখিয়া রঘুনাথ বিষ্ময়ান্বিত হইলেন। দূর হইতে দণ্ডবৎ করিলেন। পরম কৌতুকা দয়াল ঠাকুর নিতাইচাঁদ রঘুনাথকে টানিয়া নিজের নিকটে নিয়া মাথায় শ্রীচরণ দিলেন। মধুর ভাষায় বলিলেন—"চোরা দেখা দিস্ না কেন? আজ ভক্তদের চিড়া দধি খাওয়াই দে।"

নিতাইচাঁদের আদরে আবদারে রঘুনাথ মুগ্ধ হইলেন। যেমন আদেশ করিলেন তেমনই পালন করিলেন। খুব ঘটা করিয়া চিড়া দধি মহোৎসব দিলেন। নিতাইচাঁদ ধ্যানে গোরাচাঁদকে আনিয়া ঐ মহোৎসবে খাওয়াইয়া দিলেন।

নিত্যানন্দপ্রভু গৌরসুন্দরকে ধ্যানে আনিয়া ভোজন করাইয়া অবশেষে প্রসাদ রঘুনাথকে দিয়া বলিলেন—"শ্রীচৈতন্য প্রভু ভোজন করিয়াছেন, তাঁহার অধরামৃত পাইলে তোমার বন্ধন খণ্ডন হইবে।"

রঘুনাথ শ্রীনিতাচাঁদের চরণে প্রার্থনা করিলেন, "শ্রীগৌরের চরণ কিরূপে পাইব, উপায় কহিয়া দেন। যতবার গৃহ ছাড়িয়া পলাইলাম পিতামাতা ধরিয়া আনিয়া বান্ধিয়া রাখিল। তোমার কৃপাছাড়া চৈতন্যচাঁদ পাইবার অপর কোন উপায় দেখি না।"

রঘুনাথের মস্তকে শ্রীচরণ ধরিয়া নিতাইচাঁদ কহিলেন—"তোমার সকল

বন্ধন ছুটিয়া গিয়াছে। প্রাণের গৌরহরি তোমাকে অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন। স্বরূপের হাতে সমর্পণ করিবেন। ইহা অচিরেই ঘটিবে।”

বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে রঘুনাথ শয়নে আছেন। চারিদিকে কড়া পাহারা। শেষরাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত তখন পরিবারের পুরোহিত ঠাকুর যদুনাথ আচার্য্যের সঙ্গে গৃহে ছাড়িয়া পলায়ণ করিলেন। পরে পুরোহিতকে বাড়ী পাঠাইযা একাই চলিলেন। পথ ছাড়িয়া উপপথে চলিলেন। একদিনে পনের ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেন। পরদিন পূর্ব্ব মুখ ছাড়িয়া দক্ষিণমুখে চলিলেন। ‘ছত্রভোগ’ পার হইয়া বরাবর পুরীধাম অভিমুখে চলিলেন। বারদিনে নীলাচলে পৌছিলেন। পথে তিনদিন মাত্র কিছু আহার করিয়াছেন। “চৈতন্য চরণ প্রান্তে মন তাই ক্ষুধা নাহি বাধে”।

করুণানিলয় শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। সেই সময় রঘুনাথ আসিযা দণ্ডবৎ করিলেন। প্রভু স্নেহভরা কণ্ঠে কহিলেন ‘আইস’ রঘুনাথ শ্রীচরণে পতিত হইলেন। গৌরহরি তাহাকে বক্ষে ধরিলেন। সকল ভক্তগণ সঙ্গে মিলন হইল। স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া গৌরহরি বলিলেন—“এই রঘুনাথ আমি সঁপিনু তোমারে।” আমার তিনজন রঘুনাথ আছে। ইহার পরিচয় হইল স্বরূপের রঘুনাথ। তুমি ইহাকে “পুত্র ভৃত্যরূপে গ্রহণ কর।”

গোবিন্দ দাস প্রভুর অবশেষ পাত্র রঘুনাথকে দিল। এইমত পাঁচদিন চলিল। তারপর রঘুনাথ দশদণ্ড রাত্রের পর জগন্নাথে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সিংহদ্বারে খাড়া হইয়া থাকেন। যে যাহা দিতেন তাহাই নিতেন।

“রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হঞা মাগি খায়” শুনিয়া প্রভু বলিলেন “ভাল হইল, বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিণা।”

“বৈরাগী করিবে সদা সম সংকীর্ত্তন
মাগিয়া যাচিয়া করে জীবন ধারণ।”

রঘুনাথ শ্রীশ্রীগৌর চরণে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কৃত্য কি? “সাধ্য সাধন কহ”—প্রভু বলিলেন—“স্বরূপ সব তোমায় বলিবে। আমি কয়েকটি মাত্র কথা তোমাকে বলি—

“গ্রাম্য কথা না শুনিবে; গ্রাম্য কথা না কহিবে
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥”

রঘুনাথের সংবাদ পাইয়া তাহার পিতা এক ব্রাহ্মনের হাতে চারিশত টাকা দিয়া পাঠাইলেন। রঘুনাথ তাহা গ্রহণ করিলেন না। সিংহদ্বার ছাড়িয়া ছত্রে মাগিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। শুনিয়া প্রভু বলিলেন—

"ভাল হইল ছাড়িল সিংহদ্বার
সিংহ দ্বারে ভিক্ষা বৃত্তি বেশ্যার আচার।"

কিছুদিন পর রঘুনাথ ছত্রে ভিক্ষাও ত্যাগ করিলেন। পসারির যে প্রসাদান্ন বিক্রয় না হয় তাহা তাহারা ফেলিয়া দেয়। নর্দমা দিয়া চলিয়া যায়। সড়াগন্ধে গাভীগুলিও তাহা খায় না। রঘুনাথ তাহা তুলিয়া ধুইয়া যে অন্নকটি আস্ত পান তাহাই খান। একদিন স্বরূপ রঘুনাথের হাত হইতে ঐ প্রসাদ কিছু যাজ্ঞা করিয়া নিলেন—বলিলেন আমাদের ভাগ না দিয়া এমন অমৃত খাও। প্রভু গৌরহরি শুনিয়া একদিন একগ্রাস কাড়িয়া নিয়া খাইলেন বলিলেন "খাসা বস্তু খাও আমারে না দেও কেনে।" অতুলনীয় রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখিয়া প্রভুর আনন্দের সীমা নাই।

শিলা ও মালা

শঙ্করানন্দ সরস্বতী যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুরীধাম আসেন তখন তিনি সংগে করিয়া একখানি গোবর্দ্ধন শিলা ও একটি গুঞ্জামালা লইয়া আসেন। ঐ দুইটি বস্তু তিনি ব্রজরস-মগ্ন শ্রীগৌরহরিকে অর্পন করেন। লীলাস্মরণকালে প্রভু গুঞ্জামালাটিকে গলায় ধারণ করেন। আর গোবর্দ্ধন শিলাটিকে কখনও বুকে কখনো চক্ষের উপর কখনও শিরে ধারণ করেন। শিলা সর্ব্বদাই গোরাচাঁদের নয়নজলে সিক্ত থাকে। শিলাকে কৃষ্ণ কলেবর মনে করেন। তিন বৎসর ধরিয়া গৌরহরি এই শিলা ও মালার সেবা আদর করিয়াছেন। রঘুনাথের বৈরাগ্যে ও ভজনে পরম তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীপ্রভু ঐ পরম বস্তুদ্বয় রঘুনাথকে দান করিলেন।

শিলা মালা দিবার সময় শ্রীমুখে বলিলেন, "এই শিলার সাত্বিক সেবার তুমি কৃষ্ণ প্রেমধন লাভ করিবে।" সাত্বিক সেবায় কি লাগিবে তাহাও বলিয়া দিলেন—"এক কুজা জল ও আটটি তুলসী মঞ্জরী।" রঘুনাথ শিলা সেবা নিলেন। শিলাকে তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন রূপে দর্শন করেন। ইহা প্রভুর "স্বহস্ত দত্ত" এই কথা ভাবিতেই রঘুনাথ নয়ন ধারায় ভাসিয়া যায়।

শিলা মালা পাইয়া রঘুনাথ তাহার তাৎপর্য্য ইহাই বুঝিলেন যে শিলা দিয়া প্রভু তাহাকে গোবর্দ্ধনে ও মালা দিয়া শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন।

কি রূপ ভজন করেন? সাড়ে সাত প্রহর স্মরণে থাকেন। চারিদণ্ড মাত্র আহার নিদ্রায় কাটান। ভক্ষন শুধু প্রান রক্ষার্থ। আজন্ম জিহ্বায় রসের স্পর্শ দেন নাই। ছেড়া কাথা ছাড়া পরিধান করেন নাই। রঘুনাথ যে নিয়ম করিতেন তাহা ছিল পাষাণের রেখার মত অপরিবর্ত্তনীয়।

শ্রী হরিদাস নির্য্যাণ

শ্রী হরিদাস ঠাকুর গৌরভক্ত শিরোমণি। নিত্য তিনি তিনলক্ষ নাম জপ করেন। ভক্ত সমাজে নাম ব্রহ্মের অবতার বলিয়া খ্যাত। সিদ্ধ বকুল নামে একটি স্থানে কুটিরে বাস করেন। আর কোথাও যান না। দূর হইতে একবার মন্দিরের চূড়া দর্শন করেন। "তৃনাদপি সুনীচেন" মন্ত্রের মূর্ত্তি। দৈন্য বিনয়ের খনি।

প্রাণ গৌরসুন্দর নিত্য সমুদ্র স্নানে যান। যাইবার কালে একটিবার হরিদাসের কাছে আসেন। এক উদ্দেশ্য—তাকে দেখা দিবেন। আর এক উদ্দেশ্য তাহার মুখে প্রেমভরে উচ্চারিত শ্রীনাম শুনিবেন। প্রভুর ভৃত্য গোবিন্দ দাস প্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রতিদিন তাহাকে দিয়া আসেন।

একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া হরিদাসের কুটিরে গিয়াছেন। গিয়া দেখেন হরিদাস ঠাকুর শুইয়া শুইয়া অতি মৃদু মৃদু ভাবে নাম উচ্চারণ করিতেছেন্। গোবিন্দ বলিলেন হরিদাস, "উঠিয়া আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ কর।" হরিদাস বলিলেন, "আজ লঙ্ঘন করিব অর্থাৎ কিছু খাইব না। জপের সংখ্যা পূর্ণ করিতে পারি না—পূর্ণ না করিয়া কি করিয়া খাইব। আবার মহাপ্রসাদ আনিয়া লইবার জন্য ডাকিতেছ—কি করিয়া তাহা উপেক্ষা করা যায়"—ইহা বলিয়া এক রঞ্চ প্রসাদ হাতে তুলিয়া নিজ মুখে ফেলিয়া দিলেন।

এই দৃশ্য দেখিয়া গোবিন্দ গৃহে গিয়া মহাপ্রভুর কাছে সব কথা জানাইয়া দিলেন। পরদিন প্রভাতে ভক্তবৎসল হরি হরিদাসের কুটিরে আসিলেন। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন পরম স্নেহের সহিত-"হরিদাস, সুস্থ আছ? ভক্ত উত্তর করিলেন—" প্রভু আমার শরীর সুস্থ, মন বুদ্ধি অসুস্থ।" প্রভু আবার

শুধাইলেন—"হরিদাস, তোমার কি ব্যাধি হইয়াছে?" "আমার সংখ্যা কীর্ত্তন পূর্ণ হয় না"—এই কথা বলিয়া ভক্তবর উত্তর করিলেন। প্রভু আবার বলিলেন "হরিদাস তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ। এখন জপসংখ্যা অল্প করিয়া কর। আর এক কথা —যারা যারা সাধন রাজ্যে কেবল প্রবর্ত্তক তারা নিয়মিত সংখ্যা জপিয়া জপ করে। তুমি এখন সিদ্ধ হইয়াছ। মুখে জপ না করিলেও তোমার মানসে অজপা জপ চলিতে থাকে। তোমার এখন সংখ্যা পূর্ণ করিবার দিকে আগ্রহ রাখিবার আর কোনও প্রয়োজন নাই।"

"জগতে নামের মহিমা প্রচার করিতে তুমি জগতে আসিয়াছ। তোমা দ্বারা সেই কার্য্য যথেষ্ট হইয়াছে। এখন জপ সংখ্যা কম করিয়া দেও।"

প্রভুর কথা শুনিয়া ঠাকুর হরিদাস তখন এই প্রসঙ্গ বাদ দিয়া অন্য কথা তুলিলেন। বলিলেন—"প্রভু আমাব মনে সর্ব্বদাই জাগে তুমি শীঘ্র এই লীলা সংবরণ করিবা। সেই লীলা কভু আমাকে দেখাইবা না। তুমি নাই, হরিদাস পৃথিবীতে আছে, ইহা যেন কখনও সংঘটিত না হয়। তোমার লীলা সংবরণের আগে প্রভু তুমি আমাকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিবা।"

একটু সময় নীরব থাকিয়া হরিদাস আবার বলিলেন—"প্রভু মনে একটা সাধ আছে। মৃত্যুকালে আপনার রাঙ্গা চরণ দুইখানি বক্ষে চাপিয়া রাখিব। চক্ষু খুলিয়া আপনার শ্রীবদনপদ্ম দেখিতেই থাকিব। মুখে আপনার মধুময় নামটি উচ্চারণ করিব। এই ভাবে এই দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে —এই মনে আকাঙ্খা।"

ভক্তের প্রার্থনায় ভগবান যেন বিপদে পড়িলেন। কি বলিবেন—যদি বলেন 'হাঁ' তাহা হইবে—তাহা হইলে একটি নির্ম্মম হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া হয়। যদি বলেন 'না' তাহা হইতে পারে না—তাহা হইলে ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করা হয় না।

চতুর চূড়ামণি দুইদিক বজায় রাখিয়া মধুর উত্তর দিলেন, বলিলেন— "হরিদাস, তুমি পরম ভক্ত। তোমার যাহা মনের বাঞ্ছা তাহা শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। কিন্তু তোমার আমাকে ছাড়িয়া যাওয়া উচিৎ হয় না। আমি আছি জগতে, আমার যত সুখ তোমাদের লইয়াই।"

শ্রীভগবানের চাতুর্য্যপূর্ণ বাক্য শুনিয়া শ্রীহরিদাস কহিলেন—"প্রভু, একি কথা বলিলেন? আমার শিরোমণি তুল্য সহস্রজন আছেন যাঁহারা আপনার লীলার সহায়। তাঁহাদের কাছে আমি একটি পিপীলিকা। একটা পিঁপড়া মরিয়া

গেলে জগতের ও কোন ক্ষতি হবে না—আপনার ও কোন ক্ষতি হইবে না।" ভক্তবাক্যে ভগবান নীরব হইয়া গেলেন। আর কোন উত্তর যেন খুঁজিয়া পাইলেন না। উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তবৃন্দসহ হরিদাসের কুটিরে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—"হরিদাস, সমাচার কি?" অর্থাৎ তোমার মনের ইচ্ছা কিছু বদলাইয়াছে কিনা, হরিদাস বলিলেন—"প্রভু আমার কোন সমাচার নাই। আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমার সমাচার।" প্রভু তখন হরিদাসের কুটিরাঙ্গনে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত নর্ত্তক, আর গায়ক স্বরূপ গোসাই, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রায় রামানন্দ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ। শায়িত হরিদাসকে ভক্তগণ প্রদক্ষিণ করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

সুচতুর ভক্তরাজ হরিদাস প্রভুর শ্রীহস্ত ধরিয়া টানিয়া আপনার পার্শ্বে ঠিক চক্ষের সম্মুখে বসাইলেন। প্রভুর বদনমণ্ডল প্রস্ফুটিত শতদল পদ্মের মত। ভক্তের চক্ষু দুইটি যেন দুইটি তৃষ্ণার্ত্ত ভ্রমরের মত। ভ্রমর দুইটি শতদলের মধুপান করিতে লাগিল। প্রভু উপবিষ্ট হরিদাসের পার্শ্বে। হরিদাস অতি ধীরে ধীরে শ্রীচরণ পদ্মটি জোর করিয়া নিজের হৃদয়পদ্মে চাপিয়া ধরিলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ নয়নের ও বক্ষের সাধ মিটাইয়া ভক্তবর হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য"—উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দেহ হইতে প্রাণপাখি বহির্গত হইয়া গেল।

সকলে প্রত্যক্ষ করিল, মহাযোগেশ্বরের মত ইচ্ছামাত্র দেহ ত্যাগ। এইরূপ ইচ্ছামৃত্যুর ঘটনা আর একবার ঘটিয়াছিল দ্বাপর যুগে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বদনমণ্ডল দেখিতে দেখিতে কাতর প্রার্থনা করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। হরিদাস ঠাকুরের অবস্থাটি দেখিয়া সকলের মনে পড়িল ভাগবত শাস্ত্রে বর্ণিত ভীষ্মদেবের নির্য্যাণের কথা।

ভক্তবৎসলতার ঘনীভূত মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর ভক্তরাজের দেহখানি নিজকোলে তুলিয়া লইয়া অঙ্গন ভরিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে প্রভুকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখিয়া স্বরূপ দামোদর প্রভুর সম্মুখ ভাগে করজোড়ে দাঁড়াইলেন। প্রভু নিরস্ত হইলেন। ভক্তবরের শ্রীদেহ বিমানে চড়াইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রতীরে লইয়া যাওয়া হইল। প্রভু একই ভাবে সঙ্গে নাচিতেছেন। কীর্ত্তনানন্দও চলিতেছে।

সমুদ্রতীরে নিয়া প্রভু ভক্তের দেহ নিজ শ্রীহস্তে স্নান করাইলেন। স্নান শেষ করাইয়া একটি মহামূল্যবান বাণী বলিলেন। বলিলেন—"আজি হইতে এই সমুদ্র মহাতীর্থ হইল।" সমুদ্র তো চিরকালই তীর্থ, কারণ সকল পবিত্র নদী সমুদ্রে গিয়া মিলিয়াছে। আজ তীর্থ, মহাতীর্থ হইল শ্রীহরিদাসের অপ্রাকৃত দেহস্পর্শে। হরিদাস কখনও সমুদ্রে নামিয়া স্নান করিতেন না—ভয়ে সমুদ্রজলে পা লাগিবে।

হরিদাসের অঙ্গ বাহিয়া জল পড়িতেছে। চরণ বাহিয়া যে জল পড়িতেছে তাহা সকলে হাত পাতিয়া পান করিতে লাগিল। বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রমুখ ব্রাহ্মণ ভক্তেরাও। জগন্নাথের মন্দির হইতে প্রসাদী বস্ত্র আসিল। তাহা প্রভু হরিদাসের অঙ্গে জড়াইয়া দিলেন ও প্রসাদী চন্দন মাখাইয়া দিলেন। শ্রীমুখে হরিবোল হরিবোল উচ্চারণ করিতে করিতে স্বয়ং ভগবান গৌরহরি আপন শ্রীহস্তে হরিদাসকে সমাহিত করিয়া অঙ্গে বালু দিয়া ঢাকিলেন—তাহার উপর পিণ্ড বাঁধাইলেন। আবার তাহা ঘিরিয়া ঘিরিয়া কীর্ত্তন চলিল। হরিধ্বনি কোলাহলে পৃথিবী যেন পূর্ণ হইয়া গেল।

শ্রীহরিদাসের মহোৎসব

সমুদ্রতীরে লোকারণ্য। তুমুলভাবে কীর্ত্তন চলিতেছে। ইহার মধ্যে হঠাৎ প্রভুর অন্তর্দ্ধান। কখন কোন দিকে গেলেন প্রভু, কেহ লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। প্রভু শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে ছুটিয়া আসিয়াছেন। আনন্দ-বাজারে অন্নব্যঞ্জন বিক্রয় হয়। পসারীদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজ বহির্ব্বাসের অঞ্চল পাতিয়া প্রভু চাহিতেছেন। বলিতেছেন—"আমি আমার হরিদাসের নির্য্যাণ মহোৎসব করিব। সকলে আমাকে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা দেন।" কি কারুণ্যের দৃশ্য। ভক্ত বৎসলতা যেন মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ভক্তগণ করজোড়ে প্রভুকে গম্ভীরায় পাঠাইয়া দিলেন। নিজেরা ভিক্ষা করিয়া ক্রয় করিয়া বহু প্রসাদান্ন লইয়া গম্ভীরায় আসিলেন। কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলেন। ভক্তগণের পাতে প্রভু নিজ হস্তে প্রসাদ পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভু অগ্রে গ্রহণ না করিলে ত কেহই খাইবেন না। তাই স্বরূপের অনুনয়ে প্রভু বসিলেন।

সেদিন প্রভুর ভিক্ষার নিমন্ত্রন ছিল কাশীমিশ্রের গৃহে। কাশীমিশ্র নিজেই

প্রসাদ লইয়া গম্ভীরায় আসিলেন। সকল বৈষ্ণবগণ সঙ্গে প্রভু মহোৎসবে প্রসাদ নিতে বসিলেন। সকলে আকণ্ঠ প্রসাদ লইলেন। তারপর নিজ শ্রীহস্তে ভক্তগণকে মালাচন্দন পরাইয়া দিয়া বলিলেন—"আজিকার হরিদাসের এই বিজয়োৎসব যাহারা দর্শন করিয়াছে, যাহারা তাহার শ্রীঅঙ্গে বালুকা দিয়াছে, যাহারা এই মহোৎসবে প্রসাদ লইয়াছে—সকলের অচিরে কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্তি ঘটিবে। এই বর দিলাম।

নিজে পরম দৈন্যে ভক্ত বিরহে ব্যথিত-কণ্ঠে কহিলেন—"করুণাময় কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে হরিদাসের মত ভক্তের সঙ্গ দিযাছিলেন। আজ সেই সঙ্গ ভঙ্গ হইল। কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই হইল। হরিদাস যখন ইচ্ছা করিল আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে—তখন আমার শক্তি হইল না তাহাকে রাখিয়া দেই। হরিদাস ছিল এই বিশ্বজগতের একটি মহারত্ন। তাহাকে হারাইয়া বিশ্বজগৎ রত্ন হারা হইল।" মধুর বাণী শুনিয়া ভক্তবর্গ আনন্দ সমুদ্রে ডুবিয়া গেলেন। জয় হরিদাস, জয় হরিদাস, জয় জয় হরিদাস ধ্বনি দিতে দিতে সকলে গৃহে গমন করিলেন।

হরিদাস ঠাকুরের কথা

ঠাকুর হরিদাসের অভূতপূর্ব তিরোভাবের কথা বলা হইল, তার পূর্বে জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। গৌরসুন্দর সেই সব কথা ভক্তসমক্ষে পঞ্চমুখে গাহিয়াছেন, যত বলেন তত সুখী হন।

হরিদাসের গুণ কহিবে প্রভু হৈলা পঞ্চমুখ
কহিতে কহিতে প্রভুর বাঢ়ে মহাসুখ।

খুলনা জেলায় বুঢ়ন গ্রামে মুসলমানের গৃহে হরিদাসের জন্ম। তার গুরু কে জানা যায় না। কোথা হইতে ভক্তিসম্পদ লাভ করিলেন তাহা কাহাকেও বলেন নাই। অনেকে বলেন অদ্বৈতাচার্য্য তার গুরু। কিন্তু আচার্য্যের সঙ্গে মিলন হইবার পূর্বেই তিনি ছিলেন নামে প্রেমে মাতোয়ারা।

যশোহর জেলার বেনাপোল গ্রামের বনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুটিরে তিনি বাস করিতেন। প্রাতঃস্নান, তুলসী সেবা ও নাম জপ, নামকীর্তন ইহাই ছিল ভজন। মাসে এককোটি নাম করিবেন ইহা ছিল তার ব্রত।

বনগাঁয়ের জমিদার রামচন্দ্রখাঁন গাঁয়ের লোক তাকে ভক্তি না করিয়া

হরিদাসকে ভক্তি করে, ইহা তার অসহ্য। লক্ষহীরা নাম্নী এক বারবনিতাকে পাঠাল হরিদাসের চরিত্র নষ্ট করিতে। লক্ষহীরা পরপর তিন রাত গেল হরিদাসের কুটিরে। তিনি সর্বদাই নামজপে নিমগ্ন। তার মতলব সাধনের সময়ই পাওয়া গেল না। বরং হরিদাসের মুখে নাম শুনিতে শুনিতে লক্ষহীরা অনুতপ্ত হইয়া পায়ে কাঁদিয়া পড়িল। হরিদাস তাকে মন্ত্র দিয়া নিজ ভজন কুটির তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া চাঁদপুর চলিয়া যান। লক্ষহীরা হইল ভিখারিনী কৃষ্ণ দাসী। নিত্য তিনলক্ষ নাম জপ করে।

হরিদাস মুসলমান হইয়া হিন্দুর আচার করে নালিশ গেল মুলুকপতির কাছে। মুলুকপতির হুকুম, হরিনাম ত্যাগ কর। নৈলে বাইশবাজারে বেত মারা হইবে। হরিদাস বলিলেন—"খণ্ড খণ্ড হয়ে দেহ যদি যায় প্রাণ। তভো আমি বদনে না ছড়িব হরিনাম।" ধীর প্রশান্ত নীরব হয়ে বাইশবাজারে বেত্রাঘাত সহ্য করিলেন মরিলেনা। কোন হাহুতাশ করিলেন না। শুধু শ্রীহরিকে বলিলেন যারা মারছে তাদের ক্ষমা করো। হরিদাসের মৃতকল্প দেহ জলে ফেলে দিল। তিনি ভাসিয়া গিয়া ফুলিয়ায় উঠিলেন, আবার ভজন আরম্ভ করিলেন।

হরিদাসের গোফার গর্তে এক সর্প। তার বিষের জ্বালায় সমাগত লোকদের দেহ জ্বলে। হরিদাস সর্পকে বলিলেন "এ গোফায় হয় তুমি থাক নয় আমি থাকি।" ভীষণ বিষধর সর্প। হরিদাসের কথা শুনিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল। নবদ্বীপে সাতপ্রহরিয়া ভাবের সময় প্রভু গৌরসুন্দর দেখাইয়াছিলেন—হরিদাসের পিঠের বেতের দাগগুলো সবই তার পিঠে। নীলাচলে থাকাকালে গৌরসুন্দর—সিদ্ধ বকুলে নিজ সান্নিধ্যে হরিদাসের থাকার ও প্রসাদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে প্রভু বলেছেন, "হরিদাস ছিল পৃথিবীর শিরোমণি। তাহা বিনা রত্নশূন্য হইল মেদিনী।"

জগদানন্দের মান

পণ্ডিত জগদানন্দ মহাপ্রভুর অসীম প্রেমের পাত্র। সকল ভক্তই প্রভুর শ্রীচরণ সমীপে অবনত শিরে থাকেন। প্রভুর কোন কথায় বা কার্য্যে অভিমান করিবার সামর্থ্য নাই। সেই সামর্থ্য জগদানন্দের আছে। তাই ভক্তসমাজ তাকে বলেন সত্যভামার অবতার।

প্রভুর আদেশে লইয়া জগদানন্দ নবদ্বীপ ধামে গিয়াছেন। প্রভু স্বয়ং

জননীকে প্রসাদী বস্ত্র দিয়াছেন, তাহা নিবেদন করিলেন। জগদানন্দ বলিলেন মা, মাঝে মাঝে প্রভু আহার করেন না। বলেন, "আমার নবদ্বীপ হইতে মায়ের রান্না আকণ্ঠ খাইয়া আসিলাম।" মাতা বলিলেন—"বাবা, মাঝে মাঝে ঐরূপ দেখি। মনে হয় আমার নিমাই খাইতেছে। শেষে স্বপ্ন বলিয়া ভাবি। তোমার কথায় বুঝিলাম স্বপ্ন নয় সত্যই।"

প্রভুর শ্রীদেহ নবনী অপেক্ষাও সুকোমল। তাহাতে তৈল মাখেন না। কেমন যেন রুক্ষ রুক্ষ দেখা যায়। জগদানন্দের ইচ্ছা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে তৈল মাখাইবেন। শিবানন্দ সেনের গৃহে কয়েকদিন থাকিয়া মনের মত চন্দনাদি সুগন্ধী তৈল তৈয়ারী করিয়া এক গাগরী ভরিয়া মাথায় করিয়া বহন করিয়া নীলাচল আসিলেন। গোবিন্দের কাছে তৈলভাণ্ড রাখিয়া কহিলেন—"নিত্য প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দিও।" গোবিন্দ প্রভুকে জানাইলেন—জগদানন্দ এক কলসী সুগন্ধী তৈল আনিয়াছেন আপনার জন্য। শুনিয়া প্রভু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—সন্ন্যাসীর তৈলে অধিকার নাই। জগন্নাথ মন্দিরে দিয়া দেও। সেখানে প্রদীপ জ্বলিবে। জগদানন্দের পরিশ্রম সার্থক হইবে। তৈল সম্বন্ধে প্রভুর যে উক্তি তাহা গোবিন্দদাস জগদানন্দকে জানাইয়া দিলেন। জগদানন্দ মৌন থাকিলেন—কিছু বলিলেন না।

দিন দশেক পর গোবিন্দ আবার প্রভুকে তৈলের কথা বলিলেন। শুনিয়া প্রভু ক্রোধে বলিলেন—"'একজন মর্দ্দনিয়া রাখ, তৈল মর্দ্দন করিতে। আমার হবে সর্ব্বনাশ! তোমাদের হবে পরিহাস!"

পরদিন সকালে প্রভু জগদানন্দকে কহিলেন, "তোমার আনা তৈল আমি ব্যবহার করিব না। উহা শ্রীমন্দিরে দেও—প্রদীপ জ্বলিব।" জগদানন্দ তীব্রভাবে বলিলেন—'কে বলিয়াছে আমি গৌড় হইতে তৈল আনিয়াছি।" কথা বলিয়াই ঘর হইতে তৈলের কলসী আনিয়া প্রভুর সামনে আঙ্গিনার মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তৈলপাত্র ভাঙ্গিয়া নিজ গৃহে গিয়া কপাট খিল দিয়া শুইয়া থাকিলেন। একদিন দুইদিন একইভাবে গেল।

তৃতীয় দিনে প্রভু স্বয়ং জগদানন্দের দুয়ারে আসিয়া বলিলেন—"আমি আজ তোমার এখানে ভিক্ষা লইব। উঠিয়া রন্ধন কর।" জগদানন্দ উঠিয়া যথাযথ রন্ধনাদি করিলেন। প্রভু মধ্যাহ্নে আসিলেন। চরণ প্রক্ষালন করিয়া জগদানন্দ বসিতে দিলেন ও আহার্য্য পাতে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—"দুইটি পাত্রে অন্নব্যঞ্জন বাড়। তোমাতে আমাতে একত্র

ভোজন করিব।" জগদানন্দ তাহাতে রাজী হইলেন না। বলিলেন—"তুমি আগে খাও।" খাইতে খাইতে প্রভু বলিলেন—কি উত্তম পাক! আপনি কৃষ্ণ খাইবেন বলিয়া তোমার হস্তে এ উত্তম পাক করাইয়াছেন। জগদানন্দ বলিলেন—যে খাইবে সেই পাককর্ত্তা। বলিতে বলিতে পণ্ডিত দিতে লাগিলেন প্রভুর পাতে—প্রভু ভয়ে ভয়ে খাইতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন—"রাগ করিয়া রাঁধিলে রান্না বেশী ভাল হয়।" জগদানন্দের ভয়ে অন্য দিন হইতে প্রভু আজ দশগুন আহার করিলেন। আর না পারিয়া প্রভু সবিনয়ে বলিলেন—"দশগুণ খাওয়াইছ, এখন সমাধান কর।" প্রভু উঠিলেন। গোবিন্দকে বসাইয়া রাখিলেন—যাহাতে জগদানন্দ প্রসাদ পায়, জগদানন্দ বলিলেন—"গোবিন্দ, তুমি গিয়া প্রভুর চরণসেবা কর। বলিও আমি ভোজনে বসিয়াছি। প্রভু গোবিন্দকে আবার ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"পণ্ডিত খাইতে বসিলে তুমি আসিয়া আমার চরণ সেবা করিও।"

জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত বিশ্বজগতে অতুলনীয়।

প্রভু কলার শরলাতে শয়ন করেন দেখিয়া জগদানন্দ তুলা দিয়া একটি বালিশ তৈয়ার করিয়া দিলেন। প্রভু কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিলেন না। রাগ করিযা বিদ্রূপের ভাষায় বলিলেন—

এখন একখানি ভাল খাট আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥"

তখন স্বরূপ অনেকগুলি কদলীর শুষ্ক পত্র আনিলেন। তাহা নখে চিড়িয়া আরও সূক্ষ্ম করিলেন। তাহা প্রভুর বহির্ব্বাসে ভরিয়া দিয়া দুইটি বালিশ করিলেন। প্রভু তাহা গ্রহণ করিলেন।

"তাতে শয়ন করেন প্রভু, দেখি সবে সুখী।
জগদানন্দ মনে ক্রোধ, বাহিরে মহাদুঃখী॥"

সন্ন্যাস জীবনে প্রভুর এইসব কঠোরতা অতীব শিক্ষাপ্রদ। শাস্ত্রের নিয়ম কখনো লঙ্ঘন করেন নাই। কাহাকেও কিছু শিক্ষা দিতে হইলে আপনি আচরণ করাই উত্তম।

কালিদাসের প্রতি কৃপা

প্রতিদিন প্রভু জগন্নাথ দর্শনে যান। গোবিন্দ যায় প্রভুর সংগে জলের করঙ্গ লইয়া। সিংহদ্বারের উত্তর দিকে কবাটের আড়ে একটি গর্ত্ত আছে।

সেই গর্ত্তে প্রভু নিত্য পাদ প্রক্ষালন করিয়া বাইস পাউস-বাইসটা সিঁড়ি পার হইয়া শ্রী মন্দিরে উঠেন ও জগন্নাথ দর্শন করেন।

গোবিন্দকে মহাপ্রভু নিষেধ করিয়া দিয়াছেন আমার পা ধোয়া জল যেন কেহ গ্রহণ না করে। অতি অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ছল চাতুরী করিয়া কখনও কখনও ঐ চরণামৃত গ্রহণ করে। অন্য কেহ পায় না।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীচরণ প্রক্ষালন করিতেছেন কবাটের আড়ে। একজন বয়স্ক ভক্ত আসিয়া হাত পাতিলেন। এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পাদোদক তিনি পান করিলেন। তারপর প্রভু তাহাকে নিষেধ করিলেন। অন্যের দুর্লভ শ্রীচরনামৃত লাভ করিয়া সে কৃতার্থ হইল।

এই ভক্তটির নাম কালিদাস, রঘুনাথ দাসের খুড়া। এতবড় ভাগ্য সে লাভ করিল কোন সুকৃতির ফলে তাহা বলিতেছি। কালিদাসের সংকল্প ছিল সকল বৈষ্ণবের অধরামৃত গৃহণ করিব। ব্রাহ্মণ হউক, শূদ্র হউক, ছোট হউক, বড় হউক কোন বিচার নাই। বৈষ্ণব পাইলেই তাহার উচ্ছিষ্ট খাইবেন তিনি। নীলাচলে যত বৈষ্ণব আছেন সকলের উচ্ছিষ্ট কালিদাস খাইয়াছেন। একজন মাত্র বাকী, সে হইল ঝড়ু ঠাকুর।

ঝড়ু পরম ভক্ত জাতিতে ভুঁই মালী। কিছুতেই সে নিজের উচ্ছিষ্ট কালিদাসকে দিবে না। কালিদাস প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—ঝড়ু ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট খাবেনই। ঝড়ু ঠাকুর হাটিয়া চলিয়া গেলে কালিদাস সেই স্থান হইতে মাটি তুলিয়া গায়ে মাখিল।

কালিদাস, ঝড়ু ও তাহার পত্নীকে আম ভেট দিয়া আসিলেন। তাহারা আম খাইয়া আটি চুষিয়া গর্ত্তে ফেলিয়া দিল। কালিদাস আড়ালে লুকাইয়া ছিলেন। গর্ত্ত হইতে আমের চোকা ও আঁটি আনিয়া চুষিতে লাগিলেন। চুষিতে চুষিতে প্রেমের উল্লাস হইল। সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি জানেন কালিদাসের বৈষ্ণবে কত প্রীতি। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে কত তাহার মনের নিষ্ঠা। এই গুণ লইয়া প্রভু তাহাকে নিজ পাদোদক দিয়া কৃপা করিলেন।

প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিয়া গম্ভারায় আসিয়া ভোজন করিলেন। তৎপর প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ কালিদাসকে প্রভুর শেষপাত্র দিলেন।

বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা সীমা॥

রঘুনাথ ভট্টের প্রতি কৃপা

তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্ট। গৌরসুন্দর যখন বঙ্গদেশ ভ্রমণে গিয়াছিলেন তখন তপন মিশ্রের প্রতি কৃপা হইয়াছিল। প্রভুর আদেশে মিশ্র কাশীতে বাস করিতেছিলেন। মহাপ্রভু যখন কাশীতে গেলেন তখন তপন মিশ্রের গৃহে নিত্য ভিক্ষা করিতেন। সেই সময় তাহার পুত্র রঘুনাথ প্রভুর দর্শন স্পর্শন পাইয়া ধন্য হইয়াছে। এখন সকল কার্য্য ছাড়িয়া নীলাচলে প্রভুর শ্রীচরণ সান্নিধ্যে আসিলেন।

প্রভু রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিয়া আপন করিয়া লইলেন। প্রভু বলিলেন, "ভাল হইল আইলা—দেখ কমল লোচন।" রঘুনাথ ভট্ট পাককার্য্যে অতি সুনিপুণ—তাহার অমৃতসম রান্না প্রভু গ্রহণ করিতেন। ভট্ট আটমাস প্রভুর সান্নিধ্যে রহিলেন। বিদায় দিবার সময় প্রভু তিনটি কথা বলিয়া দিলেন— "বিবাহ করিও না। বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা কর। বৈষ্ণবের কাছে ভাগবত অধ্যয়ন কর।"

ভট্ট প্রভুর তিনটি আদেশ নিষ্ঠার সহিত পালন করেন। পিতামাতার কাশীপ্রাপ্তির পর উদাসীন হইয়া আবার প্রভুর নিকটে নীলাচলে আসিলেন। আবার অষ্টমাস থাকিলেন। তৎপর প্রভু আদেশ দিলেন "বৃন্দাবন যাও রূপ সনাতনের সঙ্গে থাকিবে। ভাগবত পড়িবে। কৃষ্ণনাম লইবে। কৃষ্ণ কৃপা পাবে।"

ভক্ত প্রভুর আদেশ পালন করিলেন। রূপ সনাতনের সঙ্গ-ফলে একজন শ্রেষ্ঠ ভাগবত পাঠক হইলেন। পাঠে সাত্বিক বিকার হইত। তাহার কণ্ঠ ছিল কোকিলের মত। সঙ্গীতে অধিকার ছিল। এইসব মিলিয়া তাহার ভাগবত ব্যাখান মধুময় হইল। সকলই প্রভুর অসীম করুণার শক্তিতে। মহাপ্রভুর আদরের গোস্বামিগণের মধ্যে তিনি অন্যতমরূপে পরিগণিত হইলেন।

গজপতির প্রতি কৃপা

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের একান্ত ইচ্ছা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করেন তার মধুর নৃত্যকালিন অবস্থায় কিন্তু প্রভু কিছুতেই দেখা দেন না। রাজা সার্ব্বভৌম প্রমুখ ভক্তগণকে বলিলেন—তোমরা আমাকে দর্শন করাও, প্রভুর অগোচরে।

যখন প্রভু বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নৃত্য করেন তখন দর্শনের ভাগ্য দেও। এই যুক্তি স্থির হইল।

দৈবে একদিন গৌরহরি আপন মনে একাকী নৃত্য করিতেছেন। রাজা সংবাদ পাইয়া একাকী আড়ালে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। রাজা দেখিলেন অদ্ভুত ভাবাবেশ। শ্রীনয়নে অবিশ্রাম ধারাপাত হইতেছে। ক্ষনে ক্ষনে কম্প, স্বেদ, রোমাঞ্চ বৈবর্ণ্য দেখা দিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে ভীষণ ভাবে আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া যান। মাঝে মাঝে হুঙ্কার গর্জ্জন করেন। কখনও আকুল হইয়া রোদন করেন। সোণার দণ্ডের মত হাতদুটি উর্দ্ধে তুলিয়া কত ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করেন।

এই প্রাণমনোহারী নৃত্য দর্শন করিয়া গজপতি প্রতাপরুদ্র পরম আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু একটি ব্যাপারে রাজার মনটা একটু কেমন কেমন হইল। প্রভুর নাসিকায় দিব্যধারা বহিতেছিল। শ্রীমুখ হইতে লালা পড়িতেছিল। ধূলায়, লালায়; নাসিকাধারায় সকল অঙ্গ ব্যপ্ত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া রাজার চিত্ত কেমন একটা সন্দেহের উদয় হইল।

রাজা গিয়া গৃহে শয়ন করিয়াছেন। নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন। রাজা যেন মন্দিরে জগন্নাথের সম্মুখে গিয়াছেন দেখেন কি জগন্নাথের সর্ব্বাঙ্গ ধূলাময়। দুই চোখে গঙ্গাধারা। নাসিকায় জল পড়ে। মুখের লালা ঝরে। এইসব মিলিয়া শ্রীদেহ ভিজিয়া যাইতেছে।

রাজা স্বপ্নেই ভাবিতেছেন জগন্নাথের একি খেলা। রাজা জগন্নাথকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করিলেন। জগন্নাথ বলিলেন—তোমার দেহ কস্তুরী কর্পূর গন্ধ বাসিত, আমার শরীর ধূলালালাময়। ইহা স্পর্শ করা তোমার যোগ্য নহে। একটু পরেই রাজা দেখেন জগন্নাথের সিংহাসনেই ধূলালালাময় শ্রীচৈতন্যদেব বসিয়া আছেন। স্বপ্ন ভাঙ্গিল—

"আপনে শ্রীজগন্নাথ চৈতন্য গোসাঞি।
রাজা জানিলেন ; ইথে কিছু ভেদ নাই॥

শ্রীঅদ্বৈত গৃহে ভিক্ষা

একদিন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে নিজ গৃহে ভিক্ষার্থ আমন্ত্রণ করিলেন। স্বয়ং অদ্বৈত সীতাদেবীর সহিত রন্ধন করিলেন, গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে

যে সকল দ্রব্য প্রভুর জন্য আনিয়াছিলেন তাহা সব পরিপাটী করিয়া রন্ধন করিলেন।

আচার্য্যের অন্তরের ইচ্ছা প্রভু সকল দ্রব্য গ্রহণ করেন। প্রভু যদি মোহন্ত সন্ন্যাসী গোষ্ঠী সঙ্গে লইয়া আসেন তবে তো ভাগের ভাগ কিছুই খাবেন না। যদি প্রভু একা আসেন তাহা হইলে আমার মনের কামনা সিদ্ধ হয়। এই কামনা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না।

হঠাৎ মধ্যাহ্ন কালে একটা ভীষণ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অসম্ভব বাতাস বৃষ্টি শিলাপাত হইল। ঝড বন্যায় কে কোনদিকে থাকিল তাহা ঠিক রইল না। অদ্বৈতচার্য্য সকল সেবার দ্রব্য সাজাইয়া সবার ওপর তুলসী দিয়া প্রভু যাহাতে একাকী আসেন সেইজন্য ধ্যান করিতে বসিলেন।

"সত্য গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের ইচ্ছাময়
একেশ্বর মহাপ্রভু হইলা বিজয়॥

আচার্য্য পরমাদন্দে প্রভুকে সেবা করাইলেন। অদ্বৈত যত দ্রব্য দিলেন সবই প্রভু খাইলেন। আচার্য্যের বাঞ্ছা পূরণ হইল। মধুর হাসিয়া প্রভু বলিলেন—

"প্রভু বোলে আর কেন লুকাও আচার্য্য
যত ঝড় বৃষ্টি সব তোমারি যে কার্য্য॥

সীতানাথ, তুমি হারিলা

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে গম্ভীরায় বসিয়া আছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য আসিয়া প্রভুকে নমস্কার করিয়া সম্মুখে বসিলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—আচার্য্য এখন কোথা হইতে আসিলা। আচার্য্য বলিলেন—জগন্নাথ জীউর মন্দির হইতে আসিলাম। শ্রীবদন দর্শন করিয়া পাঁচ সাত বার প্রদক্ষিন করিয়া তোমার কাছে আসিলাম।

শুনিয়াই প্রভু রসের বদনে মধুর হাসিয়া হাতে তালি দিয়া কহিলেন—

"আচার্য্য তুমি হারিলা হারিলা।"

আচার্য্য একটু বিস্মিত হইয়া শুধাইলেন—"প্রভু কী হারাইলাম।" কোন সম্পত্তি তো নাই হারাব কি?" প্রভু বলিলেন যখন তুমি প্রদক্ষিণ করিতে জগন্নাথের পিছন দিকে গেলা তখন তো শ্রীবদন চন্দ্র দেখিতে পাইলা না। শ্রীবদন

দর্শনের যে সুভাতিশয্য তাহা হইতে বঞ্চিত হইলা। আমি যখন দেখি দেখিতেই থাকি। আর কোনদিকে চক্ষু যায় না।

"আমি যতক্ষন দেখি দেখি জগন্নাথ
আমার লোচন আর না যায় কোথাত।
কি দক্ষিণে কি বা বামে কিবা প্রদক্ষিণে
আর নাহি দেখো জগন্নাথ মুখ বিনে।"

শুনিয়া আচার্য্য গোসাঞি করজোড করিয়া কহিলেন এ ব্যাপারে তোমার কাছে চিরদিন হারিয়াছি, হারিব। তুমি যা বলিলে এ কথা বলার মত অধিকারী এই জগতে তুমি ছাড়া আর দ্বিতীয়টি নাই।

এ কথার অধিকারী আর ত্রিভুবনে
সত্য কহিলাঙ এই, নাহি তোমা বিনে॥

নিতাই চাঁদের প্রতি আবেদন

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নিভৃতে শ্রীনিতাই সুন্দরকে বলিলেন—শ্রীপাদ, তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে চলিয়া যাও। তুমি না গেলে আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইয়া যায়। আমার প্রতিজ্ঞা জানতো—

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমি নিজমুখে।
মুর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে॥

তুমিও যদি আমার মতো মুনিধর্ম্ম ধরিয়া নীলাচলে থাক, তাহা হইলে আমার প্রতিজ্ঞা কি উপায়ে পূর্ণ হইবে। তুমি যদি আমার বাক্য সত্য করিতে চাও তাহা হইলে অবিলম্বে গৌডদেশে বিজয় কর।

মুর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন!

আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিজগণসহ গৌডদেশে যাত্রা করিলেন। তার প্রিয়বর্গ রামদাস, গদাধর দাস ; রঘুনাথ বেদওঝা, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত—নিতাইগতপ্রাণ এই ভক্তগণ-শ্রীশ্রী-নিতাইচাঁদের সঙ্গে গৌড দেশে বিজয় করিলেন। শ্রীনিতাইচাঁদ গৌর প্রচার আরম্ভ করলেন।

গৌড় দেশে নিত্যানন্দ আসিলে গায়ক মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, বাসু

ঘোষ—তিন ভাই আসিয়া যোগ দিলেন। অবধূত নিতাইচাঁদের নৃত্যকালে পদভরে ধরণী টলমল করে। নাচিতে নাচিতে যার প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করেন "সে-ই প্রেমে ঢলিয়া পড়য় পৃথিবীতে।"

পরিপূর্ণ প্রেমরস প্রভু নিত্যানন্দ
সংসার তরিতে করিলেন শুভারম্ভ।

বাপ পুণ্ডরীক

নবদ্বীপ ধামে যখন লীলা বিলাসে মত্ত ছিলেন তখন একদিন গৌরহরি "বাপ পুণ্ডরীক, বাপ পুণ্ডরীক" বলিয়া ডাকিয়া ছিলেন। ভক্তগণ কেহ ঐ ডাকের অর্থ বুঝেন নাই। পরে বুঝিয়াছিলেন বৃষভানুরাজার অবতার পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে প্রভু শ্রীরাধার ভাবে বাপ বাপ বলিয়া ডাকিয়াছেন।

বিদ্যানিধির নিবাস চট্টোগ্রাম জেলার মেখল নামক স্থানে। তিনি প্রভুর আকর্ষণে নবদ্বীপ আসেন ও এক ভক্তগৃহে গোপনে থাকেন। মুকুন্দের বাড়ীও ঐ একই স্থানে। তিনি বিদ্যানিধিকে চিনিতেন। তিনি একদিন গদাধরকে লইয়া বিদ্যানিধির দর্শনে গেলেন।

বিদ্যানিধির বসন ভূষণ শয্যা দাসদাসী মালা সুগন্ধী আতরের ঘটা দেখিয়া গদাধরের মনে অশ্রদ্ধা হইল। গদাধরের অন্তর বুঝিয়া মুকুন্দ একটা ভাগবতের শ্লোক উচ্চারণ করিলেন—শ্লোকটি পুতনা মোক্ষন লীলার। লীলাকথা বলিয়া শুকদেব মন্তব্য করিয়াছেন। করুণাময় প্রভু পুতনার মত পাপীয়সীকেও বৈকুণ্ঠে ধাত্রী গতি দিতে পারেন। সেই পাদপদ্ম ছাড়া আর কার স্মরণ লইব।

শ্লোক শুনিয়া বিদ্যানিধি ভাবোন্মাদ হইলেন। "কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম" বলিয়া ধূলায় গড়াইয়া কান্দিতে লাগিলেন। সমস্ত ঐশ্বর্য্যময় সজ্জা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। এতবড় বৈষ্ণব দেখিয়া গদাধর পূর্ব্বকৃত অশ্রদ্ধার জন্য অনুতপ্ত হইলেন। প্রভুকে জানাইলেন, প্রভু বলিলেন, "গদাধর পুণ্ডরীকের শিষ্যত্ব গ্রহণ কর।" গদাধর তাহাই করিয়াছিলেন।

নীলাচলে আসিয়া গদাধর বলিলেন, 'প্রভু আমি আমারি ইষ্টামন্ত্র একজনকে বলিয়াছিলাম। তদবধি আমার আরকিছু স্ফূর্ত্তি হয় না। তুমি আবার আমাকে সেই মন্ত্র দান কর। "প্রভু বলিলেন"—তোমার গুরু বিদ্যানিধি শীঘ্রই আসিতেছেন। যাহা করিতে হয় তাহাই করিবেন।

বিদ্যানিধি আসিলেন। "বাপ আইলা-বাপ আইলা" প্রভু গৌরহরি উল্লসিত হইলেন। প্রভুর ইচ্ছায় গদাধর পুনরায় ইষ্টমন্ত্র তাঁহার নিকট শুনিয়া লইলেন।

প্রেমনিধির শাস্তি

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৃষভানু রাজার অবতার। গদাধর শ্রীরাধা ভাবময়। বর্ষাণে পিতা-কন্যা—নদীয়ায় হইলেন গুরু-শিষ্য। ভক্তেরা বিদ্যানিধিকে বলেন প্রেমনিধি। প্রেমনিধি স্বরূপ দামোদরের বন্ধু, নবদ্বীপ হইতে বন্ধুত্ব। একদিন দুইবন্ধু জগন্নাথের 'ওঢ়ল ষষ্ঠী' যাত্রা দর্শন করিতেছেন। জগন্নাথকে সেবকরা অধৌত পাণ্ডুয়া বস্ত্র পরাইল দেখিয়া প্রেমনিধি দোষদৃষ্টি করিলেন।

রাত্রে স্বপ্নে জগন্নাথ বলরাম দুইভাই আসিলেন। দুইভাই প্রেমনিধির দুইগালে দুই চড় দিয়া কহিলেন—

আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্ব্বন্ধ।
তাহাতেও ভাব অনাচারের সম্বন্ধ॥

স্বপ্নেই প্রেমনিধি "অপরাধ ক্ষমা কর" বলিতে লাগিলেন। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখেন শ্রীহস্তের চড়ের দশা দুই গালে।
সকালে স্বরূপ দামোদর আসিয়া ডাকিলেন—এত বেলা ওঠ না কেন—চল জগন্নাথ দর্শনে যাই। শ্রীপ্রেমনিধি বলিলেন

ভালদিন হৈল মোর আজি সুপ্রভাত।
মুখ কপোলের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাত॥

পুণ্ডরীক প্রেমনিধির মত এই প্রেমভক্তির প্রভাব, কেহ কোনদিন কোনও কালে শোনে নাই। এই জন্যই তো স্বয়ং প্রভু গৌরচন্দ্র ইঁহাকে উচ্চকণ্ঠে—"বাপ বাপ" বলিয়া ডাকিতেন।

গৌর গৌরভক্তের মহিমা বিশ্বে জয়যুক্ত হউক।

দেবদাসীর গান

একদিন প্রভু যমেশ্বর টোটা যাইতেছেন। হঠাৎ শুনিলেন গুর্জ্জরীরাগে সুমধুর কণ্ঠে কেহ গীতগোবিন্দ গান করিতেছে। দূরে গান শুনিয়াই প্রভুর

ভাবাবেশ হইল। অমনি যে গান করিতেছে তাহার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য প্রভু বেগে ধাবমান হইলেন। সোজা চলিয়াছেন পথ বিপথ জ্ঞান নাই। পথে সিজের কাঁটা পায়ে ফুটিল। গায়ে ফুটিল, রক্ত বাহির হইল প্রভুর বোধ নাই। গীত-গোবিন্দের মধুর পদ প্রভুকে পাগল করিয়াছে।

গোবিন্দ পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে। ধাইয়া গিয়া প্রভুকে ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, প্রভু, যিনি গান করিতেছেন উনি দেবদাসী। স্ত্রীলোক গান করিতেছেন শুনিয়া প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিল। প্রভু বলিলেন, "গোবিন্দ, জীবন রক্ষা করিয়াছ! স্ত্রীলোক স্পর্শ হইলে আমার মৃত্যু হইত।"

আদিবশ্যা নারী

একদিন গৌরসুন্দর জগন্নাথ দেব দর্শন করিতেছেন। গরুড় স্তম্ভের পাছে দাঁড়াইয়া প্রভু দেখেন। গরুড় ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। ভক্ত লঙ্ঘন করিয়া প্রভু দেখেন না। গরুড় স্তম্ভ হইতে জগন্নাথ বিগ্রহের আসন বেশ দূরে। এই ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াইয়া সহস্র সহস্র লোক দর্শন করে।

একজন উড়িষ্যা বাসিনী মহিলা ভিড়ের মধ্যে জগন্নাথের বদন দেখিতে না পাইয়া গরুড়ের উপর চড়িয়া এক পা প্রভুর স্কন্ধের উপর দিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ তাহা দেখিয়া আস্তেব্যস্তে সেই মহিলাকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন গোবিন্দকে বলিলেন "উহাকে নামাইও না। আদিবস্যা এই স্ত্রীলোকটিকে কিছু বলিও না। করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন।"

খানিকক্ষণ পরে সেই মহিলা ভূমিতে নামিলেন। মহাপ্রভুর পায়ে তিনি প্রণাম করিলেন। প্রভু বলিলেন—"এত আর্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা।" ইহার দেহমন প্রাণ জগন্নাথে আবিষ্ট। আমার কাঁধের উপর পা দিয়াছে তাহা উহার জ্ঞান নাই।

"অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আমার বা হয়॥"

দিব্যোন্মাদ ভাব

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতেছেন। দূর হইতে চটক পর্ব্বত দেখিলেন। দেখিয়াই গোবর্দ্ধন গিরি বলিয়া ভ্রম হইল। তখনই সেইদিকে ছুটিলেন।

প্রভুর মুখে একটি ভাগবতের শ্লোক। শ্লোকটিতে গোবর্দ্ধন গিরিরাজের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

অবস্থা দেখিয়া গোবিন্দ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। কিন্তু কিছুতেই নাগাল পাইতেছেন না। প্রথমে প্রভু বায়ুগতিতে ছুটিয়াছেন। তারপর হঠাৎ স্তম্ভ ভাব আসিল। তখন আর চলিতে শক্তি নাই। পড়িয়া গেলেন।

প্রভুর শ্রীঅংগের প্রত্যেকটি লোমকূপে মাংস ব্রন্ধের আকার ধারন করিয়াছে। তাহার উপর কদম্বফুলের মত রোমাঞ্চ উঠিয়াছে। প্রত্যেকটি লোমকূপে রক্তের ধারা ঘামের মত প্রবাহিত হইতেছে। কণ্ঠে ঘর ঘর শব্দ। কোন বর্ণ বা বাক্যের উচ্চারণ হইতেছে না। দুই চক্ষে গঙ্গার স্রোতের মত অশ্রুধারা ঝরিতেছে। শ্রীঅঙ্গ শঙ্খের মত সাদা হইয়া গিয়াছে। কদলী পত্রের মত কাঁপিতেছেন।

গোবিন্দ নিকটে আসিয়াছেন। কি করিবেন। দিশাহারা হইয়া করঙ্গের জল সর্ব্বাঙ্গে সিঞ্চন করিতেছেন। বহির্বাস দিয়া সারা গায়ে বাতাস করিতেছেন। তখন স্বরূপ দামোদর, পণ্ডিত গদাধর, জগদানন্দ, রামাই, নন্দাই, পুরী—ভারতী, খঞ্জ ভগবানাচার্য্য সকলেই সমুদ্রতীরে ছুটিয় আসিয়াছেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে সুদীপ্ত অষ্ট সাত্বিক ভাব অতি আশ্চর্য্য ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ আর কি করিবেন। সকলে উচ্চ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ শীতল জল দ্বারা শ্রীদেহ মার্জ্জন করিয়া দিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া কীর্ত্তন হইতে হইতে তাহার মধ্যে প্রভু 'হরিবোল' হরিবোল বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিলেন। প্রভু স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন —"গোবর্দ্ধন হইতে আমাকে এখানে কে আনিল?" কৃষ্ণের মধুর লীলা দেখিতে পাইয়া আবার হারাইলাম। আমি গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলাম। গোবর্দ্ধনের চারিদিকে ধেনু চরিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইলেন। বেণুধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধাঠাকুরানী ছুটিয়া আসিলেন। আহা! কি যে তাহার রূপ— কি যে তাহার ভাব বর্ণনা করা যায় না। শ্রীরাধাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ এক গিরি-কন্দরে প্রবেশ করিলেন। সখীগণ ফুল তুলিতে গেলেন। সেই সময় তোমরা আমাকে ধরিয়া এখানে আনিলে। শ্রীকৃষ্ণের লীলা পাইয়াও দেখিতে পাইলান না। প্রাপ্ত রত্ন হারাইলাম। কি দুঃখ!

দিব্যোন্মাদ—(দীর্ঘাকৃতি ধারনে)

গম্ভীরার ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভু শয়নে আছেন। স্বরূপ বহির্দ্দারে শুইয়া আছেন। সমস্ত রাত্রিই উচ্চ করিয়া নাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন। হঠাৎ কীর্ত্তনের আওয়াজ না পাইয়া স্বরূপ কবাট খুলিলেন। দেখিলেন প্রভু ঘরে নাই। অথচ, তিনদিকে তিন কবাট বন্ধ আছে।

সকলে চিন্তিত হইয়া চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিলেন। অতি ব্যাকুলভাকে খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ পাইলেন সিংহদ্বারের উত্তর দিকে। একটি জায়গায় প্রভু পড়িয়া আছেন।

শ্রীদেহের কি অবস্থা বর্ণনা করিবার উপায় নাই। প্রভুর দেহ পাঁচ যাত হাত দীর্ঘ। চেতনাহীন দেহ। নাসিকায় শ্বাস বহে না। এক একখানা হাত তিন তিনহাত লম্বা। অস্থি সন্ধি সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া আছে। হাত পা কটীর অস্থি সন্ধিগুলি এক এক বিঘৎ ফাঁক হইয়া গিয়াছে। উপরে চর্ম্মমাত্র আছে। সন্ধিগুলি দীর্ঘ হইয়া রহিয়াছে। মুখে ফেনালালা পড়িতেছে। ঊর্দ্ধনয়নে প্রভু ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া আছেন। সর্ব্বাঙ্গে পুলক কদম্ব। দেখিয়া সকল ভক্তের প্রাণ বেদনায় কাঁদিয়া উঠিল। দেখিয়া সকল ভক্তের "দেহ ছাড়ে প্রাণ।" স্বরূপ গোসাঞি তখন উচ্চ করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা। হরিবোল বলিয়া প্রভু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে যথাযোগ্য পূর্ব্ববৎ শরীর হইল।

দিব্যোন্মাদ ভাব—(কুষ্মাণ্ডাকৃতি ধারনে)

শ্রীশ্রীপ্রভু গৌরহরির এখন সর্ব্বদাই উন্মাদের মত অবস্থা। কখনও কখনও প্রেমের আবেশে প্রলাপ উক্তি করেন। একদিন রায় রামানন্দ ও স্বরূপেয় সঙ্গে প্রভু কৃষ্ণকথায় অর্দ্ধরাত্রি কাটাইলেন। যখন প্রভু যে ভাবের উদয় হয়-সেই ভাবানুরূপ শ্লোক বা পদাবলী, রায় রামানন্দ গান করেন। কখনও চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শ্রী গীতগোবিন্দের মধুর পদ শুনান। মাঝে মাঝে প্রভু নিজেই শ্লোক বলেন। আবার বিলাপ করিয়া শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যান করেন।

অর্দ্ধরাত্রি কটিয়া গিয়াছে। প্রভু শয়ন করিয়াছেন। স্বরূপ, রামরায় স্ব স্ব গৃহে বিশ্রাম করিতেছেন। গম্ভীরার দুয়ারে গোবিন্দ শয়ন করিয়াছেন। হঠাৎ প্রভু কৃষ্ণের বেনুনাদ শুনিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন। তিন দুয়ারের কবাট বন্ধ। যেমনি ছিল তেমনি আছে।

সিংহদ্বারের দক্ষিণে তৈলঙ্গী গাভীগুলি থাকে। প্রভু সেই পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাইয়া কবাট খুলিয়া স্বরূপকে ডাকিলেন। তিনি ভক্তগণ লইয়া দেউটি জ্বালিয়া প্রভুকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ পর প্রভুকে গিয়া পাইলেন। তৈলঙ্গী গাভীগণের মধ্যে প্রভু পড়িয়া আছেন। প্রভুর অবস্থাটি কি অদ্ভুত। হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। প্রভুর দেহটি একটি কুষ্মাণ্ড ফলের আকার ধারণ করিয়াছে। শ্রীমুখ বহিয়া ফেনা পড়িতেছে। সর্ব্বাঙ্গে পুলকাবলী শোভা পাইতেছে। দুইটি চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। গাভীগুলি চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গের মধুর গন্ধ গ্রহণ করিতেছে।

সকলের অনেক যত্নেও প্রভু প্রকৃতিস্থ হইলেন না। প্রভুকে তুলিয়া গম্ভীরায় আনা হইল। উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। অনেকক্ষণে প্রভুর চেতনা ফিরিয়া আসিল। চেতনা আসিলে হস্তপদ বাহির হইয়া আসিল। শরীর পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য হইল।

প্রভু কহিলেন, "স্বরূপ, তোমরা আমাকে কোথায় আনিয়াছ। আমি শ্যামসুন্দরের বেনুধ্বনি শুনিয়া বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম। ধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধা ঠাকুরাণী কুঞ্জে ছুটিয়া আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণসহ কুঞ্জগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহার পাছে পাছে আমি প্রবেশ করিলাম। কত লীলা বিহার, কত হাস্য পরিহাস আস্বাদন করিলাম। ঠিক সেই সময় তোমরা সকলে কোলাহল করিয়া জোরপূর্ব্বক আমাকে এখানে লইয়া আসিলে। আহা! সেই ধ্বনি-সেই অমৃতবাণী আর শুনিতে পাইলাম না। আমার কি দুর্ভাগ্য!"

দিব্যোন্মাদ ভাব—(জালিয়ার জালে)

আর একদিন প্রভু আইটোটা হইতে সমুদ্র দর্শন করিয়া যমুনা ভ্রমে ছুটিলেন। কোনদিক হইতে কোনদিকে গেলেন ভক্তগণ কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। প্রভু কোথায় গেলেন-মন্দিরে গেলেন-অন্য কোন দেবালয়ে গেলেন—গুণ্ডিচার দিকে গেলেন ; চটক পর্ব্বকে গেলেন কোনারকের দিকে গেলেন—কোনদিকে কোথায় গেলেন—তবে কি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন —প্রিয়গণ পাগলের মত এদিক ওদিক সেদিক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রিশেষ হইয়া আসিল। সকলেই ভাবিলেন প্রভু অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। সকলেই বিষাদে বিহ্বল। স্বরূপ জনকতক ভক্ত লইয়া সমুদ্র তীরে পূর্বদিকে চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ দেখেন এক জালিয়া কাঁধে জাল লইয়া আসিতেছে। সে হরি হরি বলিয়া কখনও হাসিতেছে কখনও কাঁদিতেছে কখনও নাচিতেছে। স্বরূপ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এদিকে কোন মানুষ দেখিয়াছ?"

জালিয়া বলিল—না মানুষ দেখি নাই। জাল বাহিতে একটি মরা দেহ আমার জালে উঠিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া আমার মনে ভয় লাগিয়াছে। সে একটা ভূত হইবে। তাহার গায়ে আমার গা স্পর্শ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভূত আমার মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। আমার শরীর কাঁপিতেছে—চক্ষে জল পড়িতেছে। কোন ব্রহ্মদৈত্য হইবে। কারণ চেহারাটি অদ্ভুত। দেহটা দৈর্ঘে পাঁচ সাত হাত। এক একটি হাত তিন তিন হাত। অস্থি সন্ধিগুলি ছুটিয়া গিয়াছে। চামড়া নডবড করিতেছে। মরার মত পড়িয়া আছে কিন্তু মুখে গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে।

স্বরূপ গোসাঞি বুঝিলেন—এ আর কেহই নহে। প্রভুই হইবেন। জালিয়াকে বলিলেন—"আমি ওঝা, ভূত ছাড়াইয়া দিব।" এই বলিয়া তাহার পিঠে তিন চাপড় মারিয়া বলিলেন "ভূত পালাইয়াছে। এখন দেখাইয়া দাও। যাহাকে তুমি জলে পাইয়াছ সে ব্রহ্মদৈত্য নয়—মহাপ্রভু।" জালিয়া বলিল—না প্রভু নহে। আমি তাহাকে বহুবার দেখিয়াছি। এ তাহার রূপ নহে। একটা বিকৃত আকার। "স্বরূপ বলিলেন,—উহা তাহার প্রেমের বিকার। তুমি তাহাকে দেখাইয়া দেও।"

জালিয়া তখন মহাপ্রভুকে দেখাইয়া দিল। অতি দীর্ঘকৃতি। জলে দেহ শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ধরিয়া আনিবার উপায় নাই কারন অতি শিথিল। তখন সকলে মিলিয়া বহির্বাসে শোয়ান হইল। বালুকা ছড়ান হইল। শুষ্ক কৌপীন পরান হইল। সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

কতক্ষণে প্রভুর কর্ণে কীর্ত্তনের ধ্বনি প্রবেশ করিল। হুঙ্কার করিয়া প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলেন। উঠিতেই শ্রীদেহ স্বাভাবিক হইল। তখন অর্দ্ধবাহ্য দশায় প্রভু কথা বলিতে লাগিলেন। অর্দ্ধবাহ্যদশায় প্রভু আকাশের দিকে তাকাইয়া প্রলাপোক্তি করেন—ভক্তগণ শুনিতে থাকেন।

আমি দেখিলাম ব্রজেন্দ্র নন্দন সখাগণ সঙ্গে জলক্রীড়া করিতেছেন। তীরে

থাকিয়া এক সখী আমাকে জলক্রীড়ারঙ্গ দেখাইতে লাগিলেন। দেখিলাম—শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে লইয়া যমুনার জলে অবগাহন করিলেন। প্রথমে পরস্পর জল ফেলাফেলি করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ গোপীদের দেহে, গোপীরা কৃষ্ণের দেহে জল ছুড়িতে লাগিলেন। 'জলাজলির' পর 'করাকরি'। পরস্পর হাত ধরিয়া টানাটানি, গোপী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ গোপীর। "করাকরির পর 'মুখামুখি' কৃষ্ণ গোপীমুখে চুম্বন করেন, গোপী কৃষ্ণ মুখে চুম্বন করেন। "মুখামুখি"র পর হৃদাহৃদি। কৃষ্ণ নিজ বক্ষ গোপীর বক্ষে লগ্ন করেন। গোপী নিজ বক্ষ কৃষ্ণ বক্ষে লগ্ন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে লইয়া অগাধ জলে নিয়া ছাড়িয়া দেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের গলা ধরিয়া জলে ভাসেন। যত গোপী তত কৃষ্ণ লইয়া খেলা করেন। প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বে এক কৃষ্ণ। স্বর্ণ পদ্ম গোপী দেহ। নীল পদ্ম কৃষ্ণ দেহ। তাহাতে পুনঃ পুসঃ ঠেকাঠেকি হইতেছে।

গোপীগণের বক্ষোজ কৃষ্ণ স্পর্শ করিতে চাহেন। গোপী হাত দিয়া তাহা ঠেকাইয়া রাখেন। কি যে অপরূপ দৃশ্য। রসের সমুদ্র যেন উথলিয়া উঠে, একমনে এই লীলা দর্শন করিতেছিলাম। তখন তোমরা আমাকে ডাকিলে। আর সব কোথায় চলিয়া গেল। অহো!

"কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন, কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ,
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা॥

দিব্যোন্মাদ দশা—হা হা কৃষ্ণ তুমি গেলি কতি

প্রভু সর্ব্বদা বিরহিনী রাধারাণীর ভাবে বিভোর, গম্ভীরার মধ্যে শয়ন করিয়া প্রভুর মন সর্ব্বদা বিরহ তাপে জর্জ্জরিত। কেবল হাহাকার "কাঁহা কৃষ্ণ; তুমি গেলি কতি।"

চক্ষে একবিন্দু নিদ্রা নাই। কৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল হইয়া গম্ভীরার ভিতরে মুখ ঘষিতে থাকেন। মুখ, গাল, নাক ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। রক্তোধারা বহিতে থাকে। কি যে ঘটিতেছে নিজে জানেন না।

যখন গোঁ গোঁ শব্দ করেন তখন স্বরূপ দীপ জ্বালিয়া ঘরে আসিয়া দেখেন—শ্রীবদনের কি মর্ম্মান্তিক দৃশ্য। প্রভুকে শয়ান করান। স্বরূপ জিজ্ঞাসা করেন—"মুখের অবস্থা কি রূপে এমন হইল? প্রভু বলেন "আমি উদ্বেগে

ঘরে রহিতে পারি না। দুয়ার খুঁজিয়া পাই না। খুঁজিতে খুঁজিতে মুখ দেয়ালে চারিদিকে লাগে। তাই অমন অবস্থা। ক্ষত হইয়াছে। রক্ত পড়িতেছে। তখন জানিতে পারি নাই।

স্বরূপ অনেক ভাবনা করিয়া এক বুদ্ধি করিলেন। শঙ্কর পণ্ডিতকে প্রভুর সংগে শোয়াইলেন। শঙ্কর প্রভুর শ্রীচরণতলে শয়ন করিলেন। তাহার উপর প্রভু শ্রীচরণ প্রসারণ করিলেন। শঙ্করের নূতন নাম হইল প্রভুর পাদোপাধান।

শঙ্কর প্রভুর শ্রীচরণ সংবাহন করেন। প্রভু একটু নিদ্রা গেলে শঙ্কর শ্রীচরণতলে শয়ন করেন। শঙ্করের গায়ের কাপড সরিয়া গেলে। প্রভু উঠিয়া নিজের কাঁথা তাহার গায়ে জড়াইয়া দেন। শঙ্করের ভয়ে প্রভু আর যখন তখন উঠিয়া বাহিরে যাইতে পারেন না বা দেয়ালে মুখপদ্ম ঘষিতে পারেন না।

শিক্ষার্থক আস্বাদন

নীলাচল লীলায় বিপ্রলম্ভ রসের আস্বাদনই প্রধান। সর্ব্বদাই কৃষ্ণবিরহে বিহ্বল গৌরসুন্দর। স্বরূপ আর রায় রামানন্দ সঙ্গে দিনরাত্র রসগীত আস্বাদন করেন। কি উপায় কৃষ্ণ পাব ইহাই সর্ব্বদা ভাবনা। কিছুতেই কৃষ্ণ পাব না এই নিরাশায় প্রভু ম্রিয়মাণ। হঠাৎ মনে হইল—না, কৃষ্ণ পাবার উপায় তো আছে। ভাগবত শাস্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন—"যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি-সুমেধসঃ।" সংকীর্ত্তন যজ্ঞে যে কৃষ্ণের আরাধনা করে সেই সুমেধা তাঁহার চরণ লাভ করে। ভাগবতের এই শ্লোক মনে পডিতেই প্রভুর হর্ষোদয় হইল—তাহা হইলে কৃষ্ণ পাব, নিশ্চয়ই পাব! অতীব হর্ষান্বিত চিত্তে স্বরূপ রাম-রায়কে সম্বোধন করিয়া প্রভু বলিয়া উঠিলেন—

"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।"

নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা সকল অনর্থের নাশ হয়।
নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা সকল প্রকার শুভের উদয় হয়।
নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের উল্লাস হয়।

এই কথা বলিয়াই একটি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন—

'চেতোদর্পনমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচান্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনণং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনাকারী, মল নাশক। এই সংসার মহাদাবাগ্নির মত তাপ দেয়। কৃষ্ণ কীর্ত্তন সেই তাপ নির্ব্বাপন করে। কুমুদ ফুটে চাঁদের আলোকে। কৃষ্ণ কীর্ত্তনের আলোক সকল প্রকার মঙ্গল রূপ কুমুদের প্রস্ফুটনে সহায়কারী। বিদ্যারূপ বধূর জীবন স্বরূপ কৃষ্ণ কীর্ত্তন। উহা আনন্দ সমুদ্রের বর্দ্ধক, নামের প্রতিটি অক্ষর অমৃতাস্বাদনদায়ক। সকল আত্মার স্নিগ্ধতা আপাদক। সেই শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত থাকুক।

নামের শক্তিতে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। প্রেমামৃতের আস্বাদন হয়। কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়। কৃষ্ণ সেবামৃত সাগরে নিমজ্জিত হওয়া যায়। এত শক্তি নামের —বলিতে বলিতে আর একটি শ্লোক শ্রীমুখ হইতে উচ্চারিত হইল—

নাম্নামকারী বহুধা নিজসর্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি,
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

শ্রীহরির নাম অনেক। যাহার যে রকম ভাব ও বাঞ্ছা সেই রকম ভাবের অনেক নামের প্রকাশ করিয়াছেন শ্রীহরি। প্রত্যেক নামেই সর্ব্বশক্তি অর্পন করিয়াছেন। নামে কালাকাল নিয়ম নাই। শুচি অশুচি বিচার নাই। যখন ইচ্ছা, যে ভাবে ইচ্ছা সেইভাবেই নাম করা যায়। তোমার এত করুণা—তথাপি আমার দুর্ভাগ্য এমন নামেতে আমার জীবকুলের অনুরাগ হইল না। কিভাবে নাম করিলে নামের সকল ফল পাওয়া যায় তাহা বলিলেন তৃতীয় শ্লোকে—

তৃনাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

তৃণাপেক্ষা নীচ হইয়া বৃক্ষের মতন সহিষ্ণু হইয়া অপরকে মান দিয়া নিজে মান না চাহিয়া যে ব্যক্তি কৃষ্ণ কীর্ত্তন করে সেই কীর্ত্তনের সমগ্র ফল লাভ করে।

কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্যের উদয় হইল। কৃষ্ণের নিকট শুদ্ধাভক্তি যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভগতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

প্রভু হরি হে—তোমার কাছে কিছুই চাই না। ধন জন যুবতী বা কাব্যামৃতাস্বাদন কিছুর প্রতিই কামনা নাই। কেবল শ্রদ্ধা ভক্তি চাই। হে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া শুধু তাহাই দেও। নিজেকে সংসারী জীব ভাবিয়া প্রভু অতি দৈন্যে দাস্যভক্তি কামনা করিতেছেন। প্রভু বলিতেছেন—আমি তো তোমার নিত্যদাস। তোমাকে ভুলিয়া ভবসাগরে হাবুডুবু খাইতেছি। কৃপা করিয়া আমাকে তোমার পদধূলি সদৃশ কর। দান কর সেবা দেও।

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং,
পতিতং মাং বিষমে-ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-
ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥

শ্রীকৃষ্ণপদে অনুরাগই জীবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ঐ সম্পদ যাহার নাই সেই প্রকৃত দরিদ্র। আমার এই দরিদ্র জীবন ব্যর্থ কৃষ্ণ প্রেমধন বিনা। হে কৃষ্ণ, তুমি আমাকে নাম কীর্ত্তন লালসা দান কর। প্রেম দান কর, যাহাতে তোমার নাম গ্রহণে নয়নে ধারা বয়, কণ্ঠ গদগদ হয়, পুলকে অঙ্গ পরিপূর্ণ হয়—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহনে ভবিষ্যতি॥

বলিতে বলিতে প্রভুর চিত্তের বিরহ স্ফুর্ত্তি হইল। কই, পাই নাই তো কৃষ্ণধন। কই সেজন্য বেদনা কই, আর্ত্তি কই? হে গোবিন্দ, কবে তাহা হইবে, কবে তোমার বিরহে একটি নিমেষ শতযুগের মত মনে হইবে। কবে তোমার অভাবে চক্ষু হইতে বর্ষাধারার মত অশ্রু ঝরিবে। কবে তোমা হারা হইয়া সমস্ত জগৎ শূন্য মনে হইবে।

যুগায়িতং নিমিষেন চক্ষুযা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে॥

এই সকল কথা বলিতে বলিতে গোরাচাঁদের চিত্ত কৃষ্ণ বিরহে তুষানলের মত দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণই কিন্তু রাধাভাবে সমাবৃত তনু। সর্ব্বদাই নিজেকে কৃষ্ণহারা রাধা ভাবিতেছেন। যখন কৃষ্ণ বিরহে অতি কাতর তখন যেন সখীগণ পরাপর্শ দিতেছেন—এমন হৃদয়হীন শ্যামকে উপেক্ষা কর, ত্যাগ কর। উত্তরে কহিতেছেন ভানু নন্দিনী—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু—
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটঃ
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।

আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবিকা দাসী। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাৎ করুন কিংবা দর্শন না দিয়া আমার দেহপ্রাণ তাপ-দগ্ধই করুন, কিংবা যেখানে সেখানে বিচরণ করিয়া যার তার সঙ্গে বিহারে রত থাকুন—তাহাতে আমার কিছু যায় আসে না—যে সব কথা আমি মনের কোণেও স্থান দেই না। আমার অনুধ্যান একটি মাত্র মহাসত্য—"তিঁহ মোর প্রাননাথ।" আর কেহ নয়।—শুদ্ধপ্রেমের লক্ষণ শ্রীরাধার এই অপূর্ব্ব বচন শ্রীগৌরসুন্দর আস্বাদন করিতেছেন। এই আস্বাদনের তুলনা নাই।

স্বয়ং গৌর হরির মত আর কে আছে। তাই শ্লোকদ্বয় তাহাতেই মূর্ত্ত। নিরন্তর কাঁদিয়াও বলিতেন—আমার শ্রীকৃষ্ণে এক বিন্দু প্রেম নাই। তবে যে কান্দি তাঁহা নিজ সৌভাগ্য লোককে জানাইবার জন্য—এই রূপ কথা বলিবার মত পুরুষ ঐ একটি ছাড়া নিখিল বিশ্বে আর কেহ নাই। সারা রাত্রি জাগরণ, দেয়ালে মুখঘর্ষণ উন্মাদের মত প্রধাবণ—এই দিব্য অবস্থা যাহা শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপে প্রকটিত হইয়াছে তাহা অভুতপূর্ব্ব, অনস্বাদিত পূর্ব্ব, তুলনাবিহীন। শেষ শ্লোকের মূর্ত্তি মাদনাখ্য মহাভাবময়ী শ্রীশ্রীরাধা ঠাকুরাণী স্বয়ং। তারই ভাবে সম্পূর্ণ ভাবে আবরিত তনু বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের শ্রীমুখে ঐরূপ কথা উচ্চারিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ উজ্জ্বল রসের সুখ-সম্পদের মূর্ত্তি। আর আমি তার শ্রীপাদপদ্মের দাসীর অনুদাসী। তিনি আমাকে বক্ষে ধরিয়া আত্মসাৎ করুণ কিংবা অদর্শনে দেহমন প্রাণ জর্জ্জরিত করুণ—তিনি আমার প্রণেশ্বর প্রাণসর্ব্বস্বধন। আমি নিজ দুঃখকে, দুঃখ ভাবিনা, তার সুখই আমার সুখের মূল নিদান। আমাকে সহস্র দুঃখ দিয়াও যদি তাহার সুখ হয়, তবে সেই দুঃখ আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ। তিনি কখনও আমাকে প্রাণেশ্বরী বলিলেও আমি অন্তরে জানি যে আমি তার শ্রীচরনের অধমা সেবিকা-দাসীর দাসী।

বিশুদ্ধ প্রেমের এই লক্ষণ একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিরাজমান, সেই রাধাভাবে ভাবিত মতি শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর এই সকল বাক্য উচ্চারণ করিয়া বিশ্বজগতের মাঝে নির্ম্মল বিশুদ্ধ প্রেমের সর্ব্বোত্তম দৃষ্টান্ত প্রকটন করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত লীলা কাহিনী ও শিক্ষার কথা বলা হইল। উপসংহারে তাহার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলিব। দার্শনিক দৃষ্টির কথা সাধ্যতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব এই দুইভাগে আলোচিত হইবে। এই অষ্ট শ্লোকে কেবল যে মহাপ্রভুর শিক্ষাই আছে তাহা নহে এই শিক্ষা মহাপ্রভুর নিজ লীলাজীবন ও পার্ষদগণের লীলাজীবনের মধ্যে বাস্তবায়িত হইয়াছে।

প্রথম শ্লোকে হরিনামের মহামাহাত্ম্য কীর্ত্তিত। ইহার বাস্তব দৃষ্টান্ত জগাই মাধাইর জীবনে। ইহারা দুই ভাই কিরূপ ছিল—

হেন পাপ নাহি, যাহা না করে দুই জন।
ডাকা চুরি মদ্য মাংস করয় ভক্ষণ।

নামের মহাশক্তিতে তাহাদের দুই ভাইর সকল পাপতাপ দূর হইয়া গেল। চিত্ত দর্পণ সুমার্জ্জিত হইল। অন্তরের দাবদাহন দূর হইল। তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—তারা হইল পতিত পাবন। মহাপতিকরা জীবপাবন হইল। বুঝা গেল তাহাদের "সর্ব্বাত্মস্নপনং" হইয়াছিল। দ্বিতীয় শ্লোকের বক্তব্য কিভাবে নাম করিতে হয়। তৃণের মত নীচু, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু, অমানী, মানদ হইতে হইবে, দৃষ্টান্ত ঠাকুর হরিদাস।

দৈন্য বিনয়ের খনি ছিলেন ঠাকুর হরিদাস। যাহারা প্রহার করিয়াছিল তাহাদের তিনি মঙ্গলকামনা করিয়াছিলেন। সর্ব্বদাই তিনি নামানন্দে ডুবিয়া থাকিতেন। কীর্ত্তনীয়র সদা হরিঃ এই শিক্ষার তিনি মূর্ত বিগ্রহ।

"হরিনাম বিদ্যা বধূর জীবন" এই সত্য মূর্ত্তি পাইয়াছিল সন্ন্যাসীর গুরু প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের জীবনে। তাহার অগাধ জ্ঞান বন্ধ্যা ছিল। তাহা জীবন পাইল হরিনাম কীর্ত্তনের শক্তিতে।

তৃতীয় শ্লোকে "নামে সর্ব্বশক্তি আছে" এই বাক্যের মূর্ত্তি কাশীবাসী সন্ন্যাসীরা। যারা ছিল নামে ভজনে ভক্তিযাজনে একেবারেই বহির্মুখ তাহারা হইয়া গেল হরিনামে মাতোয়ারা।

চতুর্থ শ্লোকে অহৈতুকী ভক্তি ছাড়া আর কিছু কামনা করি না, ধনজন, কবিতা, সুন্দরী কিছুই কাম্য নহে—এই মন্ত্রের মূর্ত্তি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। পিতার বিপুল ধনৈশ্বর্য্য, সুন্দরী যোড়শী ভার্য্যা—কোন কিছুর প্রতিই তাহার একবিন্দু আকর্ষণ ছিল না। এই মত সর্ব্বত্যাগী ও নিষ্ঠাময় ভজনানুরাগী দাস গোস্বামীর মত আর দৃষ্ট হয় না।

পঞ্চম শ্লোকে—হে নন্দনন্দন আমি বিষম ভবসমুদ্রে পতিত—আমাকে

তোমার পাদপদ্মের ধূলিকণার মত মনে করিয়া স্থান দেও। এই শ্লোকের মূর্ত্তি শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী। তিনি দন্তে তৃণ ধরিয়া প্রভু পদে পতিত হইলেন প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—"তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে। প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন, সনাতন তোমায় ত্রিতাপ নাই, তবু তাহার বিনয় দৈন্য ছিল অপরিসীম। "উত্তম হইয়া আপনাকে হীন করি মানে।" ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীসনাতন গোস্বামী। কবে গোবিন্দ বলিয়া নয়ন জলে ভাসিব—তার বিরহে জগৎ শূন্য দেখিব—এই ষষ্ঠ, সপ্ত শ্লোকের বর্ণনার মূর্ত্তি স্বয়ং গৌরসুন্দর। বর্ষার মেঘের মত সতত—অশ্রুধারায় ভাসমান, কৃষ্ণ-বিরহে সর্ব্বদা তুষানলে দহ্যমান, এই নিখিল বিশ্বে আর কোথায় কে আছে?

গৌরসুন্দরের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি

সাধ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন আচর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন অনুভব আছে। মহাপ্রভুর হার্দ্দটি আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। উহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে নানা স্থানেই ছড়ান রহিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুশৃঙ্খলভাবে উহা সজ্জিত আছে ঐ গ্রন্থের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে রায় রামানন্দ সংবাদে। উক্ত পরিচ্ছেদ অবিলম্বনেই মহাপ্রভুর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিটি জানিতে হইবে।

সাধ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে মহাপ্রভুর হার্দ্দটি কি তাহাই খুঁজিতে হইবে। আমাদিগকে আর খুঁজিতে হইবে না। মহাপ্রভু নিজেই খুঁজিয়া রামরায়ের মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন। শাস্ত্রে যেখানেই দুইজনের মধ্যে আলোচনা, সেখানেই জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বক্তা, কনিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রোতা। গুরু বলিবেন, শিষ্য শুনিবেন, শুক উপদেষ্টা. পরিক্ষীৎ উপদিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ দাতা অর্জ্জুন গ্রহীতা। ইহাই স্বাভাবিক।

শ্রীরামানন্দ সংবাদে উক্ত স্বাভাবিক নীতির বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। এখানে কনিষ্ঠ ব্যক্তি বক্তা, জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি জিজ্ঞাসু, শ্রোতা। ভক্ত বলিতেছেন, ভগবান শুনিতেছেন, এ যেন গীতার উল্টা পিঠ, কুরুক্ষেত্রের অন্তরের দিক, যিনি তৃষ্ণা মিটাইবেন, তিনিই তৃষ্ণাতুর। যিনি ভাণ্ডারী, তিনিই ভিখারী। এ এক গভীর রহস্য।

সাধন, ভজন, সাধ্যের অভিমুখে প্রধাবন, সাধ্যপ্রাপ্তি এ সকল কার্য্য মূলতঃ ভক্তেরই। ভগবানের নয়। প্রেমভক্তি বস্তুটি ভক্তেরই সম্পদ। এইজন্য ভক্তকৃপায় ভক্তিলাভ; এই মর্ম্মে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। যার সম্পদ তার

অনুভবের সামগ্রী, আস্বাদনের বস্তু। তার মুখেই ত সেই কথা অধিকতর শ্রোত্রমনোভিরাম। ভক্তিরসে ভক্তেরই অপরোক্ষ অনুভূতি, ভগবানের তো অনুমিতি মাত্র। মধু-মাধুরীর গুণগাথা মধুকর মুখেই মধুরতম। যদি চ মধুর আদি নিবাস—পদ্মকোষে।

কবিরাজ গোস্বামী অপর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। জল সাগরেরই, দিয়াছে সে গোপনে সঞ্চার করিয়া মেঘকে। সেই সাগরই আবার শুক্তি কপাট খুলিয়া স্বাথী নক্ষত্রের বৃষ্টির ফোঁটা পাইবার আশায় হাঁ করিয়া আছে। উহা পাইলেই মুক্তাধন বাড়িবে সাগর সম্পদশালী হইবে, দেওয়া বস্তুই ফিরে পাওয়া, কিন্তু লোভনীয় সুদের সহিত।

গৌর-বারিধি, রামরায়-বারিদকে ভক্তি সিদ্ধান্ত-বারি উজার করিয়া-দিয়া আবার শূন্য হৃদয়ে যাচ্ঞা করিতেছেন, পাইয়া লাভবান হইবেন এই লোভে। জলধি দেয় জল, পায় মুক্তা, গৌর কৃপানিধি সঞ্চার করিয়াছেন কৃপা; গ্রহণ করিবেন ভক্তের আস্বাদিত ভক্তিরস সিদ্ধান্ত! দাতা শিরোমণি করপুট পাতিয়া রাম রামের কাছে ভিক্ষা চাহিলেন—

"পড শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।"

প্রভু কেবলমাত্র রামানন্দের অনুভূতি শুনিতে চাহিলেন না। 'পড শ্লোক' বলিয়া শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও জানিতে চাহিলেন। শাস্ত্রের বাণীর সংগে নিজ অনুভবকে মিলাইয়া বলিতে বলিলেন, কেন না, বিদ্বদনুভূতি ও আপ্তবাক্য ইহার উপর আর প্রমাণ নাই।

যেমন জিজ্ঞাসার কৌশল, তেমনই উত্তরের চাতুর্য্য। উত্তরদাতা প্রশ্ন পাইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সবখানি কথা বলিয়া শেষ করেন নাই। পদ্ম যেমন ক্রমে ফোটে, বাইরের পাপড়ি শক্ত, ক্রমে কোমল-তর; কিঞ্জল্কটি সম্পূর্ণ ফুটিলে, বাহির হইয়া পড়ে, রায় মহাশয়ের উত্তরও সেইরূপ ধীরে আত্ম-বিকাশ করিয়াছে। বিকাশের ক্রমেতে শাস্ত্রে যে বিভিন্ন সাধ্যতত্ত্বের নির্দ্দেশ আছে তাহাদের মধ্যে একটা নিবিড় যোগাযোগ ও পর্য্যায়ভেদ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এমন স্তর-সমাবেশ ও বিন্যাস-ভঙ্গি শাস্ত্রে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

প্রথমে রামরায়—'স্বধর্ম আচরণকে' সাধ্য বলিয়া উল্লেখ করিলেন। "বর্ণা-শ্রমাচারবতা" ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক দ্বারা নিজমত দৃঢ় করিলেন। বক্তার বক্তব্য এই যে, চারিবর্ণ ও চারি আশ্রম নিয়ন্ত্রিত সমাজে যিনি যে

ভূমিতে আছেন তিনি যদি সেই ভূমির নির্দিষ্ট কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করেন, তাহা হইলে সমাজ শৃঙ্খলাও অক্ষুণ্ণ থাকে, সমাজের মধ্যে মানুষের জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্যও সফল হয়। ভগবানও প্রীত হন।

ভগবদগীতাতেও দেখা যায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে ক্ষত্রিয়চিত স্বধর্ম পালন করিতে পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" বলিয়া স্বধর্ম্মের জয়গাথা গাহিয়াছেন। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এক সময় গ্রীকজাতি দার্শনিক চর্চায় অতি উন্নত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিল। গ্রীক দার্শনিক শ্রেষ্ঠ প্লেটোর (**Plato**) রিপাবলিক (**Republic**) গ্রন্থ বিশ্ববিখ্যাত। ঐ গ্রন্থে ধর্ম্ম কি ইহা লইয়া দীর্ঘ বিচার আছে। বহু গবেষণার পরে শেষে সিদ্ধান্ত হইয়াছে— সমাজ শৃঙ্খলায় যার যে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম তাহার যথাযথ প্রতিপালই ধর্ম্ম।

বর্ত্তমান সময় বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম নানাপ্রকারে ক্ষুন্ন হইয়া গিয়াছে। তথাপি রামরায়ের সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য এইভাবে গ্রহণ করা যায় যে, নানাবিধ ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে যে যেখানে গিয়া স্থিত হইয়াছে; সেইখানেই তার কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আছে। যে কর্ত্তব্যগুলি সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা সুষ্ঠুভাবে সুনির্ব্বাহ করাই তাহার লক্ষ্য হওয়া উচিত। রামরায়ের এই সাধ্য ভূমিকে Socio-ehical summun Bonum বলা চলে।

রামরায়ের কথা শুনিয়া প্রভু "ইহ বাহ্য" বলিয়া মন্তব্য করিলেন এবং "আগে কহ আর" বলিয়া মহত্তর সাধ্যের কথা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। "বাহ্য" অর্থ বাহিরের কথা। বাহিরের কথা বলিয়া সে সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে এমন কিচ্ছু নয়। মন্দিরের বহির্দ্বার ত দ্বারই বটে, অতিক্রম করিতেই হইবে প্রবেশকারীর।

সামাজিক নৈতিক কর্ত্তব্য তো করিতেই হইবে। কিন্তু কার্য্য করিলেই কার্য্য করা হয় না। "গহনা কর্ম্মনো গতিঃ।" কর্ম্ম অকর্ম্ম বিকর্ম্ম বিচার বড়ই সুকঠিন। ফলাকাঙ্খা যদি কর্ম্মের প্রেরক হয়, কর্ম্মের উদ্দেশ্য যদি থাকে 'স্বার্থ-সিদ্ধি, তাহা হইলে সে কর্ম্ম যতই সুন্দর হউক প্রকৃত সুন্দর নয়। কর্ত্তব্য পালনের মূলে ফলাকাঙ্খা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিতে পারে। সুতরাং যে ভূমিকায় দাড়াইলে কর্ম্ম সুষ্ঠু হয় তাহাই উন্নততর সাধ্যভূমি হইবে। পূর্ব্বে প্লেটোর কথা বলা হইয়াছে তিনিও স্বধর্ম্ম পালনকে চরম তত্ত্ব বলেন নাই, বলিয়াছেন ইহার পরও কিছু আছে। সেটি সে কি তাহা সুস্পষ্ট করেন নাই।

প্রভুর অন্তর বুঝিয়া রামরায় বলিলেন, "কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার।" এই কথা বলিয়া গীতার "যৎ করোষি যদশ্নাসি" (৯।২৭) শ্লোক প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপন করিলেন। তাৎপর্য্য হইল এই যে, কর্ম্ম করিয়া শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলেই প্রকৃত কর্ম্ম করা হয়। যে কর্ম্মের ফলার্পণ ভগবচ্চরণে হয় নাই, আত্মসুখার্থেই নিয়োজিত হইয়াছে, সে কর্ম্ম ব্যর্থ, কুকর্ম্মের তুল্য। গীতাতেও অর্জ্জুনকে তাহাই কহিয়াছেন, "কর্ম্মে তোমার অধিকার, ফলে নহে। যাহা কর, যাহা খাও, যে যজ্ঞ কর, যে তপস্যা কর, সকল কর্ম্মের ফলই আমাকে সমর্পন কর।"

স্বধর্ম্ম পালনাদি কার্য্য যদি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সমর্পিতভাবে করা যায় তাহা হইলেই তাহা ঠিক ঠিক করা হয়। কর্ম্মের ফল দ্বারা কর্ম্মের বিচার নহে। ফলের বৃহত্ব ক্ষুদ্রত্ব দ্বারা কর্ম্ম বড় ছোট নহে। কর্ম্মের বিচার কর্ম্মীর অন্তরের প্রেরণায়। ঐ প্রেরণায় যদি ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি থাকে তাহা হইলেই কর্ম্ম কর্ম্মযোগ পদবাচ্য ও মহান হইয়া থাকে। সাধ্যের এই ভূমিকে Super ethical বলা যায়। নীতির ভূমির মধ্যে নীতি অসম্পুর্ণ। নীতিকে ছাড়াইয়া আধ্যাত্মিক ভূমিকাতে গিয়াই নীতি সার্থকতা লাভ করে।

রামরায়ের সিদ্ধান্ত শুনিয়া প্রভু কহিলেন, "এহো বাহ্য আগে কহ আর।" প্রভু এই সাধ্যকেও বাহ্য তোরণ কহিলেন। যেন অন্দরের দিকে অগ্রসর হইয়া উত্তর দিতে বলিলেন।

কর্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিলেও অনেক সময় কর্ত্তৃত্বাভিমান যায় না। কর্ম্ম করার কর্ত্তৃত্ব ও অর্পন করার কর্ত্তৃত্ব থাকিয়াই যায়। কর্মার্পণকারী ব্যক্তিরও অহংকার-বিমূঢ় অবস্থা ঘুচে না। যতক্ষণ অহং আছে ততক্ষণ অহঙ্কার থাকিবে। যদি কোন কৌশলে অহংকে একেবারে নির্ব্বাসিত করা যায়, তাহা হইলেই ফলাসক্তি-ত্যাগী ও কর্ম্ম-সন্ন্যাসী হওয়া যায়। তার ফলেই কর্ম্মযোগ হয়।

অহঙ্কারকে নির্ব্বাসন দেওয়া যাবে কোথায়? যেখানে দেওয়া যাবে সেইখান হইতেই সে আবার ফিরিয়া আসিবে। একটি মাত্র স্থান আছে, যেখানে দিলে সে আর ফিরিবে না। রামানন্দ জানেন। জানিয়াই প্রভুর অন্তর বুঝিয়া কহিলেন—"স্বধর্ম্ম ত্যাগ সর্ব্বসাধ্যসার।" সংগে সংগে গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (১৮।৬৬) শ্লোক উচ্চারণ করিলেন।

আত্ম নির্ব্বাসনের স্থান হইল ভগবচ্চরণে। সেই স্থানে আপনাকে সমর্পণ

করিয়া দিলে সে চিরতরে গেল। কর্ম্ম করিয়া ফলার্পণ নহে, কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে আত্মার্পণ। পূর্ব্ব-ভূমিকায় ফলদানের কথা ছিল। এখানে আত্মদানের কথা হইতেছে। নিজেকে যে দিয়াছে তার আর স্বধর্ম্ম কি? স্ব থাকিলে তো স্বধর্ম্ম। সেই সর্ব্বেশ্বরে স্ব সমর্পনের ফলে স্বধর্ম্ম আর নাই! অথবা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবার ফলেই ধর্ম্মকর্ম্ম বা কর্ত্তব্যের বোঝা বা উপাধিবিহীন "স্ব"কে তাঁর পায়ে সমর্পন করা সম্ভব।

এই আত্মসমর্পণের (Self dedication) আদর্শ গীতার পরম সংবাদ। আত্ম না থাকায় আত্মকর্ম্ম নাই। এই কর্ম্মহীনের কর্ম্মই নিরবদ্য। বিশ্বনিয়ন্তার হাতে ক্রীড়নক হইয়া সে কর্ম্ম করে। পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম দুয়ের অতীত হইয়া তাহার কর্ম্ম বিরাজমান থাকে। কর্ম্ম সেখানে মরিয়া গেল, সেইখানেই সে বাঁচিয়া রহিল।

এই সমর্পণের সাধ্যভূমিতে দাঁড়াইয়াও মহাপ্রভু "এহো বাহ্য আগে কহ আর" ঘোষণা করিলেন। এই ভূমিকেও বহির্দ্বার বলিবার হেতু এই যে, সমর্পণটি পূর্ণাঙ্গ হইতে গেলে উহা জ্ঞানপূর্ব্বক হওয়া প্রয়োজন। তিনিই যে একমাত্র শরণ্য ইহা জানিয়াই শরণাগতি লইতে হইবে। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে তাহার কোন ইঙ্গিত নাই।

অধিকন্তু, শরণাগতি গ্রহণে কোনও আশা ভরসা বা লোভ লালসা হেতু থাকিলে পূর্ণাঙ্গতা হইবে না। উক্ত শ্লোকে ভরসা দেওয়া হইয়াছে—"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"—হে অর্জ্জুন, তুমি যদি সকল ধর্ম্ম ছাড়িয়া আমার শরণাগত হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্তি দিব। তোমার শোকের আর কোন কারণ থাকিবে না। যদি এই বাক্যের ভরসায় কেহ শরণাগতি গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার ঐ কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে না।

আরও সূক্ষ্ম কথা এই যে, সব ছাড়িয়া শরণাগত হও এই উপদেশ শুনিয়া যিনি শরণাগতি লইবেন, তাঁর শরণাগতি অনবদ্য হইবে না। অন্তরের স্বতঃ আকর্ষণে যাঁহাদের আত্ম সর্ব্বতোভাবে সমর্পিত হইয়া যাইবে তাহাদের পক্ষে উপদেশের প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না—ভরসা পাইবার আবশ্যকতা থাকিবে না। ব্রজে যাঁদের সর্ব্বসমর্পণ হইয়াছিল তাঁদের পাপ পুণ্যের ভাবনা ছিল না, মুক্তি মোক্ষের আশা ছিল না। সেটি হইয়াছিল যে পরাভক্তির বলে, প্রভু রায়রায়কে সেই দিকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন।

প্রভুর অন্তরের আকুতি অনুভব করিয়া রামরায় গন্তব্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া আরেক পা অগ্রসর হইলেন। এ যেন শুক্ল পক্ষের চন্দ্রমা। প্রতিদিন এক কলা করিয়া বাড়িতেছে। রামরায় বলিলেন, "জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার।" কথা বলিয়াই ভগবদ্ভক্তি শ্লোক পাঠ করিলেন—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি না কাঙ্ক্ষতি
সমঃ সর্ব্বেষু ভুতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ (১৮।৫৪)

একমাত্র জ্ঞানভূমিতেই সর্ব্বধর্ম্ম কর্ম্মের লয় হইতে পারে। "সর্ব্বং কর্ম্মালিয়ং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" জ্ঞান ভূমিতে একেবারে লয় পাইয়া ভক্তি ভূমিতে উহা আবার নবজন্ম পরিগ্রহ করিবে। ইহাই এই সাধ্য ভূমিকার হার্দ্দ। এই জন্যই "জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি" কহিলেন। এই স্তরে Complete Self Surrender সাধ্য বিদ্যমান।

একমাত্র শরণ্য তিনি, এই জ্ঞান হইলেই শরণাগতি জাগিবে। একমাত্র ভক্তিই শরণ্যের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। অন্য কোনও উপদেশ বা ভরসা-বাণী নহে। এই জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি ভূমিতে আরোহন করিলেই পূর্ব্বোক্ত "সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য" মন্ত্রের প্রতিপাদ্য অবস্থাটি পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইবে।

তাহাতে আপনাকে অর্পণ না করিয়া পারি না, তাই সমর্পণ, তার ফল পাপপূর্ণ কিংবা স্বর্গ-নরক সে বিবেচনা নাই। এইভাবে সমর্পণে পূর্ণতা আসিলেই ভক্ত সাধক পরব্রহ্মের সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মভূত হইবে। তখন ভক্ত-ভগবানের প্রাণের স্পন্দন এক হইয়া যাইবে। তখন সে তদ্গত ব্রহ্মগত, ব্রহ্মভূত, ব্রহ্মময়। অগ্নি প্রবেশে লৌহ যেমন অগ্নিময়। ভক্তির উদয়ে চিত্ত তখন চিরপ্রসন্ন সদা আনন্দময়। জ্ঞানের উদয়ে সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি সর্ব্বাত্মময়। এ আত্মময়, আনন্দময়, ব্রহ্মময় অবস্থাই সাধ্যসার।

শ্রীলরামানন্দ গীতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া প্রভুর শ্রীমুখের দিকে চাহিলেন, গীতার উন্নততম সাধ্য-পীঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সুগম্ভীর কণ্ঠে প্রভু গৌরহরি-বলিলেন—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।" কেন, কি জন্য প্রভু এমন কথা বলিলেন—এইবার বিবেচনা করিব।

সাধ্যতত্ত্ব

গীতার সর্ব্বোচ্চ ভূমি জ্ঞান-মিশ্রা-ভক্তি। রামনন্দ রায় তাহাই সাধ্যসার কহিয়াছেন। প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর ঐ সাধ্যকে "এহো বাহ্য" বলিয়া আরও

আগে শুনিতে চাহিয়াছেন। প্রভুর সঙ্গেতে সুরসিক রামরায় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, প্রভু "জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতং" উত্তমা ভক্তির কথা শুনিতে চাহিতেছেন।

রামরায় জানেন যে, সমগ্র মহাভারতও তদন্তর্গতং ভগবদ্ গীতা রচনা শেষ করিয়াই বেদব্যাস চিত্তের প্রশান্তিলাভ করেন নাই। পরে নারদ কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ-প্রকট করিয়া পরমশান্তির সন্ধান লাভ করেন। রামরায় তাই গীতার সর্ব্বোচ্চ সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া ভাগবতের দুয়ারে পদক্ষেপ করিলেন। ভাগবতের ব্রহ্মস্তুতির "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" ইত্যাদি শ্লোকের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার।"

জ্ঞানমিশ্রা ও জ্ঞানশূন্যা এই দুইটি ভক্তি ভূমিকার পার্থক্য বুঝিতে হইবে। শব্দ দুইটি শ্রবণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আপাততঃ মনে হয়, প্রথমটি হইতে দ্বিতীয়টি কিছু লঘু। কারণ, প্রথমটিতে জ্ঞান আছে। দ্বিতীয়টিতে নাই। একটি বস্তু কমিয়া যাওয়ায়, ভূমিটা দুর্ব্বল হইয়া যাইবার কথা। রামরায় কি তবে অগ্রসর হইবার প্রচেষ্টার পশ্চাৎপদ হইলেন?

এ আপাত প্রতীতি বস্তুতঃ যথার্থ নহে। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে, ভক্তির সঙ্গে জ্ঞান আছে ইহাত ঠিকই। কিন্তু জ্ঞানশূন্যা ভক্তিতে সে জ্ঞান নাই তাহা নহে। এই না-থাকা, লুপ্ত হইয়া নহে, পূর্ণতায় পৌছিয়াই। জ্ঞানপূর্ণ অর্থ জ্ঞানের ক্রিয়াশূন্য। পূর্ণতায় পৌছিলেই জ্ঞান ক্রিয়াহীন হয়।

কলসী যতক্ষণ জলে পূর্ণ না হয় ততক্ষণই তার শব্দ থাকে। জ্ঞান যতক্ষণ চরমভূমিতে না যায় ততক্ষণই তার সত্তার অভিব্যক্তি থাকে। জ্ঞান যে আছে; ইহা যে বুঝিতে পারা যাইতেছে ইহা হইতেই স্থির জানা গেল যে, জ্ঞান চরম সীমান্তে পৌছে নাই। পূর্ণ কলসী আর শূন্য কলসী এই দুইয়ে একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েই শব্দহীন। একান্ত জ্ঞানহীনের ভক্তি আর জ্ঞানবানের ভক্তি দুইয়ে সাদৃশ্য আছে। গাভীর বৎস-প্রীতি আর ব্রজজননীর গোপাল-প্রীতি ইহাদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য।

ভগবানকে ভগবান জানিয়াই ভক্তি করিতে হইবে। একথা সত্য। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিকতর সত্য কথা হইল যে—যতক্ষণ তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানিতেছি, ততক্ষণ ভক্তি গাঢ় হইতেছে না। তিনি ভগবান, এই ঐশ্বর্য্য বুদ্ধি ভক্তিকে "শিথিল" করিয়া দিতেছে। মহাপ্রভু শিথিল ভক্তির কথা শুনিতে চাহিতেছেন না।—গাঢ় ভক্তির জন্যই তাঁহার আকুতি।

জল অপেক্ষা মাটি গাঢ়। মাটি অপেক্ষা কাষ্ঠখণ্ড গাঢ়তর। কাষ্ঠখণ্ড অপেক্ষা লৌহখণ্ড গাঢ়তম। ইহার কারণ এই যে, জলে হাতখানি অবলীলাক্রমে প্রবেশ করান যায়, মাটিতে একটি শলাকা সজোরে প্রবেশ করানো যায়, কাষ্ঠে একটি তীক্ষ্ণ পেরেক খুব শক্ত আঘাতে প্রবেশ করান যায়, লৌহখণ্ডে কিছুই প্রবেশ করান যায় না। অন্যবস্তু প্রবেশ করিবার অবকাশ যেখানে যত কম, তাহা তত গাঢ়।

"তিনি ভগবান" এই বুদ্ধিটি ভক্তির মধ্যে প্রবেশ করিবার অবকাশ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তাহা গাঢ়তম নহে। যে ভক্তির মধ্যে ভগবত্তানুসন্ধান প্রবেশ করাইবার বিন্দুমাত্র ফাঁক নাই, তাহাই গাঢ়তম ভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি। এই শুদ্ধাভক্তির দিকেই প্রভুর দৃষ্টি।

এখানে একটা সমস্যা দাঁড়াইল। "স্বধর্ম্মত্যাগ" ভূমি হইতে "জ্ঞানমিশ্রা" ভূমিতে আসিবার কালে বলা হইয়াছে যে, একমাত্র শরণ্য তিনি এই জ্ঞান হইতেই শরণাগতি আসিবে। ভক্তিই শরেণ্যের দিকে টানিয়া নিবে। জ্ঞান ভূমিকাতেই ভক্তির স্থিতি হইবে। এখন পুনরায় বলা হইতেছে যে, জ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত ভক্তি শুদ্ধা হইবে না। জ্ঞান না থাকিলেও ভক্তি আসিবে না—আবার জ্ঞান থাকা পর্য্যন্তও ভক্তি স্বরূপে পৌছিবে না।

এ কথার সমাধান এই যে, জ্ঞান হইতেই ভক্তি (আরোপ সিদ্ধা ভক্তি) দেখা দিবে, কিন্তু জ্ঞানশূন্যা হইয়াই আপনাকে স্বরূপতঃ প্রকাশ করিবে। জ্ঞানশূণ্যা হইবে জ্ঞানকে সরাইয়া দিয়া নহে। নিবিড়তর ভাবে জ্ঞানকে আত্মসাৎ করিয়াই ভক্তি জ্ঞানশূণ্যা হইবে। জ্ঞান এত বেশী যে, না থাকার তুল্য। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় জ্ঞানী জ্ঞানহীন শিশুসম।

কর্ম্ম কর্ম্মার্পণে পূর্ণতায় পৌছিয়া বিদায় লইয়াছে। তারপর জ্ঞান আসিয়াছে। পূর্ণতায় পৌছিয়া জ্ঞান এবার বিদায় লইতেছে। শুদ্ধাভক্তিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতেছে। জ্ঞানকর্মের-আবরণ শূন্যা ভক্তিই উত্তমা ভক্তি। শুদ্ধা-ভক্তিতে কর্ম্মজ্ঞানের অত্যন্তাভাব এই প্রতীতি ভ্রান্ত। কর্ম্মজ্ঞান পূর্ণতমতায় আপনাদের বিসর্জ্জন দেয় শুদ্ধা ভক্তিতে। জ্ঞান কর্ম্মের নদী ভক্তি সাগরে আসিয়া আপনাদের নামগোত্র হারাইয়া ফেলে।

যে আপন নয় তার জন্যই কর্ম্ম করি এবং করি যে তা জানি। যে আপন নয় তাকে জানি। জানি যে তাও জানি। যে অতি আপন তার জন্য যা করি তা কর্ম্ম নয়। তাকে যে জানি, তা জানা নয়। আমি যেমন আমাকে

দেহকে জানি। আমার দক্ষিণ হস্ত যেমন আমার বাম হস্তের সেবা করে। খোকাকে প্রতিবেশীরা ভালবাসে ভাল ছেলে বলিয়া—মা ভালবাসে তার খোকা বলিয়া ভালছেলে বলিয়া নহে।

ভগবানকে ভগবান বলিয়া যারা ভক্তি করে তারা প্রতিবেশী। কৃষ্ণকে আপনজন বলিয়া যারা ভালবাসে তারা ঘরের লোক। এই ঘরের লোকের মত তাঁকে পাওয়াই মহাপ্রভুর হার্দ্দ। তাই জ্ঞান-মিশ্রাকে বাহ্য বলিয়াছেন। এই ঘরোয়া ভক্তির খবর ভাগবতে। রামরায়ও তাই প্রভুর অন্তর বুঝিয়া গীতার জ্ঞানভক্তির সমুচ্চয় ছাড়িয়া ভাগবতের শুদ্ধাভক্তির ভূমিতে প্রবেশ করিতেছেন।

রামানন্দ ব্রহ্মস্তুতির যে শ্লোকটি তুলিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি অভিনব সঙ্কেত আছে। শ্লোকটির ভাবার্থ এই যে—ব্রহ্মা বলিতেছেন, হে প্রভু যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা সর্ব্বতভাবে ত্যাগ করিয়া ভক্তসঙ্গে বাস করিয়া কায়-মনোবাক্যে তোমার কথা শ্রবণ, মনন, উচ্চারণ করতঃ তোমার মধুরিমা আস্বাদনেই জীবন ধারণ করে, তুমি সর্ব্বত্র অজিত হইলেও এই ত্রিভুবনে এক-মাত্র তাহাদের দ্বারই "জিত" হইয়া থাকো।"

"যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাং।" যিনি সর্ব্বত্র অজিত তিনি এতাদৃশ ভক্তের কাছে পরাজিত। এই কথাটির মধ্যেই অভিনব সংবাদটি রহিয়াছে। ভক্তির দ্বারে ভগবান পরাজিত হন। কখন হন? যতক্ষণ ভক্ত তাঁকে ভগবান বলিয়া জানে ততক্ষণ হন না। যখন তত্ত্বজ্ঞানে অনুসন্ধানশূন্য অবস্থা আসে তখনই হন।

এইরূপ হইবার একটি বিশেষ কারণ আছে। ভগবান স্বীয় ভগবত্তার ভূমিতে থাকিলে কুত্রাপি "পরাজিত" হইতে পারেন না। যদি কোন প্রকারে ভগবান আপনাকে হারাইয়া ফেলেন, ভগবত্ত্ব ভূমিতে না থাকেন তাহা হইলেই তাঁহার পরাজয় সম্ভব। ভক্ত যতক্ষণ তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানেন ততক্ষণ তিনি ভগবানই থাকেন। আপনাকে ভুলিতে পারেন না। ইহা ভগবানের একটি বিশেষ স্বভাব।

আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥

এই কথাটিই গীতায় "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" শ্লোকে ঘোষিত হইয়াছে। ভক্ত যতক্ষণ তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানিতেছেন, ততক্ষণ তিনি ভুলিতে পারি-

তেছেন না যে তিনি ভগবান সুতরাং কাহারও দ্বারা "জিত" হইবার সম্ভাবনা হইতেছে না।

জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি-ভূমিতে ভগবান। সর্ব্বত্রই অজিত, কুত্রাপি জিত নহেন। তাই মহাপ্রভু "বাহ্য" বলিয়াছেন। যেই মাত্র ভক্ত ভুলিয়া গেল যে তিনি ভগবান, তৎক্ষণাৎ তিনিও ভুলিয়া গেলেন যে তিনি ভগবান। অর্থাৎ তিনি আত্মহারা হইয়া গেলেন। তখনই তিনি ভক্তের ভক্তির অধীনতা স্বীকার করেন। সুতরাং জ্ঞান-শূন্যা ভক্তিতেই-অজিত "জিত" হইয়া থাকেন। তাই প্রভুর অন্তর জানিয়া রামরায় জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা কহিলেন। এই জ্ঞানশূন্যাতাতেই জ্ঞানের পরিপূর্ণতা। জ্ঞানের পরি-পূর্ণতায় কর্ম্মের চরিতার্থতা। সুতরাং এই ভূমিকাতেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্তরগুলির সার্থকতা।

এইরূপে ভাগবতীয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর শ্রীমুখের দিকে তাকাইলেন। রঙ্গনপদ্মে ঈগৎ হাসি ফুটিল। বৃষস্কন্ধখানি একটুখানি দক্ষিণে হেলাইয়া প্রভু কহিলেন—"এহো হয়।"

জ্ঞান-শূন্যা ভক্তিই যে উত্তমা ভক্তি এবং তাহাই যে সাধ্য এই সিদ্ধান্তে প্রভু আপন সম্মতি জানাইলেন। সম্মতি জানাইয়াও "আগে কহ আর" বলিয়া আরও নিগূঢ়তর সাধ্যের কথা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

রামরায় উত্তর করিলেন, "প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার।" জ্ঞানশূন্যা ভক্তি আর প্রেমভক্তি, কথা প্রায় একই। তবে কিঞ্চিৎ পার্থক্যও আছে। জ্ঞান-শূন্যায় জ্ঞান নাই বটে। কিন্তু জ্ঞান যে নাই তার জ্ঞান আছে। অন্ধকার গৃহে যদি চক্ষু খুলিয়া বসিয়া থাকি তাহা হইলে অন্ধকার যে আছে ইহা দেখিতে পাই। অর্থাৎ কিছু যে দেখিবার নাই ইহা যেন দেখি। আর চক্ষু যদি বুজিয়া থাকি তাহা হইলে দেখিবার যে কিছুই নাই তাহাও দেখি না। জ্ঞান-শূন্যতায় জ্ঞানাভাস আছে। প্রেমভক্তির ভূমিকায় তাহাও নাই।

অন্ধকার গৃহে চক্ষু বুজিয়া যেমন নিজের অন্তরকেই দেখিতে চেষ্টা পাই, প্রেমভক্তির ভূমিকাতেও সেইরূপ ভক্তিদেবীর অভ্যন্তরটি দর্শনলাভ করি। জ্ঞান-শূন্যা ভক্তি পর্য্যন্ত ভক্তিদেবীর বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিই যেন ব্যক্ত হয় —তাঁর অন্তরের দিকটা প্রেমভক্তির ভূমিকাতেই প্রকট হইয়া উঠে। জ্ঞান-শূন্যায় ভক্তির ফুটন্ত ফুল দেখি। প্রেমভক্তিতে ফুটন্ত ফুলের অন্তরে মন-মাতানো সৌরভটি ভোগ করি।

প্রেমভক্তির বুকে লুকানো সেই সৌরভটি হইল—কৃষ্ণতৃষ্ণা। শ্রীকৃষ্ণকে

আস্বাদন করিবার জন্য দারুণ ক্ষুধা প্রেমভক্তির ভূমিতে ব্যক্ত হইয়া উঠে। এই তথ্যটি সুপরিস্ফুট করিবার জন্য রায় মহাশয় অনুকূল শ্লোক উচ্চারণ করিলেন—

নানোপচার-কৃত পূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুধস্তি জঠরে জঠরা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নমু ভক্ষ্যপেয়ে॥

যত উপচারেই পূজা হউক না কেন, হৃদয়ের শুদ্ধ প্রেম যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকে গলাইয়া দিতে পারে, তেমন আর কিছুতেই পারে না। উদরে বলবতী ক্ষুধা পিপাসা থাকিলেই খাদ্য পানীয় আনন্দদায়ক।

সত্য সত্যই ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিলে সমুখস্থ সুন্দর সুন্দর খাদ্য পানীয় কেবল দর্শনের সামগ্রী, রসনার তৃপ্তিদায়কও নহে—শরীরের পুষ্টিকারকও নহে। তদ্রূপ জ্ঞানশূন্য ভক্তি-ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য কেবল প্রশংসার সামগ্রী; আস্বাদনের বা সম্ভোগের নহে। ভোগ করিতে হইলে চাই ক্ষুধা। এই ক্ষুধাই প্রেম-ভক্তির প্রাণ; তাই প্রভু আরও আগে শুনিতে চাহিলে রায় রামানন্দ জ্ঞানশূন্যার পর প্রেমভক্তির কথা বলিলেন।

প্রেমভক্তির সাধ্যভূমির আরও একটি বিশেষত্ব আছে, যাহা জ্ঞান শূন্যা ভক্তি ভূমিতে নাই। জ্ঞানশূন্যা ভক্তি পর্য্যন্ত সাধ্যবস্তু শাস্ত্রবিধি মত চেষ্টা বা সাধন দ্বারা লভ্য হতে পারে। শাস্ত্রোক্ত পথে ও মতে আচরণ অনুষ্ঠানের ফলে উহার প্রাপ্তি হইতে পারে। কিন্তু প্রেমভক্তি বস্তু কোন প্রকার প্রয়াসসাধ্য সামগ্রী নহে। উহা একান্তভাবেই প্রসাদ-লব্ধ। প্রচেষ্টায় নয়, কৃপাতেই উহা লভ্য হইতে পারে।

এই কৃপাটির প্রকাশ অন্তরে লোভরূপে। মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সাজান মিঠাই যেমন চিত্তে লোভের উদয় করায় সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিরুপম সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য অন্তরে লোভ সৃষ্টি করে। শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনায় বৈষ্ণব মহাজনেরা লিখিয়াছেন—"প্রতি অঙ্গে পিরীতি পসার।" ঐ প্রীতি রসের পসরা এমনি চিত্তাকর্ষভাবে সুসজ্জিত যে, তদ্দর্শনে অন্তরে লোভের উৎপত্তি হয়! এই লোভই বস্তুকে মিলাইয়া দেয়।

কথাটি আরও স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন। বিপণিতে সাজান মিষ্টান্ন, সকল সময় লোভ না-ও জন্মাইতে পারে। কিন্তু কেহ যদি মিঠাই ক্রয় করিয়া আমাকে দেখাইয়া আমার সম্মুখে পুনঃ পুনঃ ভোজন করে, তখন তৎপ্রতি

লোভ সংবরণ করা বেশ একটু কঠিন হইয়া পড়ে। সেইরূপ কোন ভক্ত যখন কৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদন করে, আস্বাদন করিতে করিতে মন প্রাণ তাঁহার 'কৃষ্ণ ভক্তি রসভাবিত হইয়া পড়ে, আনন্দ হিল্লোলে হৃদয় দুলিতে থাকে, তখন তদ্দর্শনে বা মননে হৃদয়ে লোলুপতা জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক। ঐ লৌল্যই প্রেমভক্তির প্রাণ, ঐ লোলুপতাই বস্তু-প্রাপ্তির পক্ষে "একলং মূল্যং"। একমাত্র দাম। ইহা ছাড়া কোটি জন্মার্জ্জিত আর কোন প্রকার সুকৃতিই নাই, যদ্দারা পরাৎপর বস্তু শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদন হইতে পারে। অন্তরে এই তথ্যটিকে প্রকাশ করিবার জন্যই রামরায় আরও একটি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ,
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটি সুকৃতৈর্নলভ্যতে॥

সম্মতি সূচক ইঙ্গিত করতঃ আনন্দময় প্রভু মধুর হাস্য করিলেন "এহো হয়।" কৃষ্ণ তৃষ্ণাময় প্রেমভক্তিই জীবের পরমসাধ্য হইতে আর সংশয় কি থাকিতে পারে? তথাপি নিগূঢ়তর রহস্য আস্বাদন মানসে প্রভু কহিলেন—

"রায়, আগে কহ আর।"

কৃষ্ণ-তৃষ্ণাময়, প্রেমভক্তির পর প্রভু আর কি শুনিতে চাহিতেছেন, রসবেত্তা রামানন্দ তা অন্তরে অনুভব করিয়া উত্তর করিলেন—"রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।" প্রেমভক্তি সরসীর মত। স্রোত নাই, বিশিষ্ট কোন সম্বন্ধের অনুভূতি জাগিলেই সরোবরে প্রবাহ খেলে। স্রোতস্বিনী হইয়া বহিয়া চলে, সম্বন্ধানুগ হইয়া প্রেকভক্তির রসনা প্রাপ্ত হয়, প্রেমভক্তি বীণার তার, সম্বন্ধের একনিষ্ঠতা তাহাতে ঝঙ্কার। প্রেমভক্তি মূক, সম্বন্ধের বোধ তাহাকে মুখর করে। দাস-প্রভু সম্বন্ধেই প্রেমভক্তির একটি বিশিষ্ট রূপ ফুটিয়া উঠে। ভক্তি যেন নিরাকার, সম্বন্ধ তাহাকে রূপবান করে।

শাস্ত প্রেমভক্তি দাস্যে আসিয়া রস সাগর মুখে গতিশীলা হয়। গতি-মত্তাতে প্রেমভক্তির অশেষ বিচিত্রতা আত্মপ্রকাশ করে। সম্বন্ধ নিষ্ঠ প্রেম-ভক্তির কথা প্রভু শুনিতে চান বুঝিয়া রামরায় ভাগবতের শ্লোক তুলিয়া এই সাধ্যভূমিকে স্থাপন করিলেন—

যন্নাম শ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ
তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা-দাসানামবশিষ্যতে॥

যাঁহার নামটি মাত্র শ্রুতিগত হইলে ত্রিভুবন পবিত্র হয়, যাঁহার শ্রীচরনে সর্ব্বতীর্থ সতত বিরাজমান, তাঁহাকেই যাহারা একমাত্র প্রভু বলিয়া নিজেকে তাঁহার দাসানুদাস স্বরূপে স্থিত করিয়াছেন তাহাদের প্রাপ্যবস্তু আর কি বাকী থাকিতে পারে ? বস্তুতঃ জীবমাত্রেই স্বরূপ হইল কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস্যই জীবের চরম পরম আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তু। ইহা পাইলে আর কিছু পাওয়ার বাকী থাকে না। প্রভুও তাই "এহো হয়" বলিয়া রায় মহাশয়কে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিলেন। সমর্থন করিয়াও "আগে কহ আর" বলিয়া গূঢ়তর রহস্যের আস্বাদন লালসে তৃষ্ণাতুরের মত রামরায়ের বদনপানে তাকাইয়া রহিলেন।

দাস্য প্রেম সাধ্যসার বলিয়া শ্রীরামানন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক উচ্চারণ করতঃ শ্রীশ্রীপ্রভুর বদন পদ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। শ্রীমস্তক ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া রায়ের সিদ্ধান্তের সম্মতিজ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীপ্রভু কহিলেন— রায়, "এহো হয়।" তৎপর গভীরতর তত্ত্ব শুনিবার আগ্রহে বললেন "আগে কহ আর", শ্রীশ্রীপ্রভুর অন্তর অবগত হইয়া রায় মহাশয় কহিলেন "সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার।" দাস্য প্রেমের পর কেন প্রভু আরো "আগে" শুনিতে চাহিলেন এবং রামরায় কেন সখ্য প্রেমের কথা বলিলেন ইহা—আলোচনার বিষয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সম্বন্ধ জ্ঞান স্পষ্ট না হইলে প্রীতির রূপটি প্রস্ফুটিত হয় না। সম্বন্ধের অনুভূতিই নিরাকার ভালবাসাকে রূপবান করে। রূপায়িত না হইলে প্রীতি প্রিয়ের সুখবিধানে পর্য্যাপ্ত হয় না। "তুমি প্রভু আমি দাস" —এই সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কৃষ্ণ প্রীতির একটি বিশিষ্ট আকৃতি পরিব্যক্ত হইয়া উঠিল।

"দাস্য-প্রেম" কথাটিতে ইহা বুঝা যায় যে "আমি দাস, কৃষ্ণ প্রভু" এই অনুভবে তাঁহাকে ভালবাসা। কৃষ্ণকে ভালবাসাই কিন্তু জীবেয় চরম সাধ্য নহে। ভালবাসিয়া তাঁর সেবা করা, সেবা করিয়া তাঁর সুখ বিধান করা ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ। নিজেকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া প্রিয়ের সুখেতে তন্ময়তা প্রাপ্তিই হইল শেষ লক্ষ্য।

সেব্য সেবকের মধ্যে ব্যবধান যত অধিক হইবে সেবায় আত্মবিসর্জ্জন তত বাধাপ্রাপ্ত হইবে। বড়ত্ব বুদ্ধি যত প্রবল হইবে সেবাকার্য্যে সঙ্কোচ তত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। সঙ্কোচ, প্রীতির প্রসারতায় ক্ষুন্নতা আনিবে। সর্ব্বাঙ্গীন সেবার সম্ভাবনা রহিত হইবে। বস্তুতঃ ব্যবধানের বোধ আত্মদানের পূর্ণতায়

পথে বাধক স্বরূপে স্থিত রহিবে। দাস মনে করে কৃষ্ণ আমার প্রভু "কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান।" প্রভু হইলেই তিনি ভৃত্য অপেক্ষা অনেক বড়। বড়োর ও ছোটর মধ্যে ব্যবধান বেশ বৃহৎ। বড় যিনি, তার সেবাতে ছোটজনের একটা সঙ্কোচভাব থাকিলে আত্মবিসর্জ্জনটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না।

অধিকন্তু, দাসের প্রকৃত কার্য্য সেবা করা নহে। আজ্ঞা পালনই দাসের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। প্রভুর আজ্ঞা যদি এমন হয় যে, তাহা তৎসন্নিধানে বাস পূর্ব্বক সেবার বাধক, তাহা হইলে দাসকে আজ্ঞাপালনই করিতে হইবে, আজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক মনের সাধ মতন সেবা করা চলিবে না। প্রীত্যাধিকে আজ্ঞালঙ্ঘনেও কৃষ্ণের সুখাতিশয় হইয়া থাকে। "প্রেমে আজ্ঞা লঙ্ঘিলে হয় কোটি সুখ পোষ।"

তবে সে প্রেম দাস্য প্রেম নহে। ভৃত্যের আজ্ঞা লঙ্ঘনের অধিকার নাই। মহাবীর হনুমানের দাস্য-প্রেম। প্রভু-শ্রীরামের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিয়া সেবায় অধিকার তাহার নাই। শ্রীরামের শ্রীচরণতলে বসিয়া পদসেবার ভাগ্যই তাহার নিয়ত কাম্য! তাহাতেও বঞ্চিত হইতে হয়, যদি প্রভু রাম আজ্ঞা করেন— "যাও হনুমান, সীতার অনুসন্ধানে অগ্রসর হও।"

শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানে ঐ সকল দাসোচিত বাধা যাহাতে বিন্দুমাত্র না থাকে এমন একটি উন্নততর প্রীতির ভূমিতে শ্রীরামরায়কে তুলিবার জন্য মহাপ্রভুর অন্তরের আকুতি। মর্ম্মী ভক্ত রামানন্দ প্রভুর অন্তরের আগ্রহে বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—"সখ্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার", এই কথা বলিয়াই রামরায় সখ্যপ্রেমের শ্লোক উচ্চারণ করিলেন শ্রীমদ্ভাগবত হইতে। মহারাজ পরীক্ষিত প্রতি শ্রীশুক মুখোক্তি "ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা," ইত্যাদি যাহারা শান্তরসের তত্ত্বজ্ঞ ভক্ত, তাহাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ মাত্র ব্রহ্মসুখানুভূতিরূপে অনুভূয়মান। যাহারা দাস্যভাবগত ভক্ত, তাহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ পরম আরাধ্যতম দেবতা রূপে বিরাজমান। যাহারা মায়াবদ্ধ অজ্ঞলোক, তাহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ অতি সাধারণ নরশিশুরূপে প্রতীয়মান। বৃন্দাবনের পূত চরিত্র ব্রজবালকগণের নিকট লীলারঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ নিত্য অশেষবিধ ক্রীড়াকৌতুকের সংগী, খেলার সাথী।

ব্রজের বালকগণের শ্রীকৃষ্ণে সখ্য প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ যে কত বড় এই জ্ঞান তাহাদের নাই। প্রেমই ঐ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। "তুমি কোন

বড়লোক তুমি আমি সম" ইহাই হইল তাহাদের অন্তঃস্থলের অনুভূতি। দাস্যের ব্যবধান বোধ, বড়োত্বের জন্য সঙ্কোচ সখ্যপ্রেম ঘুচাইয়া দিয়াছে। গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে কাঁধে করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে উঠিয়াছে। উচ্ছিষ্ট ফল খাইয়াছে, খাওয়াইয়াছে।

সখ্যরসকে বলা হইয়াছে বিশ্রম্ভ প্রধান। বিশ্রম্ভ শব্দের অর্থ অভেদ-মনন। সখ্যরসের এমনই সামর্থ্য যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখাদের একটা অভিন্নতার বোধ জাগাইয়া দেয়। সখার কাছে তাহার নিজ দেহে ও কৃষ্ণদেহে বিন্দুমাত্র ভেদ বুদ্ধি থাকে না। নিজ চরম নিজ গায়ে ঠেকিলে যেমন উদ্বেগের কারণ হয় না, কৃষ্ণ-গায়ে ঠেকিলেও সেইরূপ উদ্বেগ হয় না। আমার উচ্ছিষ্ট আমার মুখে খাওয়াও যা কৃষ্ণমুখে খাওয়াও তাই। এই দুই মুখে কোন ভেদ বুদ্ধি কৃষ্ণ সখার অন্তরে জাগে না। এই অভিন্ন মননই সখ্য প্রেমের প্রাণস্বরূপ।

শ্রীরামরায়ের উত্তরে শ্রীশ্রীপ্রভু পুলকিতাঙ্গ হইলেন, পরম উল্লাসভরে কহিলেন—"রায়, ত্রহোত্তম।" ইহাই শ্রেষ্ঠ সাধ্য। এই প্রেমের উদয়ে আত্ম সম্বন্ধীয় সমস্ত ভাবনার সম্পূর্ণ নিরসন ঘটে, আত্ম বিসর্জ্জন পূর্ণ হয় এবং কৃষ্ণ সুখসাধন চিন্তাই এক ও অদ্বিতীয় রূপে বিরাজমান থাকে।

সখ্য প্রেমের উত্তমত্ব স্বীকার করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু সস্মিত বদনে শ্রীরামরায়ের দিকে চাহিলেন। নয়নের কোনে আরও নিবিড়তর আস্বাদন লালসা ব্যক্ত করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "রায়, আগে কহ আর।" মর্ম্মীভক্ত প্রভুর অন্তর বুঝিয়া কহিলেন,—"বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার।"

কথাটি বলিতেই রামরায়ের স্মরণে জাগিল শ্রীমদ্ভাগবতের মৃদ্ভক্ষণ ও দামবন্ধন লীলা। কারণ এই দুই লীলাতেই বাৎসল্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা অভিব্যক্ত হইয়াছে। এ লীলাকথা হইতে দুইটি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন নিজ সিদ্ধান্তের অনুকূলে। তন্মধ্যে একটি মহারাজ পরীক্ষিতের উক্তি, অপরটি শ্রীশুকের উক্তি।

নিজমুখেই 'উত্তম' বলিয়া প্রভু "আবার আগে" শুনিবার আগ্রহ করিলেন কেন? এই তত্ত্বটি ভাবনা করিতে হইবে। রামরায়ের উত্তরে দিক্ দর্শনীটি থাকায় আমাদের প্রভুর হার্দ্দ কি তাহা ভাবনা করার সুযোগ হইতেছে, নতুবা উত্তমের পর আর কি আছে তাহা ভাবনা করা অসম্ভব হইয়া পড়িত। প্রভু স্বয়ং নিজ তৃষ্ণার পানীয় রামরায়ের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছেন। "অন্তরে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাও বাণী।" প্রভু স্বয়ং সুযোগ করিয়া দিয়াছেন

বলিয়াই ভাবনা করা যাইতেছে। নতুবা এই সকল কথা এতই গূঢ় যে, "বুঝিবে রসিকজন না বুঝিবে মূঢ়।"

প্রীতিরসের ভূমিটি এমনই অপূর্ব্ব যে, উহার আস্বাদন-মাধুর্যে কেবল যে ভক্তই আত্মহারা তাহা নয়, ভগবানও ভক্তের মাধুর্য্যের সাগরে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন। এই আত্মহারা অবস্থাটি ভক্ত ভগবানের প্রীতিতে চরমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই সখ্যরসে সখা কৃষ্ণকে নিজের সমান মনে করে। ছোট মনে করিতে পারে না। কৃষ্ণ কোন অন্যায় করিতে পারে, কোন ভুল করিতে পারে এমন ভাবনা সখাদের আসে না। কৃষ্ণকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, উপদেশ দেওয়া দরকার, অন্যায় কর্মকরণ হেতু শাসন করা আবশ্যক এইরূপ চিন্তা-সখ্যরসের প্রিয়গণের হৃদয়ে কুত্রাপি জাগরিত হয় না। এই সকল ভাবসম্পদ বাৎসল্য রসের রত্নপেটিকাতে সংরক্ষিত।

শুদ্ধ বাৎসল্যরসে নিমজ্জিত নন্দরাজ ও যশোদা জগৎপালককে বালক মনে করেন। ভূমাকে ক্ষুদ্র মনে করেন, স্বয়ম্ভুকে ঔরসজাত পুত্র মনে করেন। অনাবিল গুণের মণিকে বহুবিধ দোষ ত্রুটির জন্য তাড়ণ, ভর্ৎসন এমন কি রজ্জুদ্বারা উদুখলে বন্ধন পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। যথাকালে উপযুক্তরূপে শাসিত না হইলে, গোপাল পরিণত বয়সে অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিবে, সুতরাং আমি জননী, তাহাকে শাসন করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য এই ভাবনাই জননীকে কৃষ্ণশাসনে উদ্যোগী করে। এই অধিকার সখ্যরসের ভক্তের নাই।

যেমন আবেশ জনক-জননীর, ঠিক তেমন আবেশ বালগোপালের। বাৎসল্যরসের মহাবিষ্টতায় ভগবান আপনি ভগবত্ব হারা হইয়া বালক রূপে লীলা আস্বাদন করনে। নিজকৃত অন্যায়ের জন্য লজ্জিত; শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হন। শাসন র্ভৎসন এড়াইবার জন্য কখনও মিথ্যা-ভাষণ করেন, কখনও দ্রুত পলায়নপর হন। এইরূপে ভগবানের আপন হারা ভাবটি পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় বাৎসল্য রসের উদ্বেলিত সাগরে।

অনন্ত কোটি ব্রহ্মার শিরোস্থিত মুকুটের মনি কিরনে নিয়ত উদ্ভাসিত শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ। সেই শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠের পথে গোপরাজ নন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার পাদুকা শিরে ধরিয়া ছুটিতে থাকেন। এই বাৎসল্য রসের মাধুর্য্য দর্শনে স্বতঃই বলিতে ইচ্ছা হয়—অহো। নন্দরাজের কি ভাগ্য।

শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছেন। মায়ের র্ভৎসনার ভয়ে তাহা গোপন

করিতে চাহেন। শেষে মুখবিবরে বিশ্ব-জগৎ প্রকট করিয়া জননীকে দেখান। পরে মাতৃক্রোড়ে আরোহণ করিয়া স্তন্যপান করেন। মাতৃস্তন্য হইতে অফুরন্ত ক্ষীর ধারা ক্ষরন হইতে থাকে। গোপালের মুখবিবরে দুগ্ধের স্থান সঙ্কুলান হয় না। গণ্ড বাহিয়া পড়ে। মাতা বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইয়া দেন। যে-মুখগহ্বরে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্থান হইল, সেখানে স্তন্য দুগ্ধের স্থান হয় না। এই নিরুপম মাধুর্য্য দর্শনে মনে স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা জাগে "অহো!" হরি যার স্তন্য পান করিয়াছেন, সেই যশোদা জননীর কি অনির্বচনীয় ভাগ্য। গোপাল ক্রোধ করিয়া জননীর দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন। অন্যায়ের শাস্তি দিবার জন্য জননী বন্ধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অনেকবার অক্ষম হইলেন, শেষে কৃপায় সক্ষম হইলেন। নিজ কেশ বন্ধনের দুইগাছি পট্টডোরী দ্বারা গোপালের কটিবেষ্টন করিয়াছেন এবং কটিবদ্ধ বালককে উদূখলের সংগে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। তৎকালীন নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া, শ্রীশুকদেব মন্তব্য করিতেছেন, মাতা আজ মুক্তিদাতাকে বন্ধন করিয়াছেন! এই ভাগ্য সংসারে আর কেহ পায় নাই।

বাৎসল্য প্রেমের মধুরিমা শ্রবণে মহাপ্রভু পরমানন্দ-মধু-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন। উৎফুল্ল বদনে কহিলেন—রায় "এহোত্তম।" যে প্রেমে মুক্তিদাতা বন্ধন গ্রহণ করেন, সেই প্রেমই সাধ্যসার। পরিপূর্ণ সম্মতি জানাইয়াও অতঃপর আরও গূঢ়তম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার বাসনায় কহিলেন—"আগে কহো আর।"

প্রভুর মধুর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অন্তরের লালসাটি ইঙ্গিতে বুঝিয়া লইয়া রাম-রায় কহিলেন, "কান্তা প্রেম সর্ব্যসাধ্যসার।" এই সিদ্ধান্তকে দৃঢ়তর ভাবে স্থাপন করিবার জন্য ব্রজদর্শনে প্রেমাপ্লুত চিত্ত উদ্ধব মহাশয়ের কণ্ঠোক্তি একটি ভাগবতের শ্লোক উচ্চারণ করিলেন।

শ্লোকে শ্রীউদ্ধব মহাশয় ব্রজসুন্দরীগণের পরমোৎকর্ষ বর্ণনা করিতেছেন। ব্রজাঙ্গনা গণের যে জাতীয় আস্বাদন রাসোৎসবে প্রকট হইয়াছিল তাহা ভাষার অতীত। অন্য কাহারও পক্ষে তাহা সর্ব্বতোভাবেই অলভ্য। স্বর্ণ কমলের মত অঙ্গকান্তি বিশিষ্ট বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীলক্ষ্মীদেবীরও ঐ জাতীয় আস্বাদন হয় নাই। অন্য কাহারও ত হয়-ই নাই।

লক্ষ্মীদেবী যদিও শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থলে সর্ব্বদা বিরাজ করেন, তথাপি ব্রজাঙ্গনাগণের মত আস্বাদনের চমৎকারিতা তাঁহার দৃষ্ট হয় না। পিপাসা-হীন ব্যাক্তি সরসী সমীপে সর্ব্বদা বসিয়া থাকিলেই যে অধিক জল পান

করিতে পাইবে এমন কোন কথা নয়। যাহার সেরূপ পিপাসা তার সেইরূপ আস্বাদনের ন্যূনাধিক্য। লক্ষ্মীতে ব্রজগোপীকার মত প্রেমময়ী আকুল পিপাসা দৃষ্ট হয় না।

লক্ষ্মীর প্রেমে শ্রীনারায়নের প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি থাকায় তাহা সংকোচপূর্ণ। গোপীকার শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বর-বুদ্ধি থাকায় তাহাদের ভাব বিশুদ্ধ ও সংকোচ-শূন্য। শ্রীলক্ষ্মীরনারায়ণে তদীয়তা বুদ্ধি। শ্রীনারায়নের বহু সেবিকার মধ্যে আমি একজন এই বুদ্ধিতে প্রীতি দুর্ব্বল। ব্রজাঙ্গনাগণের শ্রীকৃষ্ণে মদীয়তা বুদ্ধি থাকায় শ্রীকৃষ্ণ আমারই, এই অনুভব প্রীতিকে পরম শক্তিশালী করে।

শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের অপেক্ষা করেন। গোপীকারা শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা করেন না। বরং শ্রীকৃষ্ণই তাহাদের অপেক্ষা করেন। সেই উদ্দেশ্যেই উদ্ধব "অস্ত ভুমদণ্ড গৃহীতকণ্ঠ" কথাটি বলিয়াছেন। কথাটির তাৎপর্য্য এই যে, গোপীকারা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করে নাই। শ্রীকৃষ্ণই ব্রজাঙ্গনাগণের কণ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়াছেন। তাহাদের প্রেমের প্রবল স্রোতবেগে ভাসিয়া না যান, এই জন্যই যেন তাহাদের কণ্ঠদেশকে অবলম্বন করিয়া রাসরসে হাবুডুবু খাইতেছেন।

শ্রীজীব গোস্বামী পাদ ও লিখিয়াছেন—

"রাসলীলা জয়ত্যেষা জগদেক মনোহরা
যস্যাং শ্রীব্রজদেবীনাং শ্রীতোঽপি মহিমাস্ফুটঃ ॥

জগতের একমাত্র মনোহারিনী শ্রীরাসলীলার জয় হউক। যে রাসলীলায় লক্ষ্মীদেবী হইতে ব্রজদেবীর মাহাত্ম্য অধিকরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল।

এই কান্তাপ্রেমকে মহাপ্রভু "সাধ্যাবধি" বলিয়াছেন। যদি চ সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তা প্রেম তিনই উত্তম, তথাপি কান্তারতি সাধ্যের অবধি। ইহার কারণ বলিয়াছেন—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।"

শান্তরসের দুইটি গুণ, কৃষ্ণ-নিষ্ঠা ও কৃষ্ণ ভিন্ন তৃষ্ণা ত্যাগ। দাস্যরসে এই দুইটি গুণ তো আছেই অধিকন্তু আছে সেবানিষ্ঠা, যাহা শান্ত ভক্তে নাই। সখ্যরসে দাস্যের তিনটি গুনতো আছেই অধিকন্তু আছে অসংকোচে অভিন্ন মননে সেবা ; যাহা দাস্যে সম্ভব নয়। বাৎসল্য রসে সখ্যরসের চারিটি গুণ তো আছেই, অধিকন্তু আছে মনতাধিক্যে তাড়ণ, ভৎর্সন ; যাহা সখ্য রসে সম্ভব নয়। কান্তারতিতে বাৎসল্যের পাঁচটি গুণ তো আছেই অধিকন্তু আছে নিজাঙ্গদানে কৃষ্ণসেবা, যাহা বাৎসল্যে প্রকট হইতে পারে না।

সাধ্য শব্দের অর্থ বিচারে প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে সমগ্র জীবনের চরমতম

লক্ষ্যটিই সাধ্য—মহাপ্রভু তাহারই নির্ণয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এতক্ষণে তাহা বলা হইল। স্বধর্ম পালন, কর্মাপন, ধর্মার্পন, ও জ্ঞানমিশ্র ভক্তি এই চারিটি কক্ষাকে বলিয়াছেন—'বাহ্য'। জ্ঞানশূন্য ভক্তি প্রেমভক্তি ও দাস্য প্রেম এই তিনকে বলিয়াছেন 'হয়' সখ্য প্রেম ও বাৎসল্য প্রেমকে বলিয়াছেন 'উত্তম' কান্তাপ্রেমকে বলিয়াছেন 'অবধি' প্রভু কহে "এই সাধ্যবধি সুনিশ্চয়।"

চার, তিন, দুই, এক এই দশটি ভূমি। ক্রমোর্দ্ধভাবে যেন দোলমঞ্চের মত সাজান। ভিত্তিতে চারিটি। সর্বউচ্চে একটি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূমির পর পর ভূমিকায় সার্থকতা। পূর্ব্ববর্তী ছয়টি স্তরের যাহা শাশ্বত মাধুর্য্য, তাহা দশম বা শিখর ভূমিস্থিত 'অবধি'তে পরিণতি প্রাপ্ত। পরিপক্ক ফলে যেমন বৃক্ষের শিকড়, কাণ্ড, শাখা পত্রের সার্থকতা, সাধ্যবধি কান্তাপ্রেমে সেইরূপ কর্ম্ম, ধর্ম্ম, জ্ঞানভক্তি ও পরাভক্তির পরম চরিতার্থতা।

সর্ব্বপ্রকার সাধন মার্গের লক্ষ্য আত্মোপলব্ধি—আত্ম স্বরূপে স্থিতি। গৌর-গত বৈষ্ণবাচার্য্যেরা বলেন যে, কেবল জ্ঞান, কর্ম্মযোগ লইয়া যুগ যুগ চেষ্টা করিলেও আত্মপোলব্ধি বা স্বরূপে স্থিতি লাভ হয় না। একমাত্র শুদ্ধ প্রেম-ভক্তি পথে শ্রীকৃষ্ণচরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পনেই আত্মোপলব্ধি পূর্ণতা লাভ করে, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সেবার্থে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিয়াই স্বরূপে স্থিতি হইতে হইবে। অথবা, স্বরূপে স্থিত হইলেই সেবায় সমর্পন পূর্ণাঙ্গ হইবে। দুই একই কথা।

আত্মসমর্পন পরমাত্মার সমীপেই সম্ভব। অংশের কাছে অংশতঃ সমর্পন হইতে পারে। পূর্ণাঙ্গ সমর্পন একমাত্র পূর্ণতম বিগ্রহ লীলাপুরূষোত্তমের নিকট সম্ভব হইতে পারে। অতএব সর্ব্বতোভাবে আত্মদানের পাত্রটি একমাত্র ব্রজরাজনন্দন ছাড়া আর কেহ হইতে পারেন না।

যেমন লৌকিকে একই নারী পুত্রকে বাৎসল্যে ভালবাসে, সখীকে সখ্যরসে ভালবাসে; স্বামীকে কান্তাপ্রেমে ভালবাসে। তিন স্থানে তাঁর জীবনের তিনটি অংশ ব্যক্ত হয়। কোথাও মাতা, কোথাও সখী, কোথাও পত্নী। মাতৃত্ব, সখীত্ব, পত্নীর এক অখণ্ড নারীত্বের তিনটা দিক মাত্র। এই তিনের কোনস্থানেই সে আপনার সমগ্র সত্তার অনুভব করিতে পারে না। ঐরূপ করিতে হইলে এমন একটি প্রীতির পাত্র প্রয়োজন, যিনি পিতা, মাতা পুত্র ভ্রাতা সখা সখী, স্বামী যা কিছু সর্ব্বস্বরূপে স্থিত। ঐরূপ একটি সর্ব্বরসের পাত্র মিলিলে তথায় আত্মবিসর্জ্জনে সামগ্রিক ভাবে অখণ্ড আত্মোপলব্ধি হইতে পারে।

কিন্তু ঐরূপ একটি পাত্র বিশ্বজগতে কোথাও নাই। 'ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অখিলরসের অমৃত ঘন বিগ্রহ আর দ্বিতীয়টি নাই। সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ প্রেমে আত্মদানের একমাত্র পাত্র তিনিই। আবার প্রত্যেক রসেই আত্ম নিবেদন আংশিক। একমাত্র কান্তাপ্রেমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল সকল রসের গুণ অচ্ছেদ্য ভাবে বিদ্যমান থাকায় ঐ রসেই সর্ব্বাঙ্গীন আত্মদান সম্ভব। সুতরাং কান্তা প্রেমে গোপীকার কৃষ্ণচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গীন সেবায় অখণ্ড আত্মোৎসর্গেই সাধ্যের অবধি অভিব্যক্ত।

আমার আমিত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে কৃষ্ণে সমর্পনে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণময় হইয়া যায়। তখন আমিত্বই আর থাকে না। কৃষ্ণই থাকেন। আবার কৃষ্ণের সুখবিধানের জন্য আমি তখন পূর্ণভাবেই বিদ্যমান থাকে। এইরূপে আমার সত্তার সম্পূর্ণ লোপ ও সম্পূর্ণ স্থিতি একই কালে সম্ভব হয়। এই আপাত বিরোধী দার্শনিক তত্ত্বই গৌর পার্ষদগণের দান, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের অন্তস্তলে নিহিত। কান্তা-প্রেমকে সাধ্যাবধি বলিয়া মহাপ্রভু "আরও আগে" শুনিতে চাহিলেন—

"প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।"

"অবধির" পর "আরও আগে" শুনিতে চাওয়ার আকুতি কেন? সাধ্যের অবধির পর শ্রীগৌরসুন্দর সাধ্য-শিরোমণি শুনিতে চাহিলেন। সাধ্য শিরোমণি হইতেছেন শ্রীরাধাঠাকুরাণী। তিনি নিখিল গোপীকুলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। শতকোটি গোপী একত্র হইলেও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে আনন্দ দিতে শ্রীরাধার সমতুল্য হয় না। রামানন্দ রায় জয়দেবের গীতগোবিন্দের শ্লোক প্রমাণ রূপ উপস্থাপন করিয়া ইহার প্রমাণ দিলেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস মাধুর্য্য প্রভু শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। রামরায় নিজকৃত এক গীত গাহিলেন। প্রেমাস্বাদনের চমৎকারিতায় প্রভু রামানন্দের মুখ চাপিয়া ধরিলেন—আর বলিতে দিলেন না।

রামরায়ের গানটির তাৎপর্য্য এই যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পরাকর্ষণ প্রথম পূর্ব্বরাগ দিয়া আরম্ভ হয় তারপর তাহা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে চরম পরিপাকে মহাভাব স্বরূপে পরিণত হয়। তখন বিলাসে এমন একটি অবস্থা হয় যে তাহাদের মধ্যে রমণ রমনী, পুরুষ নারী এই ভেদ ভাব অন্তর্হ্নিত হয়। গভীর প্রেম তাহাদিগকে একত্র করিয়া মিলাইয়া দেয়। তখন অভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়া একীভূত হয়।

নিধুবনে মাতল তনু তনু মিলন
টুটল চিরন্তন ভেদ
মনসিজ বিশিখ খিল জনু লাগল
তনু তনু লখই না ভেদ

এই যে চরম বিলাসে ভেদে অভেদানুভূতি ইহাই মহাপ্রভুর স্বরূপ। তিনি অচিন্ত্যভেদাভেদের ঘনীভূত বিগ্রহ। রামরায়ের এই গানে প্রভু ধরা পড়িয়া যাবেন, এই ভয়ে স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদন করিয়া দিলেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরের মাধুর্য্যাস্বাদনে নিমগ্ন ও সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবে সমালঙ্কৃত মহাভাবমাধুরীর ঘনীভূত বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং ইনিই নিখিল সাধ্যের শিরোমনি। এই বিগ্রহটি ও মিলন বৈচিত্র্য প্রভু রামানন্দ-রায়কে দর্শন করাইয়াছিলেন।

সাধন তত্ত্ব

সাধ্যের শিরোমণি রাধাপ্রেম এই কথা গৌরসুন্দরের সঙ্গে রায় রামানন্দের আলোচনায় প্রতিপাদিত হইল। এখন যে উপায়ে ঐ সাধ্যবস্তু লাভ করিতে হইবে, তাহাই সাধন। সেই বিষয় কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

শ্রীগৌরহরির শিক্ষায় জীবের স্বরূপ হইতেছে "কৃষ্ণ দাস", দাসের মধুর রসে অধিকার হয় না। সীতারামের মিলন সুখের লেশমাত্র অনুধ্যানও হনুমান পক্ষে সুদূরপরাহত। এখন একটি কঠিন প্রশ্ন দেখা দিতেছে। কৃষ্ণ দাস্যে স্থিত জীবের সাধ্যশিরোমনি রাধাপ্রেমাস্বাদনে অধিকার হইবে কিরূপে? শ্রীগৌরসুন্দর জগতে আসিয়াছেন রাধাপ্রেমধন অকাতরে জীব জগৎকে বিতরণ করিতে। যে বস্তুতে যাহার অধিকার নাই তৎসন্নিধানে সেই বস্তু বিতরণের সার্থকতা কোথায়?

এই কথার উত্তর দিতে হইলে জীবের স্বরূপটি আরও গভীর ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। জীব তটস্থা শক্তি। বহিরঙ্গা মায়া শক্তির প্রভাবে সে বহির্ম্মুখী হয়। অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তির করুনায় সে অন্তর্ম্মুখী হয়। স্বরূপ শক্তির আশ্রয়ানুগত্যেই জীবের জীবনের পূর্ণতম সার্থকতার উপলব্ধি হয়। সুতরাং রহস্যময় খবরটি হইতেছে এই যে, জীবের স্বরূপ তত্ত্বত কৃষ্ণদাস হইলেও রসতঃ শ্রীরাধাদাস্য। জীব স্বরূপাশক্তি শ্রীরাধার দাসী। রাধাদাস্য

লাভেই জীবের পরম চরিতার্থতা। গৌরসুন্দরের প্রিয় পার্ষদ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতির ভজনে এই রহস্য সুপরিস্ফুট।

জীবের রাধাদাসিত্বের খবরটি একটি কথার কথা মাত্র নহে। জীবের দাসত্বও থাকিবে মধুর রসের আস্বাদনও থাকিবে কেবলমাত্র রাধাদাসীত্বের পরিচয় দ্বারাই ইহা সম্ভব। শ্রীরাধার দাসীদের বলে সখী। সখীগণের একটি বিশেষ প্রকার-ভেদকে বলে মঞ্জরী। সখী বা মঞ্জরীর মধ্যে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে।

সখীগণ রাধা কল্পলতার পুষ্প পত্র স্থানীয়া। মঞ্জরীগণ লতার জীবনশক্তি স্বরূপা। লতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইলেও পত্রপুষ্পের কিঞ্চিৎ নিজ স্বাতন্ত্র আছে। পত্রপুষ্পের স্বাত্তা ছাড়াও লতার সত্তার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু লতার জীবনী শক্তির লতাছাড়া বিদ্যমানতা নাই। অতএব শ্রীরাধাগোবিন্দের অন্তরঙ্গ সেবায় সখীগণ অপেক্ষা মঞ্জরীগণের অধিকার অনেক বেশী।

এই মঞ্জরীগণের আনুগত্যময় দাসীত্বেই জীবের প্রকৃত স্বরূপের পরাকাষ্ঠা অবস্থা বিরাজিত। তাই গৌরসুন্দর সনাতন শিক্ষায় রাগানুগা সাধনের রহস্যময় পন্থা কহিয়াছেন।

মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন,

সিদ্ধদেহ বলিতে মঞ্জরী-দাসী অভিমানবিশিষ্ট দেহ। এই দেহ জীবের সচ্চিদানন্দময় মাধুর্য্য ঘন দেহ। এই সাধনের দুইটি অঙ্গ, বাহ্য ও অন্তর।

"বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।"

"বাহ্য সাধক-দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন" যাহার হৃদয়ে কৃষ্ণানুরাগ আছে এমন ভক্তের মুখে ব্রজের রাগাত্মিকা ভক্তির প্রেমময় লীলাকথা শ্রবণ করিতে করিতে সেবাপাইবার জন্য যদি কাহারও চিত্তে লোভের উদয় হয়, "সেই গোপীভাবামৃত যার লোভ হয়" সেই ব্যক্তিই মঞ্জরীদাস্যে ভজন করিতে পারে। বাহিরের সাধনে প্রিয়তম "আপন" হইবে। অন্তরের ভজনে আপনজনের সহিত সেবায় আনুগত্যময়ী তন্ময়তা আসিবে। মঞ্জরী চাহে শ্রীরাধার সুখ। শ্রীরাধা চাহেন কৃষ্ণের সুখ। সাধক রাধাদাসী মঞ্জরী মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধান করিবে। আনুগত্যময়ী একাত্মতায় কিশোরীর সঙ্গে নবকিশোরের নিত্য মিলনানন্দ আপনি আস্বাদন করিবে। এইমিলনানন্দের ঘনীভূত মূর্ত্তিই গৌরাঙ্গসুন্দর।

মাতৃভক্ত শিরোমণি নিমাই চাঁদ

নিরন্তর ব্রজভাব সাগরে তন্ময় থাকিয়া ও গৌরাঙ্গসুন্দর জন্মভূমি নদীয়া ও গর্ভধারিনী শচী জননীর কথা ভুলেন নাই। অনন্য সাধারণ মাতৃভক্তির আদর্শ ছিলেন প্রভু গৌরহরি। প্রত্যেক বৎসর পণ্ডিত জগদানন্দকে প্রভু নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেন। উদ্দেশ্য—জননীকে আশ্বাস দিবেন।

জগদানন্দকে প্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন—নবদ্বীপ যাও। মাকে নমস্কার দিও। আমার নামে মাতার পাদপদ্ম ধরিয়া দণ্ডবৎ করিও। করিয়া, কহিও —তুমি যাহাকে স্মরণ কর, সে নিত্য আসিয়া তোমার শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া যায়। যেদিন তোমার ইচ্ছা হয় তাহাকে আহার করাইতে সেইদিনই আমি অতি অবশ্য যাই। গিয়া মায়ের দেওয়া দ্রব্যাদি আদরে গ্রহণ করি।

মাকে বলিও—আমি তাহার সেবা ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি। আমি বাউল হইয়াছি। আমার ধর্ম্মনাশ করিয়াছি। আমার এই মহা অপরাধ জননী যেন গ্রহণ না করেন। আমি সর্ব্বদা মায়েরই অধীন। মায়েরই পুত্র —মায়ের আদেশেই নীলাচলে আছি। যতকাল বাঁচিব এখানেই থাকিব।

জগদানন্দ যাইবার সময় তাহার হাতে প্রভু মায়ের জন্য উত্তম বস্ত্র পাঠান। জগন্নাথের মহাপ্রসাদ পাঠান। সকল ভক্তদেরও পাঠান। মায়ের জন্য বিশেষ করিয়া পৃথকভাবে অতিযত্নে উত্তম প্রসাদ পাঠান। জগদানন্দ নদীয়াতে মাতাকে সকল কথা বলেন—মা, কোন কোন দিন প্রভু আমাদের দেওয়া প্রসাদ খান না, বলেন—"মাতা আজি খাওয়াইল আকণ্ঠ পুরিয়া।" প্রভু বলেন—"আমি যাই ভোজন করি মাতা জানেন না। বুঝিতে পারেন না। আমি সাক্ষাতে যাই মা মনে করেন স্বপ্ন দেখেন।" জগদানন্দের কথা শুনিয়া শচীদেবী বলেন—বাবা জগদানন্দ, আমি যেদিন উত্তম ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করি সেদিন খুব ইচ্ছা হয় নিমাইকে ইহা খাওয়াইব। তারপর দেখি নিমাই খাইতেছে। কিন্তু নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস হয় না। "পাছে জ্ঞান হয় মুই দেখিনু স্বপন।" জগদানন্দের মুখে নিমাইয়ের কথা শুনিয়া মায়ের বিশ্বাস হইল, যাহা দেখেন তাহা সত্যই। নিমাইয়ের ভক্তি কথা শুনিয়া জননী অভিভূত হইলেন।

জগদানন্দ যতদিন নবদ্বীপ থাকেন রাতদিন শচীদেবীর পার্শ্বে বসিয়া প্রভুর লীলাখেলার কথা বলেন। ইহাতে মায়ের আনন্দের সীমা থাকে না। পুত্র বিরহ বেদনা ভুলিয়া যান। প্রভু এইজন্য প্রতিবৎসর তাহাকে নবদ্বীপ পাঠান।

আচার্য্যের তর্জ্জা

জগদানন্দ পণ্ডিত যখন নবদ্বীপ যান তখনই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সংগে দেখা করেন। এইবার দেখা করিতে গেলে একটি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। জগদানন্দের মাধ্যমে আচার্য্যগোসাই মহাপ্রভুকে একটি প্রহেলী তর্জ্জা পাঠাইলেন। এরূপ আর কোনদিনই করেন নাই। তর্জ্জাটিতে এই কয়টি কথা মাত্র—

বাউলকে কহিও লোক হইল আউল,
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল,
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥

তর্জ্জা শুনিয়া জগদানন্দ হাসিলেন, নীলাচলে পৌছিয়া প্রভুকে জানাইলেন। মহাপ্রভুও তর্জ্জা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তারপর বলিলেন—"তার সেই আজ্ঞা।"

স্বরূপ দামোদর তর্জ্জা ও প্রভুর উত্তর শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এই তর্জ্জার অর্থ কি? প্রভু উত্তর দিলেন—"আচার্য্য অতি উত্তম পূজক। তিনি অসীম শাস্ত্রের বিধি বিধানে অতি নিপুন। উপাসনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেবতাকে আবাহন করিতে হয়। পূজা শেষ হইলে আবার দেবতাকে বিসর্জ্জন দিতে হয়।"

এই কথা বলিয়া প্রভু আবার বলিলেন "তর্জ্জার কি যে অর্থ আমিও বুঝি নাই। মহাযোগেশ্বর অদ্বৈত আচার্য্যই এইরূপ তর্জ্জা বলিতে সমর্থ। ইহার কি অর্থ তাহা আমি বুঝিতে পারি না।"

প্রভুর উত্তর শুনিয়া সকল ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন। স্বরূপ দামোদর বিমনা হইলেন। প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ বেদনা সেই হইতে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকট লীলা

এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ ॥

শ্রীগৌরহরির মহা আবির্ভাব ১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে। সন্ন্যাস গ্রহণ ১৪৩১ শকে মাঘ মাসে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবসে। তিরোভাব ১৪৫৫ শকে আষাঢ় মাসে, সপ্তমী তিথিতে। লীলা জীবন ৪৭ বৎসর ৪ মাস। কেহ কেহ একবছর পরেও বলেন।

শ্রীগৌরহরি প্রত্যেকটি দিনই জগন্নাথদেব দর্শন করিতে যাইতেন। আজও দর্শনে বাহির হইয়াছেন। তৃতীয় প্রহর বেলায় কাশীমিশ্রের গৃহ হইতে বাহির হইয়াছেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথের শ্রীবদনপানে চাহিবা মাত্রই মন্দিরের কপাটগুলি বন্ধ হইয়া গেল। কেন এমন হইল? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই একমাত্র কারণ।

শ্রীজগন্নাথের শ্রীমুখারবিন্দ দর্শন করিতে করিতে প্রভু দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন।

কৃপাকর জগন্নাথ পতিত পাবন
কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ।

এই কথা বলিয়াই প্রভু জগন্নাথদেবকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সেই ভাবেই শ্রীজগন্নাথবিগ্রহে বিলীন হইয়া গেলেন।

এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥

লীলা গ্রন্থকারগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীলোচনদাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে একেবারে শেষ অধ্যায়ে এই লীলার বর্ণনা দিয়াছেন। আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা মন্দিরেই থাকা সম্ভব। রথ দ্বিতীয়ার পরবর্ত্তী সপ্তমী যদি হয় তাহা হইলে সেদিন জগন্নাথদেব গুণ্ডিচা মন্দিরেই ছিলেন।

এই কথা ঠিক হইলে সচল অচল পুরুষোত্তমের মহামিলন গুণ্ডিচামন্দিরেই সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীলোচন দাসজীর বর্ণনাও তাহাই বলে—

"গুঞ্জা বাড়ী মধ্যে প্রভু হৈল অদর্শন"

একজন প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। গুঞ্জা বাড়ীতে একজন ব্রাহ্মণ পাণ্ডা ছিলেন। তিনি এই লীলা সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছেন।

"গুঞ্জা বাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।"
"সাক্ষাৎ দেখিল গৌর প্রভুর মিলন॥"

মন্দিরের দরজাগুলি বন্ধ হওয়ায় যে সকল ভক্তগণ বাহিরে পড়িয়াছিলেন তাঁহারা ঐ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াছিলেন। তাহারা ঐ ব্রাহ্মণকে বলিলেন—

বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা।
ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা।

তিনি কপাট খুলিলেন, ভক্তগণের আর্ত্তি দেখিয়া। তিনি তাহাদিগের নিকট সকল কথা বলিয়া বলিলেন।

নিশ্চয় করিয়া কহি শুন ভক্তগণ।

সুতরাং কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। আমরা শুধু একটা কথা ভাবি। যে শ্রীদেহখানিতে শ্রীগৌরসুন্দর মিলিয়া গেলেন রাজা প্রতাপরুদ্র সেই বিগ্রহখানিকে বিশেষ যত্ন সহকারে রাখিয়া দিলেন না কেন? নবকলেবরের সময় সেই দেহখানি রক্ষণ করিতে আদেশ দিলেন না কেন? যদি দিতেন তাহা হইলে আমরা হতভাগ্য জীবগণ সেই মিলিত বিগ্রহ দর্শন স্পর্শণ করিয়া ধন্য হইতে পারিতাম।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর ভারতের বহুতীর্থ পর্যটন করিয়াছেন। নীলাচল ধামে কখনও যান নাই। কোন ভক্ত না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু অতীব গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়াছিলেন—

"ওখানে গেলে এ দেহ গলে যাবে রে।"

এই বেদনাপূর্ণ ভাষাও প্রমাণ করে যে শ্রীলোচনদাসজীর বর্ণিত কাহিনী সত্য। সুতরাং অপ্রকট লীলার মধ্যে ভক্তগণের আস্বাদন ব্রজের পুরুষোত্তম ও নদীয়ার পুরুষোত্তমের মিলন মধুরিমা।

অকস্মাৎ গৌরসুন্দরের বিরহে প্রিয় পার্ষদগণের কি অবস্থা হইল? তাহারা দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন ঘন ঘন রুদ্ধশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। শ্রাবণের ধারার মতো নয়নে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। প্রিয়তমের গুণ স্মরণ করিয়া আকুল ভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাহাদের বিলাপ বাক্য কবি কর্ণপূরের ভাষায় বলি—

হা গৌরাঙ্গ প্রিয়তম হা হা হা প্রভো দীনবন্ধো
হা হা কষ্টং নিজ-ধন-জন-প্রাণ-জাতি-স্বরূপ।
ইত্থং ভূয়ঃ করুণ-করুণঃ ক্রন্দতাং বাক্প্রবন্ধ
শ্চিত্তং ভিত্তীরপিচ শতধা হন্ত সদ্যঃ করোতি ॥১/১৫

হে প্রাণপ্রিয়, হে দীননাথ! হে প্রভো! হে গৌরাঙ্গ! হে করুণাময়! তুমি আমাদের ধন জন প্রাণ ও জাতি স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? এই বিলাপের করুণ স্বর যাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল তাহাদেরও হৃদয়ভিত্তি শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল।